BENGALI MAGAZINE
Serial No. 204
UNIVERSITY OF CALCUTTA

বামাবোধিনী পত্রিকা।

১১শ কল্প—১ম ভাগ।

১৩২৩ সনের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

বিষয়	লেখক-লেখিকার নাম	পৃষ্ঠা
অঞ্জলি (কবিতা)	৺হেমন্তবালা দত্ত	৪৬৩
অনাথ বালক-বালিকা (কবিতা)	শ্রীমতী ইন্দুবালা সরকার	৪৫৮
অনাদৃতা (কবিতা)	...	৩০৩
অনুতপ্ত (কবিতা)	শ্রীমতী মানকুমারী বসু	৩৮৭
অনুরোধ (কবিতা)	৺হেমন্তবালা দত্ত	৪৩৯
অর্ঘ্য (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	৩৭৪
আপন ঘরে (কবিতা)		৫৯
আমাদের কথা (উপন্যাস)	শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ,	৮, ৭৪, ১০৮, ১৯৪, ২৪১
আশ্বিন		২৭৫
আবাহন (কবিতা)		২৩৯
আশীর্ব্বাদ (কবিতা)	শ্রীমতী সুনীতি দেবী	৬২
উদ্বোধন (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৪০৬
উদ্ভিদের ধ্বংকারজান-গ্রহণ	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	১৫৮
উদ্ভিদ্‌গণের বায়ুমণ্ডল হইতে আহার-গ্রহণ	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	
উপযুক্ত শিক্ষাচার		
উপেক্ষিত (কবিতা)	শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	
উষা ও সন্ধ্যা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	
কবিত্ব-দানে		
কাঙ্গালী (কবিতা)	৺হেমন্তবালা দত্ত	
কৃষক কামিনী (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ	
কেন (কবিতা)	শ্রীমতী চারুমতি দেবী	
গান	শ্রীমতী চারুমতি দেবী	
গান	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	

বিষয়	লেখক-লেখিকার নাম	পৃষ্ঠা
গান ও স্বরলিপি	শ্রীমতী জ্যোতিষ্মতী ঘোষ, সরস্বতী ও শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	
গানের স্বরলিপি	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	২০৪, ৩৪৫
গীতিকুঞ্জ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচি	১১৩, ২৯২
গেহমুক্তে (কবিতা)	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় [illegible], এ	১
চিরাগত (কবিতা)	শ্রীযুক্ত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	৩৯২
জগদ্ধাত্রী (কবিতা	শ্রীমতী সরলাবালা বিশ্বাস	২৭৪
জন্মদিনে (কবিতা)	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী	৩৮
জন্মাষ্টমী (কবিতা)	শ্রীমতী সরলাবালা বিশ্বাস	২০৪
জলের দান (গল্প	শ্রীমতী কল্পনা দেবী	২২৬
জীবন-সংগীত (কবিতা)	৺হেমন্তকুমারী সেনগুপ্তা	৩২৯
তোমার মন্দ আমার ভাল (কবিতা)	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ	১১৪
ধারা (কবিতা)	শ্রীমতী সুনীতি দেবী	২৫৬
দুর্গোৎসব (কবিতা)		২৪৪
দ্রৌপদীর প্রতি ভানুমতী (কবিতা)	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	১২৮
নমিতা (উপন্যাস)	শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, সরস্বতী.	২, ৬৩, ৮১, ১৪৫, ১৬১, ২০৮, ২৪৫, ২৮৫, ৩৪৯, ৩৯২, ৩৯৭, ৪৫৪
নববর্ষ (কবিতা)		১৭২
নববর্ষ (কবিতা)	শ্রীমতী সরলাবালা বিশ্বাস	৩৫
নবীন অতিথি (কবিতা)		৭৪
নিয়তি (গল্প)	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	১২৭
নিবেদন (কবিতা)	শ্রীমতী বিমলাবালা বসু	৪১৫
পান্থশালা (কবিতা)		৫
পুস্তক-সমালোচনা		৩৮৯, ৪৬
পূজার কথা	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়	১১৬,১৪২,১৮০,২৭৭,৪
পৃথ্বীরাজ	শ্রীযুক্ত সাধনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৪
পেশীমণ্ডল	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	৫
পৈশিক ব্যায়াম	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	
প্রফুল্লতা (কবিতা)	শ্রীমতী বিনোদিনী সেনগুপ্তা	
প্রলয় (কবিতা)	শ্রীমতী কল্পনা দেবী	

বিষয়	লেখক-লেখিকার নাম	পৃষ্ঠা
প্রায়শ্চিত্ত (গল্প	শ্রীমতী কল্পনা দেবী	২৮৮
প্রার্থনা (কবিতা)	হেমন্তবালা দত্ত	
প্রার্থনা (কবিতা)		
প্রাবৃটে উৎসব-দিনে (কবিতা)	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী	
প্রেম (কবিতা)	শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	
প্রেম ও আশা (কবিতা)	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ	
ভাইবোন্ (কবিতা)	শ্রীমতী অমিয়া গুপ্তা	
ভানুমতীর প্রতি দ্রৌপদী (কবিতা)	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	
মধু-সমাধি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	
মরণ (কবিতা)	শ্রীমতী অনুরূপা দেবী	
মহর্ষির অভিষেক (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	
মহাত্মা বেথুনের স্মৃতি-সভোপলক্ষে	শ্রীমতী শেফালিকা বন্দ্যোপাধ্যায়	
মহাত্মা রাজা রামমোহন	শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী মুখোপাধ্যায়, বি-এ	
মহাত্মা রামমোহন রায়ের জন্মস্থানে	শ্রীমতী হেমলতা দেবী	
রাধানগরে স্মৃতি-মন্দির	শ্রীমতী অবলা বসু শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসে	
মহাভারতের বচন-সংগ্রহ	শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ সাহা	২৬২
মা (কবিতা)	শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী	১৩৮
মাতৃস্নেহ (পারিতোষিক-রচনা)	শ্রীমতী চপলা দেবী	৩০০
মাতৃস্নেহ (ঐ)	শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী চৌধুরী	৩৯০
মাতৃস্নেহ (ঐ)	শ্রীমতী লীলা খাস্তগিরী	৬৬১
মাধবীর প্রতি (কবিতা)	হেমন্তবালা দত্ত	৫০৩
মায়া (কবিতা)	শ্রীমতী বিনোদিনী সেনগুপ্তা	২৯২
মিলন (গল্প)	শ্রীমতী পঙ্কজিনী দেবী	৪৪৭
মুর্শিদাবাদ-ভ্রমণ	শ্রীমতী সুষমা সিংহ	৪৯
যুক্তিযোগ		৩৬৮
রাজসূয়-যজ্ঞকালে নিমন্ত্রিতা সত্যভামার প্রতি দ্রৌপদী	(কবিতা) শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	
রাজা রামমোহন	শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ	
বর্ষবিদায় (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	
বর্ষশেষে (কবিতা)		

বিষয়	লেখক-লেখিকার নাম	পৃষ্ঠা
বসন্ত-পঞ্চমী (কবিতা)	শ্রীমতী সরলাবালা বিশ্বাস	৩৭৭
"বাঙ্গালী"-গান	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	৪৪৩
বামাবোধিনীর জন্মদিনে	শ্রীমতী মানকুমারী বসু	১৯৭
বাসনা (কবিতা)	শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ	৪৫৩
বিজনানন্দ-(কবিতা	শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ	৩৯০
বিরহ-মিলন (কবিতা)	✓ হেমন্তবালা দত্ত	৩৭৫
বিরহের-মিলন (কবিতা)	নরবেশ	৩৩৮
বিরহের-ব্যাপ্তরূপ (কবিতা	নরবেশ	২৩৩
বিবাহ-মঙ্গল (কবিতা)	কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন, বিদ্যাবিনোদ	৪২৮
বিবিধ		১০২,১৬০
বিবিধ-তত্ত্ব		৩৬,২৬৭
বীরবরণ (কবিতা)	শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র	২৯৯
শিক্ষা ও সার্থকতা		৭৮
শিশুর হাসি (কবিতা)	শ্রীমতী বিনোদিনী সেনগুপ্তা	২৭৭
শীলা (উপন্যাস)	শ্রীমতী সারোজকুমারী দেবী ২২, ৪৫, ৯৬, ১২১, ১৯৯, ২০৪, ২৫৪, ৩০৮, ৩১৭, ৩৭৭, ৪১৯, ৪৩০	
শেষ মিনতি (কবিতা)	শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রাহা	৪১৩
সংবাদ	৩৯, ৮০, ২৮১, ৩৫৫, ৩৯৬	
সদালাপ-সংগ্রহ		১০৫
সন্তান-পালন	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী ১৩৯, ১৮৮, ২২২, ২৫০	
সন্ধ্যা—কাঠজুড়ী-পারে (কবিতা)	শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, এম, এ,	২৭৫
সপত্নী-দর্শনে (কবিতা)	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী	২০৯
সাময়িক প্রসঙ্গ	৫৩০, ৩৭২	
সেমিরামিস্	শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ সাহা	২৯৭
স্ত্রীর কর্ত্তব্য	শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী ১৭, ৫৫, ৯০, ৩০৫, ৩১৯, ৪১৩, ৪৪০	
হিতকথা		৩০৭
হেমন্ত-প্রয়াণ (কবিতা)	শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১০০

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

P 3026

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬৩৩ সংখ্যা। | বৈশাখ, ১৩২৩। মে, ১৯১৬। | ১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

গেহ-কুঞ্জে।

কে এলো তব গেহ-কুঞ্জে?
শুকানো তরু ওঠে ভাগে পুনঃ
মধুময় মঞ্জরী-পুঞ্জে।
অশোক স্তবীর হলো চরণ-পরশ পেয়ে,
বকুল আকুল তার মুখ-মধুরাস নেয়ে,
অলক-পবন লভি অলিকুল আসে ধেয়ে,
নয়ন-সরোজ ঘেরি গুঞ্জে।
হাস্যে তাহার ঐ অমিয়ার ধারা ক্ষরে,
রক্ত শিলায় যেন কুন্দ করণ ঝরে,
মরাল-কণ্ঠে বাজে, পলব মরমরে
মঞ্জীর কণু ঝুনু রণ রে।
শুনিয়া অমিয়া-বাণী বিহগ চেতনা পায়,
বেহাগ পূরবী তুলি প্রভাতী সাহানা গায়,
অকল-বায়ে উড়ি চঞ্চল ঘুরি ঘুরি
প্রজাপতি ফুল-মধু ভুঞ্জে।

শ্রীকালিদাস রায়।

নমিতা।

বসন্তের সায়াহ্ন; অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের স্তিমিতোজ্জ্বল জ্যোতিটুকু তখনও গাছপালার উপরে জাগিতেছিল। লঘু নেশার আবেশ-মত্ত মাতালের মত বাতাস টলিতে টলিতে লতা-পাতার বুক ঘেঁসিয়া পুলকের শিহরণ উৎপন্ন করিয়া যাইতেছিল। আকাশের কোলে বিচিত্র বর্ণের রঙিন মেঘের স্ফূর্তিময় লুকোচুরী-খেলা চলিতেছিল। বিশ্ব-প্রকৃতি যেন মধুর অবসাদে স্তব্ধ—তন্ময় হইয়া ঝিমাইতেছিলেন।

মধ্য প্রদেশের···সহরটিকে আমরা করমগঞ্জ নামে অভিহিত করিব। করমগঞ্জ সহরের অপেক্ষাকৃত বসতিবিরল স্থানে··চিকিৎসালয়টি স্থাপিত। চিকিৎসালয়টি আয়তনেও প্রকাণ্ড এবং উহার সম্মানও যথেষ্ট, কারণ এখানে 'ইণ্ডিয়া মেডিকেল সার্ভিস্'-উপাধিধারী একজন ইংরাজ ডাক্তারের অধীনে দুইজন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ সার্জ্জন এবং একজন পরীক্ষোত্তীর্ণা ইংরাজ-মহিলা ধাত্রীর কাজ করিয়া থাকেন। ঐতদ্ব্যতীত দুইজন দেশীয় শুশ্রূষা-কারিণী ও পরীক্ষোত্তীর্ণ ঔষধ প্রস্তুত-কারক এবং অপরাপর ভৃত্যবর্গও যথারীতি আছে।

বৈকালের কর্ত্তব্য-সম্পাদনার্থ বড় ডাক্তার বা ছোট ডাক্তারদ্বয়ের কেহই তখনও আসেন নাই। কম্পাউণ্ডারগণের মধ্যে প্রধান কম্পাউণ্ডার—সুরসুন্দর তেওয়ারী সেই মাত্র আসিয়া হাঁস-পাতালে পৌঁছিয়াছে, অন্য কেহ আসিয়া পৌঁছে নাই।

সুরসুন্দর তেওয়ারী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, বয়স—চব্বিশ পঁচিশের বেশী নহে। চেহারা একহারা শীর্ণ; অতিরিক্ত শ্রমশীলতা এবং উপযুক্ত আহারাভাবের জন্যই বোধ হয় দেহ যৌবনোচিত-পুষ্টি-হীন। বর্ণ—রৌদ্রদগ্ধ অনুজ্জ্বল গৌর। মাথার চুলগুলি স্বভাব-কুঞ্চিত ঘনকৃষ্ণ, কিন্তু অযত্ন-বিশৃঙ্খল; মুখশ্রী মনোহর, ললাটে বুদ্ধিমত্তা, নয়নে করুণা, এবং অধরে সরলতার চিহ্নসমাবেশে মুখে পুরুষোচিত স্থৈর্য্য ও দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিতেছে। পরিধানে হিন্দুস্থানি-ধরণে পরিহিত আধময়লা ধুতি, গায়ে একটি ডোরা-কাটা কোট, পায়ে সদ্যঃ-খড়ি-সংস্কৃত সাদা ক্যাম্বিশের জুতা, মাথায় একটি গাঢ় নীল-রঙের ছোট টুপী বাঁকা করিয়া বসানো।

বাগানের ছোট রাস্তার ভিতর দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া সুরসুন্দর হাঁসপাতালের সাম্নের সিঁড়িতে উঠিতেছে—দেখিল একটি আট নয় বৎসরের সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট বালক বারান্দার সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। বালকের পরিধানে ফরসা পাঞ্জাবী এবং একখানি কালা-পেড়ে পরিষ্কার ধুতি, পায়ে চটি জুতা। সুরসুন্দর এখানকার কাহাকেও চিনিত না, কারণ সে আজ কয়দিন-মাত্র এখানে বদলী হইয়া আসিয়াছে। অনুমানে বুঝিল বালক বাঙালী ডাক্তারবাবুদের কেহ হইবে; সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে সস্মিত-নয়নে বালকের পানে চাহিয়া সুরসুন্দর জিজ্ঞাসা করিল—"কা'কে খুঁজ্‌ছ খোকা?"

বালক তাহার অযাচিত আপ্যায়নে বিস্মিত হইয়া নীরবে দুই মুহূর্ত্ত তাহার মুখপানে

চাহিয়া রহিল, তার পর বলিল, "সমুদ্রপ্রসাদ সিংকে খুঁজ্‌চি।"

সুরসুন্দর জিজ্ঞাসা করিল, "কম্পাউণ্ডার সমুদ্রপ্রসাদ?"

"হাঁ, আপনি তাকে চেনেন?"

"চিনি, কিন্তু সে এখনও আসে নি।"

"আসে নি?"— বালক ওষ্ঠের উপর তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধভাবে সুরসুন্দরকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। তার পর আগ্রহপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, আপনিই কি হেড্ কম্পাউণ্ডার শিউশরণের জায়গায় এসেছেন?"

ঈষৎ হাসিয়া সুরসুন্দর বলিল, "হাঁ খোকা, আমি শিউশরণের জায়গায় এসেছি; তোমার সঙ্গে শিউশরণের আলাপ ছিল?"

অপ্রসন্নভাবে সজোরে মাথা নাড়িয়া বালক বলিল, "না তিনি আমাদের কারুর সঙ্গে কথা কইতেন না।"

সুরসুন্দর বালকের প্রবল মস্তকান্দোলন-ভঙ্গী দেখিয়া হাসা সম্বরণ করিতে পারিল না, নিকটে আসিয়া সস্নেহে বালকের কচি-কোমল মোটা মোটা হাত দুইটী মুঠাইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি খোকা?"

"আমার নাম শ্রীসুশীল কুমার মিত্র,—আচ্ছা আমার দিদি মিস্ নমিতা মিত্রকে দেখেছেন তো?—" বালক সাগ্রহ দৃষ্টিতে সুরসুন্দরের পানে চাহিল।—

"নমিতা মিত্র?—কই, নাম শুনেছি, মনে হচ্ছে না ত?"

আপনাদের ফিমেল ওয়ার্ডের নার্স?

"ওহ্, তা হবে খোকা, আমিত এখনও এখানে কাউকে চিনি না,—মোটে তিন দিন এখানে এসেছি, কাজকর্ম্ম নিয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি···।

বালকের মুখের উদ্বেগ-চিহ্ন মিলাইয়া গেল, আশ্বস্তভাবে সে বলিল, "মোটে তিন দিন? অ!—তাই বলুন—"; যেন এতক্ষণ সে সুরসুন্দরের এই অজ্ঞতার মধ্যে আর একটা কোন কিছু দুশ্চিন্তা-জনক বিষয়ের সন্ধান পাইয়াছিল! হাসি-মুখে বলিল "আচ্ছা, আপনি আমাদের বাড়ী কোথায় জানেন?"

সুরসুন্দর হাসিয়া মাথা নাড়িল। যাহার নাম পর্য্যন্ত সে অজ্ঞাত, তাহার ধাম জ্ঞাত হওয়া তাহার পক্ষে কতদূর সম্ভবপর, সে হিসাব, বালকের নিকট অনাবশ্যক বোধে, চাহিল না; প্রসঙ্গটা উল্টাইয়া লইয়া বলিল, "দেখ খোকা, দেখে ঠিক তোমার মত এত বড় আমার একটি ছোট ভাই আছে।"

বালক তৎক্ষণাৎ মাথা তুলিয়া সুধাইল, "তার নাম কি?"

"তার নাম—প্রেমসুন্দর।"

"প্রেমসুন্দর"—বালক ক্ষুণ্ণভাবে দৃষ্টি নত করিল; বোধ হয়, তাহার আশা ছিল যে, আকৃতিগত সাদৃশ্যের সহিত নামগত সাদৃশ্যও অবশ্যম্ভাবী হইবে। তাহাকে দমিয়া যাইতে দেখিয়া সুরসুন্দর তাহার উৎসাহ পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবার জন্য বলিল, "আচ্ছা খোকা, তুমি ফুল ভালবাস?—নিশ্চয় ভালবাস কি বল?"

প্রশ্নটার অন্তরালে অনেকখানি মিনতি-ভরা অনুরোধের সুর যেন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। বালক যদিও তখন ফুলের জন্য লেশমাত্র

উৎসুক ছিল না, তথাপি সুরসুন্দরের কথায় তৎক্ষণাৎ আগ্রহান্বিত হইয়া বলিল, "ফুল!—হাঁ ফুল আমরা সবাই খুব ভালবাসি। গোলাপ ফুল তো?—"

একটু নিরুৎসাহভাবে সুরসুন্দর বলিল, "গোলাপ ফুল তো নয় খোকা, কামিনী ফুল; কামিনী ফুল বোধ হয় তুমি ভালবাস না?"

সুশীল সাগ্রহে বলিল, "হাঁ তাও ভালবাসি।"

সুরসুন্দর নিজের মাথাটি বাঁ দিকে হেলাইয়া সুকৌশলে টুপিটা ধীরে ধীরে খুলিয়া লইল। সুশীলের সম্মুখে টুপিটা নামাইয়া ধরিয়া বলিল, "নাও সুশীল বাবু,"—

সুশীল দেখিল টুপির অভ্যন্তরভাগে কতকগুলি সদ্যঃপ্রস্ফুটিত সুগন্ধ-বিস্তারী কামিনী ফুল রহিয়াছে! সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "বা, আপনি তো বেশ মজা করেছেন, ফুল শুদ্ধ টুপিটা মাথায় পরে আছেন!—আচ্ছা দিন্ না, আমি একবার টুপিটা পরি।"

"পর"—সুরসুন্দর সহাস্যমুখে বালকের অনুজ্ঞা পালন করিল। টুপিটা তাহার মাথায় পরাইয়া দিল। বালক পরম প্রীত হইয়া দুই হাতে নিজের টুপি-পরা মাথাটার চারি দিকে একবার হাত বুলাইয়া দেখিল; সাগ্রহে বলিল, "কেমন দেখাচ্ছে বলুন দেখি?"

"বেশ দেখাচ্ছে সুশীলবাবু,—চমৎকার দেখাচ্ছে; এখানে আয়না নেই, না হলে—"

সকৌতুকে হাসিয়া সুশীল বলিল, "তবে আর কি, আমি তা হলে টুপিটা নিই,—আপনি আর এ নিয়ে কি করবেন?"

"কিছু না, স্বচ্ছন্দে নাও!—" সুরসুন্দর বালকের অসঙ্কোচ সরলতায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া সস্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিল।

ঠিক সেই সময়ে সম্মুখের ফটকের রাস্তায় হাঁসপাতালের কিমেল্ ওয়ার্ডের মিড্‌ওয়াইফ্ প্রৌঢ়া মিস্ স্মিথ এবং একজন শুশ্রূষাকারিণী সুন্দরী যুবতীকে দেখিতে পাওয়া গেল। সুরসুন্দর মিস্ স্মিথকে চিনিত, কিন্তু যুবতীকে চিনিত না, চিনিবার আগ্রহও ছিল না। তাড়াতাড়ি সিঁড়ির পথ ছাড়িয়া কম্পাউণ্ডারদিগের গৃহের উদ্দেশে অগ্রসর হইল।

পিছন হইতে সুশীল বলিল, "আপনার টুপিটা—"

চলিতে চলিতে মুখ ফিরাইয়া সুরসুন্দর বলিল, "ফুলগুলো যে ওতেই আছে, ওটা তুমি—"

"না—না"—বলিতে বলিতে সুশীল ঘাড় কাৎ করিয়া সুরসুন্দরের মত সতর্ক-কৌশলে টুপিটা খুলিতে গেল—টুপি খুলিল বটে, কিন্তু ফুলগুলো চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল! অপ্রস্তুত হইয়া মলিনমুখে সুশীল বলিল, "ষাঃ! ফুলগুলো যে সব ধুলোয় ছড়িয়ে গেল!"

মমতাপ্রবণহৃদয় সুরসুন্দর তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। সান্ত্বনা-কোমল-কণ্ঠে বলিল, "দাঁড়াও সুশীলবাবু, আমি কুড়িয়ে দিচ্ছি—ধুলো লাগতে দেবো না—"

সুরসুন্দর ফিরিয়া আসিয়া বাঁ পায়ের হাঁটু ভূমে পাতিয়া,—বসিয়া পড়িয়া ফুল কুড়াইতে লাগিল। সুশীল একটু ইতস্ততঃ করিয়া কি করা উচিত ভাবিয়া লইল। তাহার পর হাতের টুপিটা মাথায় চড়াইয়া—নিজের হাত দুইখানি খালি করিল এবং সুরসুন্দরের

পাশে বসিয়া সেও ফুল কুড়াইতে আরম্ভ করিল।

মহিলাদ্বয় কথা কহিতে কহিতে আসিতেছিলেন, ইহাদের দিকে অত লক্ষ্য করেন নাই। কাছাকাছি আসিয়া মিস্ স্মিথের দৃষ্টি ইহাদের উপর পড়িল। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে কৌতুকোজ্জ্বল-মুখে সহাস্যে তিনি বলিলেন, "একি হচ্ছে এখের?—বাঃ, ফুল কুড়োনো হচ্ছে!"

"হাঁ—ফুলগুলো পড়ে গেছে, তাই"—সুশীল মুখ ফিরাইয়া জবাব দিল। সুরসুন্দর কোনো উত্তর দিল না, নতমুখে ফুল কুড়াইয়া সুশীলের পাঞ্জাবীর পকেটে ঢালিয়া দিল। মিস্ স্মিথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ছোট মিত্র, তুমি বোধ হয় ফুলগুলো আমায় দেবার জন্যে সংগ্রহ করছ?"

"নিন্ না—নিন্—" বালক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাগ্রহে পকেটে হাত পুরিয়া মুঠা ভরিয়া ফুল লইয়া মিস্ স্মিথের সম্মুখে হাত বাড়াইয়া দিল। মিস্ স্মিথ পার্শ্ববর্তিনী সঙ্গিনীর পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সপ্রতিভ বালকের বদান্যতা দেখ্‌ছ নমিতা!"

নমিতা!—ইনিই সুশীলের দিদি!—সুরসুন্দরের ফুল কুড়ানো মুহূর্ত্তের জন্য স্থগিত হইল। এতক্ষণ মিস্ স্মিথের সঙ্গিনীর জন্য সে লেশমাত্র কৌতূহল অনুভব করে নাই। কিন্তু এইবার আর পারিল না,—ঘাড় ফিরাইয়া উৎসুকদৃষ্টিতে চাহিল—কিন্তু মুহূর্ত্তে তাহার নয়ন-যুগল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল!—ইনি নমিতা!

নমিতা ললিত-লাবণ্য-গঠিতা—স্নিগ্ধ-তরুণিমার জীবন্ত চিত্র! তাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া এমনই একটা কোমল কমনীয়তা আবেশের মত জড়াইয়া রহিয়াছে যে সহসা তাহাকে দেখিলে নয়নমন আনন্দে মুগ্ধ হইয়া পড়ে! সুরসুন্দর মুহূর্ত্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হইল এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিল—ইনি এত সুন্দরী!

নমিতার বয়স উনিশ কি কুড়ি বৎসর হইবে। শরীরের গঠন একটু লম্বা, পোষাক—বেশ শোভন রমণীর শ্রী-বাঞ্জক, চক্ষু দুইটি বড় বড়, নাসিকা সুন্দর; মুখভাবে নির্ভীকতা, দৃঢ়তা এবং কোমলতার চমৎকার সমন্বয়!—সৌন্দর্য্য বিকশিত! মাথার চুলগুলি কপালের উপর নামাইয়া পিছনে এলো-খোঁপা-বাধা। তাহার উপর 'ভেলের' আচ্ছাদন। পরিধানে একটি সেমিজ ও লেসের সম্পর্কবর্জ্জিত সাদা-সিদা ধরণের জ্যাকেট। সরু-পাড় কাপড়খানি বঙ্গ-মহিলাগণের ন্যায় বেশ সুবিন্যস্ত-ভাবে পরিহিত। পায়ে জুতা-মোজা।

সুরসুন্দর দেখিল তাহাদের ফুল কুড়ানোর কৌতুক-দৃশ্য দেখিয়া নমিতা নিঃশব্দে হাসিতেছে!—সুরসুন্দর আর ফুল কুড়াইল না, উঠিয়া পড়িল। হাতের ফুলগুলো সুশীলের হাতে দিয়া, পাশে স্তম্ভ-গাত্রে ঠেস দিয়া সে দাঁড়াইল। চলিয়া যাইবার পথ ছিল না, কারণ মহিলাদ্বয় সুশীলের সহিত গমন-পথের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন।

সুশীল তখন মিস্ স্মিথকে ফুল লইবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতেছিল। মিস্ স্মিথ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ফুল নিয়ে খেলা করগে যাবা, আমি এখন নিয়ে কেন মিছেমিছি নষ্ট কর্‌ব....."

বালক সকৌতুকে হাসিয়া বলিল, "কিন্তু ম্যাডাম, আমি যে এখুনি সত্যি-সত্যি নষ্ট করে ফেলব!—আচ্ছা, অন্ততঃ ছুটো নিন্—"

"আচ্ছা, তাই দাও বাবা"—মিস্ স্মিথ গোটাকতক ফুল তুলিয়া লইলেন। নমিতা বিস্ময়-কোমল-কণ্ঠে বলিল, "সুশীল, ও টুপিটা কার?"

"এটা এঁর টুপি—" সুশীল চট্ করিয়া মাথা হইতে টুপিটা খুলিয়া সুরসুন্দরের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "এই নিন্।"

সুরসুন্দর বিমূঢ়ভাবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। টুপি লইল না, কিন্তু মহিলাদ্বয়ের সম্মুখে বালককে স্পষ্টাক্ষরে কোনো অনুরোধও করিতে পারিল না। তাহার মনোভাব বুঝিয়া তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালক হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না—না, আমায় মাপ করুন, আমি ঠাট্টা করে তখন বলেছিলুম……আপনার টুপি নিন।"

এইবার নমিতার দৃষ্টি খুলিল। ব্যাপারটা বোধগম্য হইল কেবল বালক রঙীন টুপিটির জন্য যে, ইতঃপূর্ব্বে ভদ্রলোকের কাছে কোনো-রূপ লুব্ধতা প্রকাশ করিয়াছে, সে-সম্বন্ধে তাহার আর লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না। নমিতা তৎক্ষণাৎ নিজে অগ্রসর হইয়া সুশীলের হাত হইতে টুপিটি লইয়া সুরসুন্দরের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল, এবং স্বভাব সুন্দর সৌজন্যে বলিল, "না,—আপনার টুপি—"

যুবতীর আচরণে সহসা সন্ত্রস্তভাবে সুর-সুন্দর দুই হাত পাতিল; আর 'না' বলিবার অবকাশ পাইল না।

অপরিচিত যুবকের হাতের উপর টুপিটা নামাইয়া দিতে লজ্জারক্তমুখী নমিতার হাত-খানি ঈষৎ কাঁপিল! আত্মগোপন-জন্য ত্রস্ত ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে মিস্ স্মিথের উদ্দেশে বলিল, "আসুন আমরা যাই।"

তাহার এই বিড়ম্বনাপূর্ণ গোপনচেষ্টাটুকু মিস্ স্মিথের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "চল।"

পথ খালি পাইয়া মহিলাদ্বয়ের উদ্দেশে যথারীতি অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া সুর-সুন্দর একটু ত্রস্তচরণে চলিয়া গেল। সুশীল পিছন হইতে তাহাকে অনুরোধ করিল, যেন সমুদ্র প্রসাদ আসিলে সুশীলের আগমনসংবাদ তাহাকে জানান হয়। চলিতে চলিতে সুর-সুন্দর মাথা নাড়িয়া তাহার অনুরোধ-রক্ষার সম্মতি জানাইল, কিন্তু আর ফিরিয়া চাহিল না।

সুশীলকে বাড়ীর উদ্দেশে পাঠাইয়া নমিতা মিস্ স্মিথের সহিত ফিমেল্-ওয়ার্ডের দিকে অগ্রসর হইল। তাহারা বারান্দা পার হইয়া চলিয়াছে, বামে সারি সারি রোগীদিগের কক্ষ। চলিতে চলিতে একটা গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টি পড়িতেই নমিতা সহসা থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল! উদ্বেগপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "ম্যাডাম এই রোগীটি যাতনায় বড় ছট্‌ফট্ করচে, বুকের ব্যাণ্ডেজটা খুলে গেছে—একবার দাঁড়ান—।"

মিস্ স্মিথের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে পাশের কক্ষে' ঢুকিল। মিস্ স্মিথও তাহার পশ্চাৎ চলিলেন। সে-ঘরে দুইজন ছাড়া আর রোগী ছিল না। পীড়িত-দ্বয়ের প্রথম ব্যক্তি জ্বরে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, অপর ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে ছিল।

করুণা-বিগলিত-হৃদয়া নমিতা তাড়াতাড়ি আসিয়া রোগীটিকে ধরিয়া বিছানার উপর

ভাল করিয়া শোয়াইল। বুকের বন্ধনী শিথিল হইয়া পেটের উপর নামিয়া গিয়াছিল, সেটা সরাইয়া যথাস্থানে তুলিয়া দিল, তাহার শুষ্ক জিহ্বায় দুই চামচে জল ঢালিয়া দিল,—সহানুভূতিপূর্ণকণ্ঠে তাহাকে দুই চারিটা সান্ত্বনার কথা শুনাইয়া সযত্নে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। রোগী তৃপ্ত হইয়া আরামে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আঃ!"

মিস্ স্মিথ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। তিনি নমিতার কার্য্যাবলীতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই; তিনি শুধু বিস্ময়ে নির্ব্বাকভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন—নমিতার সে সময়ের সেই করুণাপ্লুত বদনের অপূর্ব্ব স্নেহময়ী মাধুরী—শোভা! মিস্ স্মিথ অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিলেন, 'এ সেই নমিতা, যে নমিতা অপরিচিত ব্যক্তির সহিত মুখ তুলিয়া একটা কথা কহিতে লজ্জায় লাল হইয়া উঠে, হাতে হাতে কোনো জিনিস দিতে এখনও সঙ্কোচে থতমত খায়, এ সেই নমিতা!—কি আশ্চর্য্য! এ যে এখন নিঃসম্পর্কীয় আর্ত্তের সেবায় সম্পূর্ণ মুক্ত অসঙ্কোচ, ঐকান্তিক আগ্রহপরায়ণা—করুণাময়ী জননী, স্নেহময়ী কন্যা!' সজলনয়নে মিস্ স্মিথ ডাকিলেন "নমিতা"।

আরাম পাইয়া রোগীর তখন একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। নমিতা মিস্ স্মিথের আহ্বানে সন্তর্পণে নিঃশব্দে তাহার শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং ধীরপদে মিস্ স্মিথের সহিত কক্ষের বাহিরে আসিল।

উভয়ে ফিমেল্-ওয়ার্ডের দিকে চলিলেন। মিস্ স্মিথ চলিতে চলিতে বলিলেন "আচ্ছা নমিতা, নার্শের কাজ কি তোমার বড় ভাল লাগে?"

নমিতা উত্তর দিল,"হাঁ, ম্যাডাম, বড় ভাল লাগে, সেই জন্যে আমি ইচ্ছে করেই এ-কাজে এসেছি—শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিই নি,—"

মিস্ স্মিথ আর কিছু বলিলেন না। উভয়ে নীরবে চলিতে লাগিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সহসা একটু আবেগের সহিত নমিতা বলিয়া উঠিল, "ম্যাডাম, যে-কোনো পীড়িতের বিছানার পাশে গিয়া দাঁড়ালে, আমার বাবার শেষ জীবনের সেই রোগাচ্ছন্ন বেদনাময় মূর্ত্তিটা মনে পড়ে যায়! আমি প্রত্যেক পীড়িতের মধ্যে আমার পিতার সেই পবিত্র সত্তা অনুভব করি; আর নিজের কথা ভুলে যাই। তখন এদের যন্ত্রণা একটুকু উপশমের জন্য আমার প্রাণ এত আকুল হ'য়ে উঠে যে

নমিতার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, সে আর বলিতে পারিল না।

মিস্ স্মিথ করুণা-সজলনয়নে একবার নমিতার মুখ-পানে ফিরিয়া চাহিলেন, তার পর নিঃশব্দে রুমালে অশ্রুকণা মোচন করিয়া নীরবে যেমন চলিতেছিলেন তেমনই চলিলেন। আর কোনও কথা কহিলেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

আমাদের কথা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

সরলার পুনর্বিবাহে আমার আন্তরিক মত নেই। তা'র অদৃষ্টে যা আছে হবে। আর পূর্ব্বে সহস্র সহস্র নারী বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করে গিয়েছেন—সেও না হয় যাবে। এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, সংসার মায়াময়, এখানে যা কিছু করা যায় সবই মায়ার মোহে; এ মায়া-জাল কাটাতে পারলেই মঙ্গল। আসক্তিতে যত ডুববে ততই আসক্তি বাড়বে—ততই জালে জড়িত হবে। সরলার আবার বিয়ে দিলে তার আসক্তি বাড়ানই হবে। মোক্ষদা ঠাকুরাণীকে দেখ্‌লে সকলেই সহজে বুঝ্‌তে পারেন, আন্তরিক বৈধব্য ব্রত কখনই অসম্ভব নয়। সরলাও যে পারবে না, এ কথা বিশ্বাস করতে আমার ইচ্ছা হয় না।

দ। তবে এতদিন ধরে তোমায় কি শিক্ষা দিয়েছি? আর তুমিও তো কিছু পূর্ব্বে যে কথা বলেছ, তাতে তো মনে হয় যে, তুমি মায়াবাদের প্রকৃত অর্থ বুঝেছ। তবে আবার এ কথা কেন বল? এই ভ্রমে পড়েই আজ ভারত দুঃখ ভোগ করছে। ভণ্ড, জ্বালসা-পরায়ণ আধুনিক বেদান্ত-বাদীরা এক হিসেবে ভারতের সর্ব্বনাশ করে গেছেন। পিঠের উপর এক হাণ্টার কসিয়ে দিলে যারা 'বাপ্‌রে-মারে' করে উঠবে, তাদের মুখে কি এসব কথা শোভা পায়? বেদান্ত-সূত্র অভ্রান্ত সত্য, এবং বেদান্তকার পরম জ্ঞানী; কিন্তু শেষ কালের এই জটাধারীগুলোই ভুল বুঝে, লোককে কেবল সন্ন্যাসে মজিয়ে ভিটে-ছাড়া করবার বন্দোবস্ত করে গিয়েছে। জগৎ মিথ্যে এই হিসাবে, যে তা অনিত্য। কিন্তু যতক্ষণ তুমি এই মায়ার শরীরে বাসা বেঁধে বসবাস কর্‌ছ—লীলা করছ, যতক্ষণ নিয়েট জগৎটা বন্‌বন্ করে তোমার মায়ার চর্ম্মচক্ষের সাম্‌নে ঘুরছে, যতক্ষণ তুমি মায়ার মুখ দিয়ে মায়ার শব্দ বাহির করে জগৎ মিথ্যে বলে জাহির করছ, ততক্ষণ তোমার মুখে কি অমন কথাটা সাজে? তোমার ঐ ফুলদানির সুন্দর সুগন্ধ ফুলগুলি যতক্ষণ তোমার সম্মুখে রয়েছে, ততক্ষণ তোমার নিকট—relatively to your relative existence—তা সত্য বৈ কি? প্রলয়ান্তে পরমাণু বিশ্লিষ্ট হয়ে সূক্ষ্মে পরিণত হলে, এবং আপেক্ষিক বিশেষত্ব হারিয়ে "একে" মিশ্‌লে, তা আর ফুল থাকবে না—কিছুই আর কিছুই থাকবে না—কিন্তু এখন আছে—অন্ততঃ তোমার কাছে; কারণ তোমারও অস্তিত্ব মায়ার রাজ্যে। যতক্ষণ আমি সত্যেন্দ্রনাথ, ততক্ষণ এই তুমি যে আমার নিকট বসে অনিমেষনেত্রে আমার মুখের পানে চেয়ে আছ, এ সত্য;— আমার কাছে সত্য না হতে পারে, সত্যেন্দ্রনাথের কাছে সত্য। স্বয়ং পরব্রহ্ম যখন হতে "অহং বহু ভবামি" বলে গুণ্‌ঢ় করেছেন, তখন হতে তিনিও মায়াকে আশ্রয় করতে, মায়াময়, লীলাময় হতে বাধ্য হয়েছেন,—মায়ার মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশ করছেন। তুমি তারই অংশ —তুমি হঠাৎ পালাবে কোথায়? কাল পূর্ণ

হতে দাও। স্বামী বিবেকানন্দ কলেজে পড়ার আমলে রাগ করে বলেছিলেন—I could have made a better world—অর্থাৎ জগৎ-সৃষ্টির কন্‌ট্রাক্‌টারীটা তাঁর হাতে দিলে, তিনি জগৎটাকে এর চেয়ে ভাল করে গড়্‌তেন। শেষে অবশ্য সবই বুঝেছিলেন,—প্রথমে সকলেরই ঐরূপ অধৈর্য্য আসে বটে। জোর করে যারা মায়া ছিঁড়্‌তে বসে, তাদের একুল-ওকুল দুকুলই যায়; তাদের না এদিকে, না ওদিকে। এসকল ধর্ম্মের জাঠামী, অতি-বুদ্ধির লক্ষণ। এ ভাল নয়। কথায় বলে "অতি-বুদ্ধির গলায় দড়ি।" রামকৃষ্ণ পরমহংস বল্‌তেন —"ওহে, অতি-বুদ্ধিটা বড় ভাল না, কাক বড় ভারী বুদ্ধিমান্, তাই ও খেয়ে বেড়ায়।" মহাত্মা যিশুও বলে গিয়েছেন—"Be not wise overmuch for, why shouldst thou die before thy time?" খুব পাকা কথা। আমের মধ্যে যে আঁটিটি রয়েছে, সে মায়ার রসের মধ্য দিয়ে ক্রমে পাকা হচ্ছে। পাক্‌লে আপনিই খসে পড়বে। আমটি আবার যখন মাটির মধ্যে গিয়ে বৃক্ষ হয়ে বিকাশ পাবে, তখন সে তার শাঁস এবং খোসা ত্যাগ করবে। কিন্তু পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হবার পূর্ব্বে তাকে মায়ার রসের মধ্য দিয়ে ঘুরে আস্‌তেই হয়েছে। কাঁচা অবস্থায় পুঁতলে সে আত্ম-বিকাশ কর্‌তে পার্‌বে না,—গাছ হতে পার্‌বে না। আমাদের উপর মায়ারও দাবী আছে। জগৎ আমাদের কাছে মিথ্যে নয়, কারণ আমরাও যে মিথ্যে! তাই বলি, জোর করে কাঁচা আম ছিঁড়ো না—এঁচোড়ে পেকো না। এই এঁচোড়ে পাক্‌তে গিয়েই এদেশ মায়া পড়্‌বার জোগাড় করে তুলেছে,—নইলে আর মূর্খ কাণ্ড-জ্ঞান-হীন নেড়া-নেড়ীর দল মানভঞ্জনের গান গাইয়ে গড়াগড়ি দেয়, আর সিদ্ধ পুরুষ সেজে নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন কর্‌তে বলে, আর টুক্‌নি হাতে করে বেড়িয়ে সমাজের ভার বৃদ্ধি করে? বেশ করে পুষ্ট হও। ধৈর্য্য, বীর্য্য, জড়-বিজ্ঞান, শিল্পবিদ্যা, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি ইত্যাদি উত্তমরূপে চর্চ্চা করে' আগে মনুষ্যত্ব লাভ কর। মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত না হলে দেবতা হতে পারে না। সৃষ্টির তা বিধি নয়। পশু হতে এক দম্ দেবতা হবার উপায় নেই—gradual evolutionএর তা ধর্ম্ম নয়। একেই বলে 'ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া'। মায়ার দাবী কড়ায় গণ্ডায় দিতে হবে। সরলাকে এখন ব্রহ্মচারিণী কর্‌তে গেলে—আমের গুঁটি ছিঁড়ে পুঁতে গেলে মাটির মধ্যে পচে মর্‌বে। তার সন্তানপ্রাপ্তির দাবী ধর্ম্মানুমোদিত। ইন্দ্রিয়-আলোচনাই পাপ,—আর তাও তো আদর্শ ভণ্ডদের দল বড় মেনে চলে। সরলার মনে সন্তানপ্রাপ্তির তীব্র বাসনা থাক্‌তে, কপট ব্রহ্মচর্য্যে বাধ্য করানো, কেবল এই সকল নরাধম, কাপুরুষ, হৃদয়হীন, ধর্ম্ম-জ্ঞানহীন রাক্ষসপ্রকৃতি ভণ্ডদের জবরদস্তি! এরাই না জলজীয়ন্ত, নিরপরাধা, অবলা বিধবাদের ধরে বেঁধে জলন্তচিতার উপর ফেলে পুড়িয়ে মার্‌ত! আর হাততালি দিয়ে ধর্ম্মের জয় গাইত! তারি নাম ছিল সতীদাহ!—কোল, ভীল, সাঁওতাল, কাফ্রীরাও যা স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারে না। এরা পবিত্র হিন্দু ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে কি না করেছে, —কি না করছে? পরের মেয়ে চুরি করে

নিয়ে গিয়ে বলে, "তন্ত্র-সাধন করছি।" অথচ বালবিধবার বিবাহ দিলে অপবিত্রতা! এই হিন্দু-নামধারী কাপুরুষ বর্ব্বরদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব মনুষ্য-জগতে আর নেই। স্ত্রী জাতির উপর এত অত্যাচার—অথচ রক্ষা করবার ক্ষমতা নেই। "পরি নারীং বিবর্জ্জয়েৎ" —মরি মরি, কি বীরপুরুষের মত কথারে! এই হাজার বছর ধরে যতগুলি পবিত্র হিন্দু-রমণী যবনের হস্তে সতীত্ব হারিয়েছে, এত অন্য কোনো জাতির হয়েছে কি? যতগুলি অবলা—ভীরুস্বভাব হিন্দুনারী, সমাজের দোষে বিজাতীয়ের হস্তে সতীত্ব-রত্ন হারিয়েছে, এত কোন্ জাতির হারিয়েছে? যে সকল বিদেশী হিন্দু। দর্শনশাস্ত্র জানে না, বিদেশে গিয়ে তাদের কাছে হিন্দু বলে পরিচয় দিলে তারা বলে "ওহো—বুঝেছি,—ওই সেই, যারা মেয়ে-মানুষকে পুড়িয়ে মারে, আর দেবতার কাছে মানুষ বলিদান দিয়ে ধর্ম্ম করত? বৃটিশগবর্ণমেণ্ট এ সব তুলে দিয়ে এখন তাদের অনেকটা সভ্য করেছে। আজো নাকি হিন্দুরা মেয়ে-মানুষকে দাসী মনে করে; আর নাকি একটি বালিকা বিধবা হলে তাকে না খেতে না-পরতে দিয়ে ঘরে পুরে দাসী করে রাখে।" কিন্তু আজ বড় আনন্দের দিন। আমাদের সোণার-চাঁদ যুবকেরা এক একটি হীরের টুকরো। যদি হিন্দু-সমাজ আবার মানুষের মত হয়, তবে এদেরই হাতে হবে। এদের এক-একটির মনের উদারতা, চরিত্রের পবিত্রতা, হৃদয়ের তেজস্বিতা প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা দেখলে বুকে করে রাখতে ইচ্ছে হয়। এদের কাছে দুই ঘা মা'র খেলেও অপমান বোধ হয় না,—এদের নিকট অপদস্থ হলেও অপমান বোধ হয় না; কিন্তু এই ভক্তবিটল্, অপদার্থ, মূর্খ, হৃদয়হীন, আদর্শবাগীশদের সঙ্গে কথা বলতেও আমার প্রবৃত্তি হয় না। এদের নিকট সামান্য তিরস্কার-ব্যঞ্জক কথা শুনলেও আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়।

আ। আমার যে কান্না পাচ্ছে!—তোমার যে এমন মতি-গতি হবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। তুমি মুখে যা আসচে তাই বলতে আরম্ভ করেছ? সমাজে কত জ্ঞানী লোক রয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশে অমন করে বলে যে মহাপাপ হয়।

দ। "জ্ঞানী" লোককে আমি দেবতার মত পূজা করি। তাঁদের আমি কিছুই বলি নি। সমাজের পাপের ভার কেবল তাঁরাই হাল্কা রেখেছেন, তাই আজো আমাদের মাথার উপর চন্দ্র-সূর্য্য উঠছে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর-ম'শায় ও বিদ্যারত্ন-ম'শায় তার জীবন্ত উদাহরণ। আমি মুখের উপর বলতে পারি, বালবিধবার পুনর্বিবাহে যাঁরা প্রতিবাদ করতে আসেন, তাঁরা কাপুরুষ,—নইলে দুর্ব্বল, আশ্রিত, অল্পগতকে পীড়ন করবার প্রবৃত্তি আসতেই পারে না। আমি প্রমাণ করতে পারি, যিনি যে যুক্তিই দেখাতে আসুন, তার মূলে এই কাপুরুষতা।

আ। যা ভাল বোঝো কর, আমি জানিনে; ইচ্ছে হয়, সরলার সাতগণ্ডা বিয়ে দেও। আমি স্ত্রীলোক—আমি কে? বকমারি করেছিলুম—কথা বলেছিলুম।

রাগ করিয়া উঠিয়া আসিলাম। দত্তজা মৃৎ-পুত্তলিকাবৎ চুপ করিয়া অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে, তাঁহার আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে

গেলাম। অভিমানে সে-রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না।

৭

দুই দিবস মুখ ভার করিয়াই কাটাইলাম। কিন্তু দেখিলাম, আমার তো মুখ ভার, কিন্তু আর দুজনের মুখ শুষ্ক হইতেছে। আমার প্রফুল্লকুমারের রাঙা ঠোঁটদুটি যেন নীল হইয়া যাইতেছে! ছল-ছল নেত্রে আমার মুখের দিকে তাকায়, নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে আমার সঙ্গে কথা কয়। যে-মেজদিদির কাছে আসিয়া দিন-রাত্রি ছেলে মানুষের মত করিয়া আবদার করে, সেই মেজদিদির কাছে আসিতে যেন এখন তার লজ্জা করে! ছোট বেলা থেকে আমার সঙ্গে একত্র বসিয়া খাওয়া অভ্যাস—এখনো মাঝে মাঝে যদি আমার আহারের সময় আসিয়া পড়ে অমনি টপ্ করিয়া ছেলে মানুষটির মত আমার থালার কাছে বসিয়া পড়ে! তাতে যেন তার কত তৃপ্তি। তাহার পঁচিশ বৎসর বয়স হইয়াছে, কিন্তু আমার কাছে আসিয়া চিরদিন আমার সেই প্রফুল্লকুমার। বাড়ীতে বড় থাকিতে চাহে না, সময় পাইলেই আমার কাছে আসিবে, আমাকে খবরের কাগজ পড়িয়া শুনাইবে, বই শুনাইবে, কত গল্প করিবে। কিন্তু এখন এখানে আসিয়া বাহিরেই থাকে, না ডাকিলে আমার কাছে আসে না—যেন সরলার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া কি গর্হিত কাজই করিয়াছে! তাহার যুক্তি তর্ক যেন সবই কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে—তাহার মেজদিদি যাহা পছন্দ করে না, তাহা কি কখনো ভাল কাজ হইতে পারে?—এমন ভাই কাহার?

দত্তজাও যেন নিতান্ত অপরাধীর মত আমার সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমার সেদিনকার অভিমান যেন আজো তাঁহার বক্ষে বিঁধিয়া আছে—আমি না তুলিলে তাহা উঠিবার নহে। অহঙ্কার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, সেই বহুকঠিন বক্ষে এ পামরীর অভিমান ভিন্ন অন্য পার্থিব আঘাত অনুভূত হইবার নহে।—এমন স্বামী কাহার?

মনটা বড় খারাপ হইল। আমার বাড়ী কেহ আসিলেন না, আমি সমাজের বাহিরে থাকিতে বাধ্য হইব, আমার বাড়ীতে ব্রাহ্মণে পৌরোহিত্য করিবেন না,—এই সকল ভয়ে আমি তাঁহাকে বিলাত যাইতে দিই নাই। বারিষ্টার হইতে পারিলেন না বলিয়া মনোদুঃখে তিনি বাটীর বাহির হন না। স্ত্রী হইয়া স্বামীকে মনঃকষ্ট দিয়াছি—পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিলাম, ক্ষমা ভিক্ষা পাইয়াছিলাম। আবার তাঁহার মনে কষ্ট দিতেছি—আবার ক্ষোভ রাখিতেছি? যে-মুখে একবিন্দু হাসি দেখিলে জগৎ-সংসার ভুলিয়া যাই, সেই মুখ আজ ম্লান,—আমারই জন্য! যাঁহার চরণের একটি ক্ষুদ্র কণ্টক তুলিয়া দিবার জন্য, এই তুচ্ছ প্রাণ অবহেলে বিসর্জ্জন করিতে পারি, তাঁহার হৃদয়ে আমিই কণ্টক বিদ্ধ করিয়া রাখিব? ধিক্ আমার নারী-জন্মে, ধিক্ আমার শিক্ষা-দীক্ষায়, ধিক্ আমার কপট প্রেমে স্ত্রী হইয়া স্বামীর উপর কথা কহিয়াছি? স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছি? তিনি কি অজ্ঞান? যদি তাই হন, তবে তাঁহার অজ্ঞানতাই আমার জ্ঞান। আমি কে? তাঁহারই প্রতিবিম্ব। পূর্ণজ্ঞান না পাইলে যেমন পূর্ণ-ব্রহ্মের পূর্ণ প্রতিবিম্ব

কাহার উপর পতিত হয় না, তেমনি আমার পূর্ণ শিক্ষা না হইলে, তাঁহার শিক্ষার পূর্ণ উপলব্ধি আমা হইতে কেমন করিয়া হইবে? হয় তো আমি তাঁহার কথা বুঝি নাই। আমি অন্যায় করিতেছি—তাঁহার অনুগ্রহের, তাঁহার প্রেমের, অযথা সুযোগ লইতেছি। মনে বড় ধিক্কার আসিল।

তিনি বলিয়াছেন, "যে সন্তান না পেয়ে বিধবা হল, সে বড়ই হতভাগিনী,"—সরলা ভাগ্যহীনা। তিনিই আমায় শিখাইয়াছেন, এ জন্মের কর্ম্মগুণে 'পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের কিছু পরিবর্ত্তন করা যায় —' তাই বুঝি তিনি তাহার পুনর্বিবাহ দিয়া তাহার পূর্ব দুঃখের কিছু অংশ খণ্ডন করিতে চাহেন। মানুষের চিত্ত আসক্তিময়, বিকারময়; তিনি বলেন, এই আসক্তিরও—এই বিকারেরও কিছু দাবী আছে। তাহাতেই সৃষ্টি চলিতেছে। বাড়াবাড়ি করিলেই, তমোগুণকে অযথা প্রশ্রয় দিলেই ধ্বংস;—ইহাই জগতের নীতি। তিনি আরো বলেন, সন্তানকামনা মায়ার উচিত দাবী, প্রকৃতি-মাতার যথার্থ প্রাপ্য। বিকারের রোগীর একেবারে জল বন্ধ করিলেও তাহার জীবাত্মা কষ্টভোগ করিবে; পরিমাণে ছাড়াইলেও ধ্বংস। তাই বুঝি তিনি পরিমাণ মত জল দিতে চাহেন। কিন্তু এই পরিমাণ কে নিরূপণ করিবে? জ্ঞানিজন, সমাজ, সৎশিক্ষা। হরিদাসবাবু বলিয়াছেন, "জ্ঞানি-জন-পরিচালিত সমাজই ধর্ম্মরক্ষা করিয়া থাকে, এবং ভবিষ্যতেও করিবে।"—বাড়াবাড়ি করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, আসক্তি বাড়িতে দিবে না। সমাজের ধর্ম্ম সমাজই রক্ষা করিবে?

এ দিকে প্রফুল্লকুমারের মুখের দিকেও যে আর চাহিতে পারি না। একে তো বিবাহের পর হইতে তাহার মনে অশান্তির, অভিমানের, ক্ষোভের তুষানল অহরহঃ নিভৃতে জ্বলিতেছে। তাহার উপর বাছা আমার সরলার জন্য আরো চিরদিন মনঃকষ্ট ভোগ করিবে?—কেবল আমারই জন্য? সে যে-মেজদিদি ভিন্ন জগতে আর কিছু জানে না—সেই মেজদিদির জন্য? বাহিরে শার্দ্দূল-বিক্রম, কিন্তু মেজদিদির কাছে আসিয়া মেষ-শাবকটির মত বসিয়া থাকে। মেজ দিদির কথা শুনিবার সময় হরিণ-শিশুটির মত মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে,—সেই মেজদিদির জন্য?

আর সরলা! আমার কত আদরের সরলা, প্রাণের পুতুলি সরলা, হতভাগিনী সরলা! তোমার মেজদিদিই শেষে তোমার চিরদুঃখের কারণ হইবে? মেজদিদি বলিতে অজ্ঞান হও, কথায়-কথায় ঝাঁপাইয়া মেজ-দিদির কোলের মধ্যে পড়, মেজদিদির বুকের মধ্যে মুখ না লুকাইয়া তোমার কাঁদিয়াও সুখ হয় না,—আমি সেই মেজদিদি?—আমিই হয়তো অজ্ঞানভাবশে তোমার চির-দুঃখের কারণ হইব!

হায়, একদিকে আমার হৃদয়ের হৃদয়, নয়নের নয়ন, ললাটের চন্দন-গৌরব, সীমন্তের সিন্দূররেখা, মস্তকের হেম-মুকুট;—আমার আঁধারে-আলোক, অজ্ঞানে-জ্ঞান, ইহ-কালের সুখ, পরকালের পুণ্য;—আমার যথাসর্ব্বস্বধন স্বামি-দেবতা; আর একদিকে আমার স্নেহের ভিখারী, আমার আদরের ধন, আমার চির-অনুগত, চিরপ্রফুল্ল প্রফুল্লকুমার; অন্য দিকে

আমার সরলা—আমার অঞ্চলের চাবী, প্রাণের পুত্তলি সরলা,—তার মধ্যস্থলে আমি—সরোজিনী!

আমারই উপর সকলের নির্ভর—আমিই প্রতিবাদিনী? কি অপরাধে? কি জন্য? কোন্ সাহসে? অন্যায় হয়, অন্যায়ই হইবে—আমার স্বামী যাহা ন্যায় বিবেচনা করেন, তাহা আমার কাছে অন্যায়! সহস্র ধিক্ আমার নারীজন্মে! আমি সম্মতি দিব—আজই দিব। কিন্তু সরলা! আজ কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, 'পুরুষান্তরস্পৃষ্টা হইবার পূর্ব্বে যেন তোর মৃত্যু হয়। তোকে বড় ভালবাসে বলিয়াই আজ তোর মেজদিদি তোর মৃত্যু প্রার্থনা করিতেছে!'

• • • •

দত্তজাকে বলিলাম যে, 'আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, বুঝিয়া দেখিয়াছি.—এখন আমার আর আপত্তি নাই। আমিই সরলাকে বুঝাইয়া তাহার মত করিব, আমিই তাহার উদ্যোগ করিয়া বিবাহ দিব।'

সরলার বিবাহ দিতে বসিয়াছিলাম। সবই করিয়াছিলাম, কিন্তু সরলা আমার মুখ রক্ষা করিয়াছে — আমার সহোদরার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছে।—বিবাহের (!) দুই দিন পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়া নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান শ্বশুরালয়ে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বড় কাতরপ্রাণে বিপদভঞ্জন শ্রীভগবানকে ডাকিয়াছিলাম, — আমার অন্তরের ডাক তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে।

সরলা বিধবা হওয়া অবধি কি-জানি কেন, পুরুষজাতিকেই কেন আন্তরিক ঘৃণা করিত। তাহার দাদা এবং দাদাবাবু ভিন্ন পৃথিবীতে যে অন্য কোনো পুরুষমানুষ ভাল হইতে পারে, একথা যেন সে কোনো মতেই বিশ্বাস করিতে পারিত না। এইজন্য প্রথমে তাহাকে কিছুতেই পুনর্বিবাহে রাজি করিতে পারি নাই। তাহার যেন মনের ভাব, বিবাহ করিলে পুরুষ মানুষকে বিবাহ করিতে হইবে, এই তার প্রধান আপত্তি। তার পরে বরপাত্রকে (!) আমার বাড়ীতে আনিয়া সরলাকে প্রকারান্তরে দেখাইয়া দিয়াছিলাম।—তাহার পর কিছুদিন ইতস্ততঃ করিয়াছিল। শেষে অনেক কষ্টে, দুজনে তাহাকে অনেক বুঝাইয়া পড়াইয়া রাজি করিলাম। কিন্তু সে চলিয়া গিয়াছে, বেশ করিয়াছে! হিন্দুর মেয়ের মত কার্য্যই করিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সরলার কথা

১

শ্বশুরালয়েই আছি। লেখাপড়ার চর্চ্চা একপ্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছি! আর কেন? তবে ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাইলেই পড়ি। চুপ-চাপ কাজ-কর্ম্ম করি। কাহারো সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে বড় ইচ্ছা করে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার সপত্নী একটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। সেও বিধবা,—আমার অপেক্ষা দুই বৎসরের বড়। তোমরা মনে করিবে, একজন দুঃখের দুঃখী, ব্যথার ব্যথী পাইয়াছ; দুজনে একরকম কাটাইতে পারিবে। কিন্তু কৈ? তা তো আজো পারিয়া উঠিলাম না। তার নাম ভোমরা বা ভ্রমর। সকলে ভূম্‌রী বা ভোম্‌রা বলিয়াই ডাকে। রংটা অবশ্য ভোমরার মত নহে,—উজ্জ্বল

শ্যামবর্ণ। মাথা-ভোরা চুল, মুখখানি বেশ, গড়ন নিখুঁত, খালা মোটাসোটা। সরু কালাপেড়ে ধুতি পরে; দুহাতে দুগাছি সোনার বালা আছে আর কোনো আভরণ নাই। ভোমরা বেশ রসিকা, কথার বাঁধুনিতে সময় সময় আমার মনেও হাসির ফোয়ারা তুলিয়া দেয়। সকলেই তাকে ভালবাসে। কপাল পুড়িয়া গিয়াছে বলিয়া, তার উপর যেন সকলের মায়া-মমতা আরো বেশী। সে অনেকদিন শ্বশুর-বাড়ীতেই ছিল, বৃদ্ধা শাশুড়ীর শুশ্রূষা করিত। কিন্তু তিনি নাকি আর তাকে কাছে রাখিতে সাহস করেন না।

তোমরা মনে করবে, তবে তো গতিক ভাল বোধ হয় না! কি জানি বাপু। কিন্তু ভ্রমরের সঙ্গে আমার বেশ একটু ভালবাসা হইল, তাকে ভাল না বাসিয়া কেহ থাকতে পারে না। অমন মিষ্টভাষিণী, মধুর-হাসিনীকে যে ভাল না বাসিবে, সে জীবনে কাহাকেও ভালবাসিতে শিখিবে না। ভোমরা দু'বেলাই খাইত, একাদশীর দিন ফলাহার করিত। আগে নাকি মাছও খাইত, এখন ছাড়িয়াছে। আমি তাহাকে নির্জ্জলা একাদশী করিতে এবং একসন্ধ্যা আহার করিতে উপদেশ দিলাম। কি-জানি কি ভাবিয়া—বোধ হয় চক্ষুলজ্জার খাতিরে সে আমার কথা শুনিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিল। ভোমরা সাধারণ বাংলা লেখাপড়াও বেশ একটু জানে। বাংলা নভেল্ অনেক পড়িয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গালীর মেয়ের লেখাপড়া শেখা বলিতে আজকাল তো ইহাই বুঝায়। কাজকর্ম্মেও সে বেশ পটু। পাড়ায় বিবাহ হইলে, বাসরঘরে জামাই নাকাল করিতে ভোমরার কাছে কেহ লাগে না। যে জামাইয়ের সাত পুরুষে কেহ গান গাহে নাই, তাকেও নাকি ভোমরা গাধার ডাক ডাকাইয়া ছাড়ে। আর শুনিয়াছি, বিশ্ব-বাংলায় নাকি এমন জামাই আজো জন্মায় নাই, যে ভ্রমরকে কথায় আঁটিয়া উঠে। ভ্রমর পাড়ার সকলের কথাতেই আছে;—এ এমন, সে তেমন, এর সোয়ামী এম্‌নি, তার সোয়ামী তাকে ভালবাসে না, অমুকের সোয়ামী বুড়ো ধাড়ী, অমুক অমুকের সঙ্গে অমুক, অমুক অমুকের ঘরে আড়ি পাতিয়া অমুক দেখিয়াছে, অমুকের সঙ্গে অমুকের মানায় না, তারিণীর স্বামীকে দেখিলে তারিণীর হাড় জ্বলিয়া যায়! —সে চোখ-কান বুজিয়া থাকে—কেবল সমবয়স্কা মেয়েদের ও বৌদেরসঙ্গে তার এই সকল আলোচনা।

এইজন্যই তাহাকে আমার ভাল লাগিত না। বিধবার এসব কেন? শাসনও নাই। এজন্য ভোমরার উপর আমি রাগও করিতে পারিতাম না। একদিন বড় দুঃখ হইল। আমিই তাহাকে নির্জ্জলা একাদশী ধরাইয়াছি। একদিন চৈত্রমাসের দারুণ গ্রীষ্মের দিনে, দুপুর বেলা সে আমার ঘরে বসিয়া আছে,—দেখিলাম ঠোঁট-দুটি একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভ্রমর, মা, আমার কাছে মিথ্যা কথা বোলো না,—তেষ্টা পেয়েছে?" ভ্রমর বলিল—"না"। বিশ্বাস হইল না। আমার চেয়ে সে বয়সে বড়, মেয়ে তো বটে। আদর করিয়া তাহার গায়ে মুখে হাত বুলাইয়া, অনেক করিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে; তাহার চোখদুটি ছল্‌ছল্ করিতে লাগিল; ঠোঁট-দুটি যেন

অলক্ষিতে ফুলিতে লাগিল! তথাপি বলিল "না।" আমি বলিলাম, "তুমি তো এত দিন জল খেয়েছ, তা আজ আমি হাতে করে একটু জল দিই তুমি খাও,—কোনো দোষ হবে না।" শুষ্ককণ্ঠে সে বলিল, "থাক।" আমার বড় কষ্ট বোধ হইল; মনে হইল, আমিই জোর করিয়া তাহাকে এই কষ্ট দিতেছি। তার বাড়ীর লোক তো তাহাকে নির্জ্জলা একাদশী করিতে দিতেন না। এইজন্যই বিধবার একাদশীর দিনে তাহার মুখে জল দিবার প্রস্তাব করিলাম; নহিলে এমন পাপ কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইত না। কিন্তু কিছুতেই তাহাকে জল খাওয়াইতে পারিলাম না। মনে বড় অনুতাপ হইল,—আমারই জন্য একটি মনুষ্য-জীবন এমন করিয়া ব্যর্থ হইয়া মরিতেছে! এজন্মে আবার এইসকল পাপ করিতে সাহসী হইতেছি! কিন্তু কিছুতেই তাহাকে জল খাওয়াইতে পারিলাম না।

২

আমি এখানে আসিতেই আমার দেবর ও ননন্দা বিলক্ষণ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মধ্যে দুই তিনবার আমাকে পাঠাইবার জন্য দাদাকে লিখিয়াছিলেন। দাদা কড়া জবাব দিয়াছিলেন,"পাঠাইব না। কাহার কাছে পাঠাইব? তোমাদের সংসারের দাসীগিরি করিবার জন্য আমার পিতা তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া এত বড়টি করেন নাই। যাহাকে সম্প্রদান করা হইয়াছিল, তিনি নাই; আমার ভগ্নীর গর্ভের সন্তানও নাই, যে আপনাদের বংশের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ হইয়াছে। সামান্য বেতন দিলে চাকরাণী পাইবেন। সংসারে দাসীগিরী করিবার জন্য রূপ-যৌবনের অবশ্য আবশ্যক নাই। আমার ভগ্নীকে পাইবেন না। তাহার পেটের দুটি অন্ন দিবার সংস্থান আমার আছে।"

তারপর এই বিবাহের প্রস্তাবের —এই মহা কেলেঙ্কারীর কথাও কে নাকি বেনামী পত্র লিখিয়া আমার দেবরকে জানাইয়াছিলেন। তাহাতে আমার দেবর স্বয়ং তাঁহার শ্যালক প্রভৃতি কয়েকজন জবরদস্ত সঙ্গী সমভিব্যাহারে আমাকে জোর করিয়া আনিবার জন্য আমাদের গ্রামে গিয়াছিলেন; এবং রাম বসুর বাড়ীতে আসিয়া নামিয়াছিলেন। তখন আমার বিবাহের সমস্তই স্থির। দাদা সেখানে গিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, "বৃথা আপনি আমার ভগ্নীর বিবাহ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, অনর্থক অপমান হইয়া যাইবেন।" তখন আমার দেবর বলেন যে, তিনি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। আইনানুসারে এখন তাঁহারাই আমার অভিভাবক। তাহাতেও দাদা নম্র ভাবে জিজ্ঞাসা করেন,—"স্বামী অভাবে নাবালিকা স্ত্রীলোকের পিতৃকুলে উত্তম আশ্রয় থাকিতেও এবং পিতৃকুল যত্নপূর্ব্বক আশ্রয় দিলেও, যদি আদালত একজন nobody —আপনাকেই আমার সহোদরার অভিভাবক স্থির করেন, এমনই যদি আইনের মহিমা হয়, তথাপি কেমন করিয়া আমার যুবতী ভগ্নীকে আপনারা আমার বাড়ী হইতে লইয়া যাইবেন? সে যদি যাইতে না চায়?" আমার দেবর এই প্রশ্নের উত্তরে একটু ব্যঙ্গরসের হাসি হাসিয়া সদর্পে বলেন, "আবশ্যক হইলে সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে,

এতো আর মগের মুলুক নয়।" দাদা তখন স্পষ্টস্বরে আমার দেবরকে বলিয়া দেন যে, অন্ততঃ ত্রিশ জন নিরপরাধ ব্যক্তির মৃতদেহ প্রফুল্ল ঘোষের হস্তে ধরাশায়ী হইবার পূর্ব্বে তাঁহার ভগ্নীর কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ করিতে সক্ষম হইবে না। তখন দাদার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল! পাড়ার সকলে তাঁহাকে সরাইয়া তাড়াতাড়ি মেজদিদির কাছে রাখিয়া আসিলেন। মেজদিদি ভিন্ন দাদাকে ঠাণ্ডা করিবার মন্ত্র পৃথিবীতে আর কেহ জানিত না।

দাদার সেই দুর্দ্দান্ত স্বভাব বিবাহ হওয়ার কিছু দিন পর হইতেই সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। দাদা আর সে দাদা নাই! জিম্‌নাষ্টিকে একটি সোণার ও তিনটি রূপার মেডেল পাইয়াছিলেন। এখন আর কোনো সখই নাই। দৈবাৎ কখনো দাদাবাবুর সঙ্গে শীকারে গিয়া থাকেন। প্রাণে বড় আঘাত লাগাতেই আজ তাঁহার রক্ত একটু গরম হইয়া উঠিয়াছিল। দাদার স্বভাবের কথা গ্রামের ভদ্রলোকেরা আমার দেবরকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। দাদার চেহারা এবং তৎকালের চক্ষু দেখিয়াই আমার দেবর এবং তাঁহার সঙ্গীরা তাহা অবশ্য অবিলম্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এখন গ্রামের লোকের কাছে যখন শুনিলেন যে, প্রফুল্লকুমারের বজ্রমুষ্টিকে ডরায় না, এমন লোক গ্রামে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহে কেহ বাস করে না, তখন তাঁহারা ভাল মানুষের মত বাড়ী ফিরিয়া যাওয়াই নিরাপদ এবং বুদ্ধিমানের মত কাজ মনে করিলেন।

দাদা অবশ্য শেষে ঠাণ্ডা হইয়া তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং আমাদের বাড়ীতে তাঁহাদের আনিয়া বিশেষ সমাদরে আহারাদি করাইয়াছিলেন। যাইবার সময় আমার দেবর একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া—প্রণাম করিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। দাদা স্বীকার করেন নাই। বলিয়া দিয়াছিলেন, "আমার ভগ্নী আপনাদের সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ স্বীকার করেন না; আর সে আপনাপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট, এজন্য প্রণামও গ্রহণ করিবে না; অতএব সাক্ষাতের আশা ত্যাগ করুন। অভদ্রতা ক্ষমা করিবেন।"

এ সকল কথা আমি মেজদিদি, হিমী ও আদুরীর মুখে শুনিয়াছিলাম। এইজন্যই শ্বশুরালয়ে যাইতে প্রথমে আমার একটু ভয় হইয়াছিল;—লজ্জা করিয়াছিল। কিন্তু আমি চলিয়া আসাতে সকলে বিশেষ আনন্দই প্রকাশ করিয়াছেন। পাড়াশুদ্ধ লোক আমার মতিগতির জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার সময় তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া, বৈঠকখানার পার্শ্ব দিয়া আসিতেছি;—সেদিন রবিবার, এজন্য আমার দেবর বাড়ীতে আছেন;—এমন সময় বৈঠকখানার মধ্য হইতে চাপাস্বরের কথার আওয়াজ কানে গেল। পৃথিবীতে আজো এমন মেয়েমানুষ কেহ জন্মে নাই, যাহার ফিস্‌ফাস্ কথার আওয়াজ কানে গেলে কানের মধ্যে গুড়্‌গুড়্ করিয়া না উঠে।—সে সময় কানের ফাঁকটাও যেন একটু বাড়িয়া যায়। আমি যতই মরিয়া থাকি, জাতির ধর্ম্ম কোথায় যাইবে? ছুপ

করিয়া বৈঠকখানার জানালার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। পুরাতন খড়খড়ি — অনেক ছিদ্র ছিল। তারই মধ্যে একটা ডবল্ পয়সার মাপের ছিদ্র বাছিয়া লইলাম; এবং তারই গায়ে চোখ রগড়ু করিয়া একটু কুঁজো হইয়া দাঁড়াইলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

গৃহসজ্জা।

শয়নগৃহ—শয়নগৃহ বেশ প্রশস্ত হওয়া কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে খাট বা পালঙ্ক থাকা চাই। কারণ নিদ্রা যাইতে হইলে তদুপরি নিদ্রা যাওয়াই প্রশস্ত। ভূ-শয্যায় পীড়ার সম্ভাবনা। বিশেষত নিম্নতলার গৃহ অত্যন্ত আর্দ্র হইয়া থাকে। সুতরাং তথায় যদি খাট না থাকে, তবে পীড়া অনিবার্য্য। উপর তলায় শুইলেও খাট ভিন্ন শয়ন করা উচিত নহে। শয্যার উপর গদি, লেপ ও তদুপরি চাদর ও দুইটি বালিশ থাকা চাই। মশারি শাদা হওয়াই ভাল, কারণ ছারপোকার আবাস-নিবন্ধন তাহাকে মধ্যে মধ্যে ধোপ দিতে হয়। পল্লীগ্রামে মশার উৎপাত অত্যন্ত অধিক। মশার দংশনে ম্যালেরিয়া জ্বরের সৃষ্টি হইয়া থাকে বলিয়া মশারির আবশ্যক অপরিহার্য্য। শয়নগৃহে একটি টেবিল ও চেয়ার থাকিবে। টেবিলের উপর দোয়াত, কলম, কাগজ, ব্লটিং, পেন্সিল ইত্যাদি লিখিবার সরঞ্জাম থাকা উচিত। এতদ্ব্যতীত আলো জ্বালিবার উপ-করণ, যথা—দেশালাই, ল্যাম্প প্রভৃতি শয়ন-কক্ষে থাকা চাই। শয্যাগৃহটি ছবি-দ্বারা সজ্জিত হওয়া আবশ্যক। জলপানের জন্য একসরাই জলও থাকা উচিত। শয্যা-গৃহের জানালাগুলি প্রশস্ত হইবে এবং তদ্দ্বারা বায়ু গমনাগমন উত্তমরূপে হওয়া আবশ্যক। অনেকে বাতাসের ভয়ে শয্যাগৃহের জানালা উন্মুক্ত রাখেন না। এইটি তাঁহাদের অত্যন্ত ভ্রম। বায়ু গমনাগমন না করিলে গৃহাভ্যন্তরের বায়ু দূষিত হইয়া যায় এবং সেই দূষিত বায়ু শ্বাসদ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। যদি বাতাসের অত্যন্ত ভয় হয়, তবে জানালার সমক্ষে শয়ন না করিয়া একটু পার্শ্বে শয্যা করিলেই হইল। পরন্তু বিশুদ্ধ বায়ু আসিবার জন্য জানালা উন্মুক্ত রাখা বিশেষ আবশ্যক। বিশুদ্ধ বাতাস দ্বারা ঘরের দুর্গন্ধও দূরীভূত হয়। অনেক গৃহিণী পান খাইবার জন্য শয়নকক্ষে পানের সরঞ্জাম রাখেন এবং পান প্রস্তুত করার পর চুনের হাত দেওয়ালে বা খাটের গায়ে মুছেন, অথবা পানের পিক গৃহাভ্যন্তরে ফেলেন। তদ্দ্বারা গৃহ অত্যন্ত খারাপ দেখায় এবং স্বাস্থ্যেরও হানি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে একটা পিকদানী এবং একখানা ঝাড়ন রাখিয়া দেওয়া উচিত। পান সাজিয়া সেই হাত ঝাড়নে মুছিলেই সকল ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যাইবে। শয্যাগৃহ হইতে রাত্রে বাহির

হইলেই অনেক ঘরের সম্বন্ধে প্রস্রাব ত্যাগ না এত দুর্গন্ধ হয় যে গৃহে থাকা দুষ্ক প্রাব করিতে হইলে একটি মৃৎপাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া দিয়া তাহাতে প্রস্রাব করা ও প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহা নর্দ্দমায় ফেলিয়া দেওয়া উত্তম নিয়ম। এতদ্দ্বারা দুর্গন্ধ-জনিত গৃহাভ্যন্তরে কোনোরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। পাত্রে জল রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রস্রাবের তলানি জলের অস্তিত্ব-নিবন্ধন পাত্রে বসিতে পারে না; সুতরাং পাত্রেও শীঘ্র দুর্গন্ধ হয় না। ইহা ছাড়া যদি সপ্তাহে একবার করিয়া পাত্রটিকে ফিনাইল দিয়া ধৌত করা হয়, তবে তাহা অপেক্ষা প্রশস্ত উপায় আর কি হইতে পারে।

সজ্জাগৃহ—সজ্জাগৃহের জন্য দেরাজ ও আলনারীর আবশ্যক। বস্ত্রাদি আলমারি বা দেরাজে রাখা কর্ত্তব্য। বস্ত্রগুলি থাক-থাক করিয়া সাজানো থাকিবে। শীতবস্ত্রের থাক, পোষাকী কাপড়ের থাক, আটপৌরে কাপড়ের থাক, ইস্কুলের কাপড়ের থাক ইত্যাদি শৃঙ্খলা-হিসাবে বস্ত্রগুলি রাখিয়া দিলে সময়মত শীঘ্র বাহির করিতে পারা যায়। সূচিকার্য্যের সরঞ্জাম, আর্শি, চিরুনি, ব্রুস, তোয়ালে প্রভৃতি সজ্জাগৃহে রক্ষিত হওয়া উচিত। শীতবস্ত্রগুলিতে ন্যাপ্থলিন দিয়া রাখিয়া দিলে উহারা কাটদষ্ট হয় না। ন্যাপ্থলিন অভাবে নিমপাতা ও কর্পূর দিলেই যথেষ্ট হইবে।

বৈঠকখানা—বৈঠকখানায় গালিচা রাখা কর্ত্তব্য। গৃহটি রীতিমত ছবিদ্বারা সজ্জিত হওয়া চাই, কারণ আগন্তুকগণ বৈঠকখানায় আগমনপূর্ব্বক যদি পরিচ্ছন্নতার অভাব দর্শন করেন, তবে তাঁহাদিগের ধারণা হইবে যে, গৃহকর্ত্রীর কার্য্যে কোনো শৃঙ্খলা নাই। সুতরাং এরূপ ধারণা যাহাতে না হইতে পারে তাহা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বৈঠকখানায় একটি আলমারিতে পুস্তকগুলি সাজানো থাকিবে। একটি টেবিলের উপর হারমোনিয়ম রক্ষিত হওয়া উচিত।

স্নানাগার—স্নানাগারে চৌকি, টব, ঘড়া, ঘটি, মুখ প্রক্ষালন করিবার মঞ্জন, দাঁতন, জীবছোলা, সাবান, তেলের বাটি প্রভৃতি রক্ষিত হওয়াই বিধি।

ভাণ্ডারগৃহ—ভাণ্ডারগৃহে হাঁড়িপাল্লা, কর্কচ্চু, করাত, ছিঁচকে, গজ, ব্রস, হাতুড়ি, গজাল, মোমরোসন, ঔষধ, নিক্তি, কলিক, সাবল, কুড়ুল, কাটারি, কাস্তে প্রভৃতি রক্ষিত হইবে। মাটির ঘড়া বা নাদগুলি সারি-সারি সজ্জিত থাকা আবশ্যক। তন্মধ্যে চাউল, দাইল প্রভৃতি বস্তু রক্ষিত হইবে। ঘড়া বা নাদগুলির মুখ খুরি বা সরাদ্বারা আবৃত থাকা চাই। নাদগুলি উন্মুক্ত থাকিলে ইঁদুরে জিনিষগুলি নষ্ট করিয়া ফেলে। ভাণ্ডারগৃহে খাদ্যের মধ্যে চাউল, গম, এ্যারারুট, সাগু, বার্লি, ব্যাসন, আটা, ময়দা, সুজি, চিনি; দাইলের মধ্যে মুগ, অরহর, ছোলা, কলাই, মসুর, মটর; মসলার মধ্যে হরিদ্রা, জীরে, ধনে, পোস্ত, লঙ্কা, ছোট ও বড় এলাচ, মৌরী, জোয়ান, দারুচিনি, লবঙ্গ, সরিষা, মেথী; শুষ্ক ফলের মধ্যে মনেক্কা, আলু-বোখারা, আঞ্জির, কিসমিস; বাজে জিনিসের মধ্যে চা, চিনি, গুড়, নারিকেল, মোমবাতি, পলিতা, সাবান, জুতার কালি, দেশালাই; ঔষধের মধ্যে ক্যাষ্টর অএল, সোডা, ফটকিরি, গন্ধক, সোরা, নিশাদল, রুবিনীর ক্যাম্ফর; এবং

তৈলের মধ্যে সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, রেড়ির তৈল এবং কেরোসিন তৈল থাকা প্রয়োজনীয়। আটা একসপ্তাহের উপর ভাণ্ডারে কখনো সঞ্চিত করিবে না, কারণ তাহা শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায়। আলানি কাষ্ঠ বর্ষাগমের পূর্ব্বেই সংগ্রহ করা উচিত।

চতুর্থ অধ্যায়।

দাস-দাসী।

যে সকল পরিবার স্বচ্ছল, তাঁহারা প্রায়ই দাস-দাসী রাখেন। যাহারা প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী এরূপ ব্যক্তিদিগকেই দাস-দাসী নিযুক্ত করা উচিত। নতুবা গৃহের অনেক বস্তু চুরি যাইবার সম্ভাবনা। একাধিক দাস-দাসী রাখিলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক ভৃত্য অন্যের বিরুদ্ধে কিছু-না-কিছু বলিয়া থাকে। গৃহকর্ত্রীরা যেন কানভাঙানিতে কর্ণপাত না করেন। যে ভৃত্য শান্তিপ্রিয় এবং কার্য্যে তৎপরতা দেখাইয়া থাকে, তাহার নামে মিথ্যা-পবাদ শুনিলেও শুনিবে না। ভৃত্যের কার্য্য দেখিয়া তাহার উপযুক্ততা নিরূপণ করাই উচিত। দাস-দাসীর প্রতি সদাই সদয় ব্যবহার করিবে।

দাস-দাসীগণ অতি প্রত্যূষে জাগরিত হইয়া স্বীয়-স্বীয় কার্য্যে নিরত থাকিবে। তাহারা প্রথমে ঘর ঝাট দিয়া ঘরের আবর্জ্জনারাশি দূর করিয়া দিবে। এই আবর্জ্জনারাশি দূর করিবার জন্য একটি চুপড়ি আবশ্যক। চুপড়ি না থাকিলে ধূলাগুলি ফেলিতে কষ্ট হইয়া থাকে। গৃহসম্মার্জ্জন-কার্য্য সমাধা হইলে বাসনগুলি পরিষ্কার করিবে। তদনন্তর ল্যাম্পের চিমনিগুলি সাফ করা উচিত। সপ্তাহে একবার করিয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত বস্তুগুলিতে পালিশ দেওয়া কর্ত্তব্য। গৃহের কপাট এবং জানালা, যদি অপরিষ্কার থাকে, তবে অন্য লোকে গৃহিণীকে নোংরা বলিয়া দুষিতে পারে; সুতরাং দাস-দাসীগণ যাহাতে দরজা এবং জানালা পরিষ্কার রাখে তদ্বিষয়ে গৃহিণীর দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

কেরোসিন তৈলের টিন ক্রয় করিলে তাহাতে দুইটি ছিদ্র করিয়া তের্চ্ছাভাবে ধরিলে তাহা হইতে সমস্ত তৈল নিষ্ক্রান্ত হইবে। টিনের উপর গজাল রাখিয়া তদুপরি হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করিলেই ছিদ্র হইয়া যাইবে। এক টিনে ২৫ বোতল তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ল্যাম্পগুলি যদি পরিষ্কার না থাকে তবে তাহা উত্তম আলোক প্রদান করে না। সেজন্য ল্যাম্পগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা বিশেষ আবশ্যক। দগ্ধ পলিতার উপর হাত দিয়া টানিলে দগ্ধস্থানগুলি চ্যুত হইয়া যায়। সে-গুলি কাঁচিদ্বারা কাটিবার আবশ্যক হয় না। পলিতা বক্রুর হইলেই কাঁচির আবশ্যক করে। পলিতা ল্যাম্পের নিম্নদেশে যেন কুণ্ডলিত হইয়া না থাকে; কারণ তৈলে নয়লা থাকে এবং পলিতাতে যদি নয়লা ধরিয়া যায় তবে তৈলকে ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে দেয় না সুতরাং পলিতা ল্যাম্পের নিম্নে কুণ্ডলিত না থাকিয়া কেবল -মাত্র তলদেশ স্পর্শ করিবে। যদি [illegible] আলানো হয়,তবে তাহার আধার [illegible] ধৌত করিয়া পরিষ্কার করাই [illegible] ভাঙিতে হইলে তদুপরি একটি [illegible] রাখিয়া আঘাত করিলে [illegible]

ভৃত্যের জন্য আবশ্যকীয় [illegible]

গৃহসজ্জার [illegible]

তার্পিণ তৈল, শিরীষ এবং [illegible]

সমভাগে মিশ্রিত করিয়া একটি বোতলে রাখিয়া দিবে।

বারাণসীর পিতলের জিনিসগুলি পরিষ্কার করিবার দ্রব্য—একটা লেবু কর্ত্তন করিয়া তাহার অর্দ্ধভাগ দ্বারা পিতলের বস্তুতে ঘর্ষণ করত তৎক্ষণাৎ সাবান এবং জল দিয়া ধৌত করিয়া শুষ্ক করিবার পর পালিস করিবে। এক পাইণ্ট জলে একটি ছোট চামচের এক চামচে sulphuric acid দিয়া ধৌত করিলে সকল ময়লা উঠিয়া যায়। ইহা সর্ব্বোত্তম প্রক্রিয়া।

পিতলের দ্রব্যগুলিতে ঔজ্জ্বল্য দিবার প্রক্রিয়া—নিশাদল-চূর্ণ (sal ammoniac) জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই বস্তুটিতে লাগাইয়া দাও। কাঠ-কয়লার আঁচে সামান্য গরম করিয়া মুছিয়া শুষ্ক করিয়া লও। পরে চোকর দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিবে।

চর্ম্মনির্ম্মিত চেয়ার—চর্ম্মনির্ম্মিত চেয়ার-গুলি যাহাতে ছিঁড়িয়া না যায় তজ্জন্য ডিম্বের শ্বেতসার কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ম্মে লাগাইলে বহুদিন পর্য্যন্ত চর্ম্ম ঠিক থাকে।

কালীর দাগ উঠানো—যদি কার্পেটে দৈবক্রমে কালী পড়িয়া যায়, তবে তাহা কাঁচা অবস্থাতেই তাজা দুগ্ধদ্বারা ধৌত করিয়া উষ্ণ জলে পরিষ্কার করিতে হইবে। দাগটিকে শুষ্ক হইতে দিবে না। বার বার এরূপ করিলে দাগটি উঠিয়া যাইবে। ইহা ধৈর্য্য এবং সময় সাপেক্ষ।

শিকারের জুতা—ইহা পরিষ্কৃত করিতে হইলে রেড়ীর তৈলই প্রশস্ত।

চিমনি পরিষ্কার-প্রথা—একঘটি জল উষ্ণ করিয়া অগ্নি হইতে সেই জল উঠাইয়া লইবে। অতঃপর সেই জলে চিমনিটি ছাড়িয়া দিয়া জল শীতল হওয়া পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে। পরে তাহা হইতে উঠাইয়া পরিষ্কার করিবে।

ল্যাম্পের পলিতা—যদি ল্যাম্পের পলিতা হইতে ধূম নির্গত হইতে থাকে, তবে সেই ধূম রোধ করিবার জন্য পলিতাটি ভিনিগারে ডুবাইয়া লইবে, অথবা তাহাতে উষ্ণ করিয়া লইবে।

তৈলের দাগ উঠানো—কোনো স্থানে তৈলের দাগ ধরিলে তার্পিণ তৈল তাহাতে লাগাইয়া বস্তুটিকে সূর্য্যকিরণে রাখিয়া দিবে। যতক্ষণ বাতাসদ্বারা দুর্গন্ধ দূর না হয়, ততক্ষণ রাখিতে হইবে। ইহাদ্বারা তৈলের দাগ দূরীভূত হয়।

জানালা পরিষ্কারের প্রক্রিয়া—জানালা পরিষ্কার করিতে হইলে বার্নিসগুলি স্পিরিট-অব-ওয়াইন দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া পরিষ্কার জলদ্বারা ধৌত করিবে ও পরে শুষ্ক কাপড় দ্বারা পালিস করিবে।

রেশমী কাপড় হইতে চুল উঠাইবার পদ্ধতি—আটাতে জল দিয়া মাখ-মাখ করিয়া উষ্ণ করিবে। অনন্তর তাহার ভিতরের অংশ গ্রহণপূর্ব্বক হাতে করিয়া তাল পাকাইবে এবং যে-স্থান পরিষ্কার করিতে হইবে, তাহার উপর সেই তালটি স্থাপন করিয়া হস্তদ্বারা টানিলে কেশাদি আটাতে লাগিয়া যাইবে। গম পিশিয়া যে-ময়দা তৈয়ার হয় তাহাকে আটা কহে। তবে ময়দা এবং আটার প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বোক্তটি অত্যন্ত মিহীন এবং শেষোক্তটি কিঞ্চিৎ মোটা।

P 30254

টেবিল হইতে পিপীলিকা দূর করিবার প্রক্রিয়া—একটি ন্যাকড়ায় রেড়ীর তৈল লাগাইয়া টেবিলের পায়ার চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া দিলে পিপীলিকা উঠিতে পারে না।

উই দূরীভূত করণ—যাহাতে উই ধরিতে না পারে, তজ্জন্য আলকাতরা ব্যবহার করাই প্রশস্ত।

কাষ্ঠ হইতে চূনের দাগ ছাড়ানো—কাষ্ঠ হইতে চূনের দাগ উঠাইতে হইলে অর্দ্ধ ছটাক লবণ, অর্দ্ধ ছটাক তৈল এবং দুই ছটাক জলের আবশ্যক। পরে আর্দ্র ঝাড়ন দ্বারা ঘর্ষণ করিবে।

চেটাই পরিষ্কার করণ—চেটাই পরিষ্কার করিতে হইলে তীব্র লবণ এবং জল দ্বারা ধৌত করিয়া ন্যাকড়ার দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

প্লেট পরিষ্কার করণ—জলে প্লেটগুলি উষ্ণ করিয়া লও এবং তাহাতে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি প্রতিসের জলে মিশ্রিত করিয়া দাও; যথা—দুইছটাক লবণ, দুইছটাক ফটকিরি এবং দুইছটাক cream of tartar। এই পাউডারটি একটি শুষ্ক বোতলে রাখিয়া কর্ক লাগাইয়া দিবে। পাঁচ মিনিট কাল উক্ত মিশ্র পদার্থে প্লেটটি সিদ্ধ করার পর শীতল জলে তাহাদিগকে ডুবাইয়া দিবে। অতঃপর এক একটি প্লেট উঠাইয়া লইয়া শুষ্ক ন্যাকড়া দ্বারা মুছিয়া পালিস করিবে।

গ্লাস পরিষ্কার করণ—উষ্ণ জলে ব্যাসন দিয়া ধৌত করাই বিধি। ব্যাসনটিতে সামান্য জল দিয়া মাখ-মাখ করিয়া সাবানের ন্যায় ব্যবহার করিবে।

পিতলের বস্তু পরিষ্কার করণ—ইটের গুঁড়াতে মিঠা তৈল অথবা নিশাদল (sal aminoniac) মিশ্রিত করিয়া বস্তুটিতে লেপ দিবে। অনন্তর ঘর্ষণপূর্ব্বক জলদ্বারা ধৌত করিবে। পরে চোকর দ্বারা পালিস করিবে।

ব্রাস ধৌত-করণ-প্রক্রিয়া—ব্রাস ধৌত করিতে হইলে একটি ক্ষুদ্র চামচের এক চামচে carbonate of soda এক বাটি গরম জলে মিশ্রিত করিয়া ধৌত করিলেই পরিষ্কার হইবে।

পোষাকী-বস্ত্র হইতে তৈলের দাগ ছাড়ানো—এক টুকরা ব্লটিং কাগজ লইয়া তাহার উপর দর্জির উষ্ণ লৌহ (ইস্ত্রি করিবার লৌহপাত্র) রাখিয়া চাপিতে থাক। যতক্ষণ না তৈল ব্লটিং কাগজ দিয়া উঠিয়া আইসে ততক্ষণ এইরূপ করিবে।

চুল ধৌত করিবার প্রক্রিয়া—অর্দ্ধ ছটাক সোহাগা, এক ছটাক কর্পূর, দুই সের ফুটন্ত জলে মিশ্রিত করণানন্তর চুল ধৌত করিবে।

দাঁতের মঞ্জন—সুপারি জ্বালাইয়া গুঁড়া করিয়া তাহাতে সাধারণ লবণ সম-পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

শীলা।

৩

অতি প্রত্যূষেই শীলা উঠিয়া নীচে নামিয়া আসিল। তখন তাহার খুড়ীমা বারান্দায় বসিয়া আছেন ও ব্রাহ্মণকে চায়ের জল গরম করিতে বলিতেছেন। শীলা নিকটে গিয়া বলিল, "খুড়ীমা, আমি কি চা করে দেবো?" গৃহিণী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তা বেশতো, চা কর; ঐ কুলুঙ্গিতে টিনে-করা চা চিনি আছে। ঐ ছুটো চায়ের পেয়ালা আছে। অচ্যুত এখনি দুধ আনবে।" শীলা সেগুলি নামাইয়া বলিল. "চা দানী কই?* গৃহিণী বলিলেন, "ও-সব কিছু নেই বাছা। ঐ বড় এনামেল বাটিটায় চায়ের জল ঢেলে, ছুটো পাতা ফেলে ঐ কাঁসার রেকাবীখানা ঢাকা দাও, তা হলেই হবে। আর ঐ কুলুঙ্গিতেই কানিটুকু আছে, চা ছেঁকে ফেল।"

এমন সময় অচ্যুত দুধ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহিণী তাহার হস্তের দুধ টুকু দেখিয়া বলিলেন, "ঐ টুকু দুধ?"

সে বিরক্ত হইয়া বলিল, "পয়সাটায় দুধ আর কেত্তে হেব মা, সেরে ছুসের খুঁছুছন্তিপরা?"*

গৃহিণী এক পয়সার কথা উল্লেখ করায় অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "চুপ কর, বড় চোপা বেড়েছে, বোস বাবুকে বলে দেবো।"

অচ্যুত অবাক হইয়া রহিল, সে বুঝিল না যে, সে কি অপরাধ করিয়াছে।

শীলা চা ছাঁকিয়া ফেলিল। পরে ছু'পেয়ালা চা প্রস্তুত করিল। গৃহিণী 'অমি অমি' করিয়া ডাকায় অমিয় আসিল। গৃহিণী তাহাকে দিবার বিস্‌কুটের টিনটা আনিতে বলিলেন। অমিয় টিনটা আনিল; তাহা পিপীলিকায় পূর্ণ। সে উহা ঝাড়িবার জন্য অচ্যুতের হাতে দিল। অচ্যুত দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "খা চাটি মানে খা কেত্তে খাইবু।"† এই বলিয়া সে পিপীলিকার প্রাণবধ করিতে আরম্ভ করিল।

অমিয় হাতে এক পেয়ালা চা ও বিস্‌কুট দিয়া গৃহিণী অন্নদাবাবুকে বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন।

গৃহিণী শীলাকে বলিলেন, "তুমি চা খাও?"

"খেতুম, আর খাব না, সেখানে না খেলে বাবা রাগ করতেন। চা আমার ভাল লাগে না।"

গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন," সে কি, খাবে বই কি, অভ্যেস হলে না খেলে চলে না। আমার এক দিদি তো চা না খেলে উঠতেই পারেন না। তিনি রান্নাঘরে গিয়ে শুধু একবাটি চা খেয়ে তবে কাজ করেন। নাও তুমি খাও।"

—কাকা খাবেন না?

—খাবেন বই কি, ওই যে আস্‌ছেন; আচ্ছা ও পেয়ালাটা ওঁকেই দাও। তারপর পাচককে ডাকিয়া বলিলেন, "বামুন ঠাকুর, একটা বাটি দিয়ে যাও তো।"

ব্রাহ্মণ নূতন আসিয়াছে, বাংলা কথা বোঝে না; সে বলিল, "কঁড় কহছন বাটী কঁড়।"†

"বাটি বোঝে না চাকরী করবে কি করে? বল্‌না রে অচ্যুত ছাই বাটিকে

---

* এক পয়সার দুধ কত হবে? এক সের দু'সের খুঁজছেন বুঝি?

* খা পিঁপড়ে কত খানি খা।

† কি বল্‌ছেন, বাটি কি?

কি বলে, একটা 'ঘিনা' দাও।" ব্রাহ্মণ-ঠাকুর 'ঘিনা' ওরফে একটা বাটি আনিয়া দিল। কোথায় লক্ষ্ণৌর সেই হিন্দী, আর কটকের এই উড়িয়া ভাষা, কি অদ্ভুতই লাগিতেছিল।

শীলা রামলোচনবাবুকে চা দিল। তাহার নম্র নত মুখ দেখিয়া রামলোচনবাবুর কেমন স্নেহ হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "তোমার খুবই কষ্ট হচ্ছে না শীলা? দাদা অন্যরকম চালে থাকতেন, আমরা একেবারে ভিন্নভাবে থাকি। আর আমার তেমন অবস্থাও নয়।"

শীলা ব্যস্তভাবে বলিল, "আমার কিচ্ছু কষ্ট হচ্ছে না। কষ্ট যা হবার তা বাবাকে হারিয়েই হয়েছে, তার চেয়ে আর কি কষ্ট হবে!" বলিতে বলিতে তার চোখ অশ্রুপূর্ণ হইল।

রামলোচনবাবু বলিলেন, "আমি অন্নদা-বাবুকে নিয়ে প্রভাতবাবুদের বাসায় যাচ্ছি। তিনি আজ দুপুরেই চলে যাবেন।"

—কাকাবাবু আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?

—যাবেন বই কি। মা অমি, আমার চাদরটা আন। আজ পড়তে গেলি নে, তোর আর কিছু হবে না বাপু।

—দিদিভাই আমায় পড়াবেন।

—সত্যি? তা হলে তো আমার খুবই ভাল হল। তুমি কতদূর পড়েছ শীলা?

—আমাদের ইস্কুলে ইংরাজী ষ্টাণ্ডার্ড-অনুসারে পড়ানো হয়। আমি এনট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়েছিলুম, তারপর বাবা আমায় বাড়ীতে মেম রেখে আরো চের পড়িয়েছেন।

—তা বেশ, তা হলে শীলা তুমিই ওকে পড়িয়ো। ঐ বারাণ্ডার ছোট ঘরটায় বসেই পড়িয়ো। অমি, বেশ লক্ষ্মী হয়ে পড়া কোরো।

রামলোচনবাবু চলিয়া গেলেন। শীলা তার খুড়ীমাকে বলিল, "আর কিছু কাজ নেই?"

—না আর কি কাজ কর্ব্বে বাছা, ঐ অমিকে পড়ানো, ওকি সামান্য কাজ, আমি তো অবাক হয়ে গেছি! মেয়ে মানুষে এত লেখা-পড়া শেখে, আজকাল ছেলেরা কি কর্ব্বে? তোমার বয়স কত হয়েছে?

—আমি উনিশ বছরে পড়েছি।

—উনিশ, ওঃ তা তোমার বাবা কি খৃষ্টান ছিলেন? তোমার মা কি মেম ছিলেন?

—না আমার মা ব্রাহ্ম-ঘরের মেয়ে ছিলেন। লক্ষ্ণৌতে তাঁর বাবা কাজ করতেন, সেই সময়ে আমার বাবাও তথায় যান, পরে তাঁদের বিয়ে হয়।

গৃহিণী চিন্তিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। অমি শীলার হাত ধরিয়া লইয়া গেল।

শীলা অমিকে পড়া বলিয়া দিল। সে নূতন নিয়মে কিণ্ডার গার্টেনের নিয়মানুযায়ী পড়া শিখিয়াছিল; অমিকে অতি সহজে পড়া মুখস্ত করাইয়া দিল। অমিও তাহার কাছে পড়িয়া অত্যন্ত প্রীত হইল।

দ্বিপ্রহরে অন্নদাবাবুর যাত্রার সময় উপস্থিত। আহারের সময় শীলার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি আবার তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামলোচনবাবু আপনার কার্য্যস্থানে গিয়াছিলেন। শীলা বাহিরে যাইবার পর অন্নদাবাবু বলিলেন, "মা আমি চল্লুম, যদি তোমার কোনো কষ্ট হয়, তবে তৎক্ষণাৎ আমায় জানিয়ো। আমি গৃহ-

সুস্থ লোক। (বহুদিন হইল অন্নদাবাবুর স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, দুই কন্যা বিবাহিতা হইয়া স্বামীর ঘরে আছেন) নতুবা; আমি তোমায় আমার কাছে রাখতুম। আমি বুঝতে পারচি তোমার সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষা, ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে সব সহ্য কোরো। তোমার পিতৃ-আজ্ঞা—সেই আজ্ঞা পালন করলেই তুমি সুখী হবে।"

শীলার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। সেই সুকুমার গৌরবর্ণ আনন আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল! অন্নদাবাবু তাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, "ছি কেঁদ না মা, যদি নিতান্ত না থাকতে পার, আমায় সংবাদ দিয়ো। যদি কোনো কষ্ট হয়, আমায় জানিয়ো। রামলোচনবাবু তোমার পিতার সহোদর না হলেও ভ্রাতা। তোমায় তিনি স্নেহ করবেনই। তদ্ভিন্ন প্রভাতবাবুর মা তোমায় সর্ব্বদা নিয়ে যাবেন। তাঁদের বাটীতে গেলে অনেকের সঙ্গে পরিচিত হবে। তোমার তা'হলে এখানে বাস করা কঠিন হবে না। আমি রামলোচনবাবুকে বলে দিয়েছি, তুমি ব্রাহ্ম-ঘরের মেয়ে, তোমায় যেন হিন্দু ঘরের কন্যার মত বন্দী করে না রাখেন। তিনি তাতে সম্মত হয়েছেন। তুমি প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকাটা তোমার খরচ বলে' তাঁরি হাতে দিয়ো, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

এমন সময় অচ্যুত আসিয়া বলিল, "গাড়ী কেত্তে বেলে আসিলানি। রেল গাড়ির টেম হেইগলা আপন চিবা পরা।* অন্নদাবাবু হাসিয়া বলিলেন, "কি যে কড়মড় করে বুঝি না। কি বোলছো বাপু? গাড়ী আয়া হ্যায়? আচ্ছা উসকো খোড়া ঠহরণে বোলো।"

—গাড়ী তো ঠহরবে, সরকারের রেল ভি ডরর মারে ঠহরি চিব? টেম যে হেই গলা।†

"—তবে আসি মা। চিঠি দিয়ো, সর্ব্বদা যেন খবর পাই। আমার অনু-নীরুও যা, তুমিও তাই।"

শীলা কাঁদিয়া ফেলিল ও নমস্কার করিয়া বলিল, "কাকাবাবু, আজ আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমার লক্ষ্ণৌর সব বন্ধন ছিঁড়ে গেলো।"

অন্নদাবাবু পুনরায় তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলেন।

অমি নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। দিদি-ভাইয়ের চোখের জলে সে বিশেষ ব্যথিত হইতেছিল। সে শীলার মুখের কাপড় সরাইয়া বলিল, "দিদিভাই, তুমি কেঁদ না, আমি তোমায় কোনো কষ্ট পেতে দেবো না আমি তোমায় দেখবো, যত্ন করব।" তার কথা শুনিয়া ও গম্ভীর মুখের ভাব দেখিয়া শীলার সেই দুঃখেও হাসি আসিল। সে চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

অমি বলিল, "চল দিদিভাই, আমরা ঐ জমীদারবাবুর বাগানে যাই।"

—মা যে বকবেন।

—মা এখন ঘুমুচ্ছেন, মা কি করে জানবেন, ঐ বাগান দিয়ে ঠিক নদীর ধারে যাওয়া যায়। ওখানে ওঁদের কেমন একটি বোট আছে, বোটের ঘর আছে। চল না দিদিভাই।

---

* গাড়ী কখন এসেছে, রেলের টাইম হয়ে গেল আপনি না আজ যাবেন?

† গাড়ী তো দাঁড়াবে, কিন্তু সরকারের রেলও কি ভয়ে দাঁড়াবে?—বেলা যে হল।

—আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে। আমি কাল কোনো বিশেষ কাজের জন্ত রামলোচন-বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরবো।

—আমি কি তাঁকে আপনার কথা বলবো?

—না তা আর বলবেন না, আমি নিজে গিয়েই যা-বলবার বলবো। ঐ যে অমিয় ফিরে আসছে।

অমিয় আসিয়া দিদিভাইয়ের হাত ধরিয়া বলিল, "দিদিভাই চল বাড়ী যাবে।"

শীলা তাহার সহিত গৃহাভিমুখে অগ্রসর হয় দেখিয়া, সুপ্রকাশ নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আবার দেখা হবে।"

শীলা অমিয়র সহিত চলিয়া গেল। তাহারা বাটীর একপার্শ্ব দিয়া আসিয়াছিল। প্রাঙ্গণে যেই প্রবেশ করিল, অমনি বামুন ঠাকুর বলিল, —"কাঁহি যাইথিল? মা বড়া রিষা হউছন্তি। কো আড়র মেম মানে আসিলন্তি। দিদিরে খুঁজুছন্তি পরা। মুহানে এসব খোকা বাবুর খেল। কো আড়ে লুকি থিলে মু যে হুড়ি হুড়ি হয়রান হইগলি।" *

শীলা ইহার এক বর্ণও বুঝিল না, অমিয় শীলাকে বলিল,—"বামুন ঠাকুর বলছে কোন মেমেরা এসেছে। তোমায় দেখতে এসেছে বুঝি দিদিভাই? না হলে আমাদের বাড়ীতে তো মেম আসে না।"

শীলা তাহার সহিত বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। সম্মুখেই দুখানা ভগ্নপ্রায় চেয়ারে দুইজন সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহিণী ও বধূ বা কন্যা বসিয়া আছেন। গৃহিণীর সাজসজ্জা বিধবার মত। শুভ্র বস্ত্র পরিধান, কিন্তু গায়ে জ্যাকেট আছে ও একখানি রেশমের চাদরে দেহ আচ্ছাদিত। বধূ বা কন্যা আধুনিক বেশ-ভূষায় সজ্জিতা, পায়ে জুতা-মোজা। সুন্দরী না হইলেও বেশ সুন্দর নম্র মুখ। শীলা সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। সে যেন এখন আর এ-প্রকার সমাজের লোকদের সহিত মিলিবার উপযুক্ত নহে। দুইদিন পুড়ীমার বাড়ী আসিয়া তাহার অন্ত সমাজের সহিত যেন মধ্যে এক সমুদ্রের ব্যবধান আসিয়াছে! বর্ষীয়সী মহিলা মুগ্ধনেত্রে শীলার প্রতি চাহিয়াছিলেন। তাঁহার কেশরাশি খোলা রহিয়াছে। যেন শ্যামল পল্লবের মধ্যে গোলাপপুষ্পতুল্য মুখখানি প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। বেশ-ভূষা কিছু নাই, তবু মুখের কি শ্রী! শীলার পুড়ীমা শীলাকে দেখিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এঁরা যে অনেকক্ষণ এসেছেন। ইনি প্রভাতবাবুর মা, আর ইনি প্রভাতবাবুর স্ত্রী।" এই বলিয়া উভয়কে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। প্রভাতবাবুর মাতা শীলাকে সস্নেহে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "এস মা বস, তোমার নাম কি?"

—চারুশীলা, কিন্তু আমায় সবাই শীলা বলেই ডাকে।

প্রভাতবাবুর স্ত্রীর ডাকনাম বেলা। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বেশ হবে না, মা, বেলা আর শীলা; আমাদের আর চারুতে কাজ নেই, কি বল?"

প্রভাতবাবুর মা হাসিয়া বলিলেন, "এখন চুপ কর বাছা, সে-সব কথা পরে হবে।" তারপর শীলার হাত ধরিয়া গৃহিণীকে বলিলেন,

* কোথায় গিয়াছিলে? মা রাগ করছেন। কোথাকার-মেমেরা এসে দিদিকে খুঁজছে। আমি আমি এসব খোকাবাবুর খেলা। কোথায় লুকিয়েছিলে, আমি যে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হলাম।

ভঙ্গ করেছি।" লীলা কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া বলিল,—"আমরাই না-জেনে এ বাগানে এসেছি। অমিয় বলিল,—'এ-বাগান জনশূন্য—কেউ থাকে না', তাই এসেছি।"

অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, "আমিও এখানে নূতন এসেছি, শুনলুম এ বাড়ীটি খুব সুন্দর, তাই দেখতে এসেছিলুম। আমি এই বাগানের শেষেই একটি ছোট বাড়ীতে এসে আছি। এদেশ আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, আমিও সকলের অপরিচিত।"

লীলা বলিল, "আমিও তাই।"

—আমি রামলোচনবাবুর সহিত দেখা কোরবো, তাঁর বাড়ী কোথায় জানেন কি?

—জানি বই কি, তিনি আমার কাকা হন। এই বাটীর অপর পার্শ্বেই তাঁর বাটী। ওই যে অমিয়ও আসছে।

—ওটি বুঝি আপনার ভাই?

—আমার খুড়তুত ভাই।

অমিয় আসিয়া একদৃষ্টে অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি চাহিয়া রহিল। অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, "তোমার নাম কি? তুমি কি এই বাগানে বেড়াতে ভালবাস?" অমিয় লুকাইয়া বাগানে আসে। আজ দিদিভাইয়ের সহিত আসিয়া অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে পড়ায় অতিশয় লজ্জিত হইল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "আমি প্রায়ই আসি, মালীরা আমায় চেনে, আমায় বকে না। দিদিভাই কেবল আজ এসেছেন। তিনি কিছুতেই আসছিলেন না, আমি জোর করে নিয়ে এলুম। মা জানলে কত রাগ করবেন"।

—তোমার হাতে ও কি?

—কাগজের নৌকো, জলে ভাসাবো বলে মালীর ঘর থেকে করে এনেছি।

—আচ্ছা দৌড়ে ভাসিয়ে এসো, আমি এখান থেকে দেখছি।

অপরিচিত ব্যক্তির মুখে কেমন এক সুন্দর ভাব ছিল যে, তাঁহাকে দেখিয়া বালকের মনে ভয়ের সঞ্চার হয় নাই। তাহার দিদি-ভাইকে ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল না, তবু সে জলে নৌকা ভাসাইতে গেল।

অপরিচিত ব্যক্তি লীলাকে বলিলেন, "আপনি এখানে নূতন এসেছেন। আপনার পিতার নাম কি?"

—আমার পিতা সম্প্রতি ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর নাম অভয়াচরণ মিত্র, তিনি লক্ষ্ণৌতে বাস করতেন।

—আপনি লক্ষ্ণৌর অভয়াবাবুর কন্যা! তিনি কি সুন্দর বেহালা বাজাতেন! তাঁর বেহালা শুনে না-কেঁদে থাকা যেত না।

লীলা আগ্রহের সহিত বলিল, "আপনি আমার বাবাকে জানতেন?"

—খুব জানতুম, সে-বছর বম্বেতে আমি তাঁর বাসায় গিয়েছিলুম, তাঁর গান-বাজনা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলুম।

—আপনার নাম জানলে মনে করতে পারি যে, বাবা আপনার নাম কখনো বলেছেন কি না।

—আমার নাম সুপ্রকাশ রায়।

লীলা নিরুত্তরে রহিল।

—আপনি বোধ হয় তখন ইস্কুলে ছিলেন।

—তা হবে। এদেশ আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমার বাবাকে আপনি জানতেন শুনে আনন্দিত হলুম।

—আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে। আমি কাল কোনো বিশেষ কাজের জন্ত রামলোচন-বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরবো।

—আমি কি তাঁকে আপনার কথা বলবো?

—না তা আর বলবেন না, আমি নিজে গিয়েই যা-বলবার বলবো। ঐ যে অমিয় ফিরে আসছে।

অমিয় আসিয়া দিদিভাইয়ের হাত ধরিয়া বলিল, "দিদিভাই চল বাড়ী যাবে।"

শীলা তাহার সহিত গৃহাভিমুখে অগ্রসর হয় দেখিয়া সুপ্রকাশ নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আবার দেখা হবে।"

শীলা অমিয়র সহিত চলিয়া গেল। তাহারা বাটীর একপার্শ্ব দিয়া আসিয়াছিল। প্রাঙ্গণে যেই প্রবেশ করিল, অমনি বামুন ঠাকুর বলিল, —"কাঁহি যাইথিল? মা বড়া রিষা হউছন্তি। কো আড়র মেম মানে আসিলন্তি। দিদিরে খুঁজুছন্তি পরা। মুজানে এসব খোকা বাবুর খেল। কো আড়ে লুকি থিলে মু যে মুড়ি মুড়ি হয়রান হইগলি।" *

শীলা ইহার এক বর্ণও বুঝিল না, অমিয় শীলাকে বলিল,—"বামুন ঠাকুর বলছে কোন মেমেরা এসেছে। তোমায় দেখতে এসেছে বুঝি দিদিভাই? না হলে আমাদের বাড়ীতে তো মেম আসে না।"

শীলা তাহার সহিত বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। সম্মুখেই দুখানা ভগ্নপ্রায় চেয়ারে দুইজন সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহিণী ও বধূ বা কন্যা বসিয়া আছেন। গৃহিণীর সাজসজ্জা বিধবার মত। শুভ্র বস্ত্র পরিধান, কিন্তু গায়ে জ্যাকেট আছে ও একখানি রেশমের চাদরে দেহ আচ্ছাদিত। বধূ বা কন্যা আধুনিক বেশ-ভূষায় সজ্জিতা, পায়ে জুতা-মোজা। সুন্দরী না হইলেও বেশ সুন্দর নম্র মুখ। শীলা সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। সে যেন এখন আর এ-প্রকার সমাজের লোকদের সহিত মিলিবার উপযুক্ত নহে। দুইদিন খুড়ী-মার বাড়ী আসিয়া তাহার অন্য সমাজের সহিত যেন মধ্যে এক সমুদ্রের ব্যবধান আসিয়াছে। বর্ষীয়সী মহিলা মুক্তনেত্রে শীলার প্রতি চাহিয়াছিলেন। তাঁহার কেশরাশি খোলা রহিয়াছে। যেন শ্যামল পল্লবের মধ্যে গোলাপপুষ্পতুল্য মুখখানি প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। বেশ-ভূষা কিছু নাই, তবু মুখের কি শ্রী! শীলার খুড়ীমা শীলাকে দেখিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এঁরা যে অনেকক্ষণ এসেছেন। ইনি প্রভাতবাবুর মা, আর ইনি প্রভাতবাবুর স্ত্রী।" এই বলিয়া উভয়কে নির্দেশ করিয়া দিলেন। প্রভাতবাবুর মাতা শীলাকে সস্নেহে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "এস মা বস, তোমার নাম কি?"

—চারুশীলা, কিন্তু আমায় সবাই শীলা বলেই ডাকে।

প্রভাতবাবুর স্ত্রীর ডাকনাম বেলা। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বেশ হবে না মা, বেলা আর শীলা; আমাদের আর চারুতে কাজ নেই, কি বল?"

প্রভাতবাবুর মা হাসিয়া বলিলেন, "এখন চুপ কর বাছা, সে-সব কথা পরে হবে।" তার-পর শীলার হাত ধরিয়া গৃহিণীকে বলিলেন,

---

* কোথায় গিয়াছিলে? মা রাগ করেছেন। তোমাকে মেমেরা এসে দিদিকে খুঁজছে। আমি জানি এসব খোকাবাবুর খেলা। কোথায় লুকিয়েছিলে, আমি যে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হলাম।

ভঙ্গ করেছি।" শীলা কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া বলিল,—"আমরাই না-জেনে এ বাগানে এসেছি। অমিয় বলিল,—'এ-বাগান জনশূন্য—কেউ থাকে না', তাই এসেছি।"

অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, "আমিও এখানে নূতন এসেছি, শুনলুম এ বাড়ীটি খুব সুন্দর, তাই দেখতে এসেছিলুম। আমি এই বাগানের শেষেই একটি ছোট বাড়ীতে এসে আছি। এদেশ আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, আমিও সকলের অপরিচিত।"

শীলা বলিল, "আমিও তাই।"

—আমি রামলোচনবাবুর সহিত দেখা কোরবো, তাঁর বাড়ী কোথায় জানেন কি?

—জানি বই কি, তিনি আমার কাকা হন। এই বাটীর অপর পার্শ্বেই তাঁর বাটী। ওই যে অমিয়ও আসছে।

—ওটি বুঝি আপনার ভাই?

—আমার খুড়তুত ভাই।

অমিয় আসিয়া একদৃষ্টে অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি চাহিয়া রহিল। অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, "তোমার নাম কি? তুমি কি এই বাগানে বেড়াতে ভালবাস?" অমিয় লুকাইয়া বাগানে আসে। আজ দিদিভাইয়ের সহিত আসিয়া অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে পড়ায় অতিশয় লজ্জিত হইল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "আমি প্রায়ই আসি, মালীরা আমায় চেনে, আমায় বকে না। দিদিভাই কেবল আজ এসেছেন। তিনি কিছুতেই আসছিলেন না, আমি জোর করে নিয়ে এলুম। মা জান্‌লে কত রাগ করবেন"।

—তোমার হাতে ও কি?

—কাগজের নৌকো, জলে ভাসাবো বলে মালীর ঘর থেকে করে এনেছি।

—আচ্ছা দৌড়ে ভাসিয়ে এসো, আমি এখান থেকে দেখছি।

অপরিচিত ব্যক্তির মুখে কেমন এক সুন্দর ভাব ছিল যে, তাঁহাকে দেখিয়া বালকের মনে ভয়ের সঞ্চার হয় নাই। তাহার দিদি-ভাইকে ছাড়িয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল না, তবু সে জলে নৌকা ভাসাইতে গেল।

অপরিচিত ব্যক্তি শীলাকে বলিলেন, "আপনি এখানে নূতন এসেছেন। আপনার পিতার নাম কি?"

—আমার পিতা সম্প্রতি ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর নাম অভয়াচরণ মিত্র, তিনি লক্ষ্ণৌতে বাস করতেন।

—আপনি লক্ষ্ণৌর অভয়াবাবুর কন্যা! তিনি কি সুন্দর বেহালা বাজাতেন! তাঁর বেহালা শুনে না-কেঁদে থাকা যেত না।

শীলা আগ্রহের সহিত বলিল, "আপনি আমার বাবাকে জানতেন?"

—খুব জানতুম, সে-বছর বম্বেতে আমি তাঁর বাসায় গিয়েছিলুম, তাঁর গান-বাজনা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলুম।

—আপনার নাম জানলে মনে করতে পারি যে, বাবা আপনার নাম কখনো বলেছেন কি না।

—আমার নাম সুপ্রকাশ রায়।

শীলা নিরুত্তরে রহিল।

—আপনি বোধ হয় তখন ইস্কুলে ছিলেন।

—তা হবে। এদেশ আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমার বাবাকে আপনি জানতেন শুনে আনন্দিত হলুম।

আমার সেইজন্যই এখানে পাঠিয়েছেন। তিনি খুব সম্ভব এই শীতকালেই আসবেন।

—মিঃ রায় আসবেন? আচ্ছা আসুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে!

সুপ্রকাশ অমিকে বলিলেন, "তুমি ও-বাগানে যেয়ো, আমি এখন ওখানেই থাকবো, কিছু ভয় পেয়ো না।" তারপর নীলাকে নমস্কার করিয়া অগ্রসর হইয়া গেলেন। রামলোচনবাবু তাঁহাকে মিঃ রায়ের বিষয় দুচার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিশেষ উত্তর পাইলেন না। তিনি বলিলেন, "যা জানতে চান, তাঁর উকীলের ঠিকানায় তাঁকে পত্রে জানাবেন। আমায় কয়েকটি কাজের ভার দিয়েছেন তাই আমি এসেছি।"

—না, এই ম্যানেজারিটার জন্য বলছিলুম, আমি তো দরখাস্ত কোরবোই, কিন্তু আপনি যদি একটু লেখেন তো বড় ভাল হয়।

"—আচ্ছা আমি তা লিখবো। এখন তবে আসি।" যাইবার সময় তাঁহার উৎসুক নয়ন আবার সেই ক্ষুদ্র কক্ষের দিকে পড়িল। কিন্তু নীলাকে দেখা গেল না, তিনি চলিয়া গেলেন।

রামলোচনবাবু অন্তঃপুরে গমন করিবার সময় নীলাকে বলিলেন, "সুপ্রকাশবাবুর সহিত দেখা হলে কথা বোলো, যদিও আমাদের সমাজে ওসব চলে না, কিন্তু তোমায় তো আমাদের মত রাখলে চলবে না; তবে বেশি মেলামেশা কারো সঙ্গে কোরো না। তোমরা কিভাবে মানুষ হয়েছ, আমি কিছুই জানি নে। যখন সকলকার সামনে বাহির হও, তখন কথা বলবে না কেন। এই তো প্রভাতবাবুর স্ত্রী খোলা গাড়ীতে ঘুরে বেড়ান। তবে আমাদের ঘরে ওসব পোষায় না।"

নীলা বলিল, "আমি এখানে সকলকার সঙ্গে কেন মিশবো? বাবা একলা ছিলেন, আর আমরা চিরকাল লক্ষ্ণৌতে ছিলুম, তাই সকলকার সঙ্গেই জানাশোনা ছিল। সুপ্রকাশবাবু কাল বলছিলেন, তিনি বাবাকে চিনতেন। তিনিই আগে কথা বললেন, তাই উত্তর দিলুম। আপনারা যেমনভাবে বলবেন আমি সেই ভাবেই থাকবো।"

—তোমার যাতে ভাল হয় আমি তাতেই সুখী হব। তুমি আমার দাদার মেয়ে, এত দিন তোমায় দেখি নি, মায়াও পড়ে নি। এখন তোমায় দেখে পর্য্যন্ত মনে হয়, তোমার ভাল হলেই সুখী হব। সুপ্রকাশবাবু যখন মিঃ রায়ের আত্মীয়, তখন ভাল লোকই হবেন। তাঁর সঙ্গে ভাল ভাব রাখাই ভাল। যখন একবার কথা বলেছ, তখন আর কথা বন্ধ করবে কি করে? তা ছাড়া তোমাকে এখন ঐ-সব দলেই মিশতে হবে।

তাহার পর তিনি অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। এমন সময় দুইজন চাকর তত্ত্ব লইয়া আসিয়া উপস্থিত। অমি তাহাদের লইয়া ভিতরে গেল। নীলা উপরে আপনার কক্ষে চলিয়া গেল।

প্রভাতবাবুর মা মাছ-তরকারি ও ফল পাঠাইয়াছেন। রামলোচনবাবু ও গৃহিণী তাহা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। কাঁচা মাছ-তরকারি বা ফলে তো দোষ নাই; সেগুলি রাখিয়া চাকরদের কিছু বখশিস দিয়া বিদায় করিলেন। তাহারা যাইবার সময় বলিয়া গেল, ঠিক ৩টার সময় গাড়ী আসিবে।

নীলা তিনটার পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইল। একখানি শুভ্র রেশমের বস্ত্র পরিধান করিল,

তিনি কটক আসেন নাই। কটকের বাহিরে নানাস্থানে তাঁর জমিদারী ও বাটী আছে। সম্প্রতি তাঁহার কটকের জমিদারীর ম্যানেজার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই কার্য্যের জন্য রামলোচনবাবু যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। রামলোচনবাবু যে-বাড়ীতে বাস করেন, তাহাও ঐ জমিদারের বাড়ী; এবং যে-ইস্কুলে তিনি কাজ করেন, তাহাও ঐ জমিদারের। তিনি পত্র পড়িয়া সুপ্রকাশকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "বসুন চাবি এনে দিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সুপ্রকাশ সেই উন্মুক্ত দ্বারের নিকট গিয়া নীলাকে নমস্কার করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি বুঝি আপনার ছাত্র।"

নীলা লজ্জিত হইয়া বলিল, "হাঁ এ দু'দিন আমিই ওকে পড়াচ্ছি।"

অমি বলিল, "দেখুন আমি মোটে মুখস্থ করতে পারতুম না, দিদিভাই আসা অবধি কত শীঘ্র পারি।" এই বলিয়া সে আবৃত্ত করিল,

The boy stood on the burning deck,

ক্রমাগত এই লাইন বলিয়া যায়, আর দ্বিতীয় লাইন মনে করিতে পারিতেছিল না, দেখিয়া সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিলেন,

Whence all but he had fled.

অমি 'হয়েছে' বলে তার পরের লাইন বলিয়া গেল ও শেষে বলিল, "আপনার এত মনে আছে!"

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি পড়া কর।" তারপর নীলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কি এখানে আর কাকেও জানেন না?"

—না কাল প্রভাতবাবুর মা এসেছিলেন, আজ আমায় নিমন্ত্রণ করেছেন।

—কোন্ প্রভাতবাবু? প্রভাত বসু? যার ভাই সুব্রত এবার ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছেন?

আমি তা জানি নে; আমার বাবাবাবু বলে গেলেন, আমার মায়ের সঙ্গে এঁদের পরিচয় ছিল; আর বাবাও আমায় বলে গেছেন যেন এঁদের বাড়ী যাওয়া-আসা করি।

এমন সময় রামলোচনবাবু আসিয়া বলিলেন, "এই নিন মশায় চাবি, ও আপনি বুঝি অমির পড়া দেখছেন?"

—কাল অমি ও তার দিদির সঙ্গে নদীর ধারে দেখা হয়েছিল, তাই পরিচয়ও হয়ে গেছে।

—নীলাকেও দেখেছেন? কই নীলা তো বাড়ী এসে কিছু বলে নি!

—এ আর কি বলবেন, ওঁর কি অত মনে আছে? তা আপনার ছেলেটি বেশ পড়ে, বেশ বুদ্ধিমান্ ছেলেটি, আমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে। কি বল অমি?

পুত্রের প্রশংসায় কোন্ পিতার হৃদয় না উল্লাসিত হয়। রামলোচনবাবু হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "নীলা আমার দাদার মেয়ে, দাদা ব্রাহ্ম ছিলেন।"

—আমি তাঁকে খুব জানতুম; কি সুকণ্ঠই তিনি ছিলেন। দুঃখের বিষয় সে-কণ্ঠ বাংলা দেশের কেউ শুনলে না।

রামলোচনবাবু আশ্চর্য্যভাবে বলিলেন, "আপনি তা হলে দাদাকেও জানতেন? আপনার বাসা কোথায় হয়েছে? ও-বাড়ী তো আজ ক'বছর বন্ধ!"

—আমি নদীর ধারে ছোট বাংলোতে আছি: আমি ও-বাড়ী মেরামত কোরবো। মিঃ রায়

আমার সেইজন্যই এখানে পাঠিয়েছেন। তিনি খুব সম্ভব এই শীতকালেই আসবেন।

—মিঃ রায় আসবেন? আচ্ছা আসুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে!

সুপ্রকাশ অমিকে বলিলেন, "তুমি ও-বাগানে যেয়ো, আমি এখন ওখানেই থাকবো, কিছু ভয় পেয়ো না।" তারপর শীলাকে নমস্কার করিয়া অগ্রসর হইয়া গেলেন। রামলোচনবাবু তাঁহাকে মিঃ রায়ের বিষয় দুচার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিশেষ উত্তর পাইলেন না। তিনি বলিলেন, "যা জানতে চান, তাঁর উকীলের ঠিকানায় তাঁকে পত্রে জানাবেন। আমায় কয়েকটি কাজের ভার দিয়েছেন তাই আমি এসেছি।"

—না, এই ম্যানেজারিটার জন্য বলছিলুম, আমি তো দরখাস্ত কোরবোই, কিন্তু আপনি যদি একটু লেখেন তো বড় ভাল হয়।

"—আচ্ছা আমি তা লিখবো। এখন তবে আসি।" যাইবার সময় তাঁহার উৎসুক নয়ন আবার সেই ক্ষুদ্র কক্ষের দিকে পড়িল। কিন্তু শীলাকে দেখা গেল না, তিনি চলিয়া গেলেন।

রামলোচনবাবু অন্তঃপুরে গমন করিবার সময় শীলাকে বলিলেন, "সুপ্রকাশবাবুর সহিত দেখা হলে কথা বোলো, যদিও আমাদের সমাজে ওসব চলে না, কিন্তু তোমায় তো আমাদের মত রাখলে চলবে না; তবে বেশি মেলামেশা কারো সঙ্গে কোরো না। তোমরা কিভাবে মানুষ হয়েছ, আমি কিছুই জানি নে। যখন সকলকার সামনে বাহির হও, তখন কথা বলবে না কেন। এই তো প্রভাতবাবুর স্ত্রী খোলা গাড়ীতে ঘুরে বেড়ান। তবে আমাদের ঘরে ওসব পোষায় না।"

শীলা বলিল, "আমি এখানে সকলকার সঙ্গে কেন মিশবো? বাবা একলা ছিলেন, আর আমরা চিরকাল লক্ষ্ণৌতে ছিলুম, তাই সকলকার সঙ্গেই জানাশোনা ছিল। সুপ্রকাশবাবু কাল বলছিলেন, তিনি বাবাকে চিনতেন। তিনিই আগে কথা বললেন, তাই উত্তর দিলুম। আপনারা যেমনভাবে বলবেন আমি সেই ভাবেই থাকবো।"

—তোমার যাতে ভাল হয় আমি তাতেই সুখী হব। তুমি আমার দাদার মেয়ে, এত দিন তোমায় দেখি নি, মায়াও পড়ে নি। এখন তোমায় দেখে পর্যন্ত মনে হয়, তোমার ভাল হলেই সুখী হব। সুপ্রকাশবাবু যখন মিঃ রায়ের আত্মীয়, তখন ভাল লোকই হবেন। তাঁর সঙ্গে ভাল ভাব রাখাই ভাল। যখন একবার কথা বলেছ, তখন আর কথা বন্ধ করবে কি করে? তা ছাড়া তোমাকে এখন ঐ-সব দলেই মিশতে হবে।

তাহার পর তিনি অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। এমন সময় দুইজন চাকর তত্ত্ব লইয়া আসিয়া উপস্থিত। অমি তাহাদের লইয়া ভিতরে গেল। শীলা উপরে আপনার কক্ষে চলিয়া গেল।

প্রভাতবাবুর মা মাছ-তরকারি ও ফল পাঠাইয়াছেন। রামলোচনবাবু ও গৃহিণী তাহা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। কাঁচা মাছ-তরকারি বা ফলে তো দোষ নাই; সেগুলি রাখিয়া চাকরদের কিছু বখশিস দিয়া বিদায় করিলেন। তাহারা যাইবার সময় বলিয়া গেল, ঠিক ৩টার সময় গাড়ী আসিবে।

শীলা তিনটার পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইল। একখানি শুভ্র রেশমের বস্ত্র পরিধান করিল,

তিনি কটক আসেন নাই। কটকের বাহিরে নানাস্থানে তাঁর জমিদারী ও বাটী আছে। সম্প্রতি তাঁহার কটকের জমিদারীর ম্যানেজার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই কার্য্যের জন্য রামলোচনবাবু যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। রামলোচনবাবু যে-বাড়ীতে বাস করেন, তাহাও ঐ জমিদারের বাড়ী; এবং যে-ইস্কুলে তিনি কাজ করেন, তাহাও ঐ জমিদারের। তিনি পত্র পড়িয়া সুপ্রকাশকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "বসুন চাবি এনে দিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সুপ্রকাশ সেই উন্মুক্ত দ্বারের নিকট গিয়া নীলাকে নমস্কার করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি বুঝি আপনার ছাত্র।"

নীলা লজ্জিত হইয়া বলিল, "হাঁ এ দু'দিন আমিই ওকে পড়াচ্ছি।"

অমি বলিল, "দেখুন আমি মোটে মুখস্থ করতে পারতুম না, দিদিভাই আসা অবধি কত শীঘ্র পারি।" এই বলিয়া সে আরম্ভ করিল,

The boy stood on the burning deck,

ক্রমাগত এই লাইন বলিয়া যায়, আর দ্বিতীয় লাইন মনে করিতে পারিতেছিল না, দেখিয়া সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিলেন,

Whence all but he had fled.

অমি 'হয়েছে' বলে তার পরের লাইন বলিয়া গেল ও শেষে বলিল, "আপনার এত মনে আছে!"

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি পড়া কর।" তারপর নীলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কি এখানে আর কাকেও জানেন না?"

—না কাল প্রভাতবাবুর মা এসেছিলেন, আজ আমায় নিমন্ত্রণ করেছেন।

—কোন্ প্রভাতবাবু? প্রভাত বসু? যাঁর ভাই সুব্রত এবার বারিষ্টার হয়ে এসেছেন?

আমি তা জানি নে; আমায় কাকাবাবু বলে গেলেন, আমার মায়ের সঙ্গে এঁদের পরিচয় ছিল; আর বাবাও আমায় বলে গেছেন যেন এঁদের বাড়ী যাওয়া-আসা করি।

এমন সময় রামলোচনবাবু আসিয়া বলিলেন, "এই নিন মশায় চাবি, ও আপনি বুঝি অমির পড়া দেখছেন!"

—কাল অমি ও তার দিদির সঙ্গে নদীর ধারে দেখা হয়েছিল, তাই পরিচয়ও হয়ে গেছে।

—নীলাকেও দেখেছেন? কই নীলা তো বাড়ী এসে কিছু বলে নি!

—এ আর কি বলবেন, ওঁর কি অত মনে আছে? তা আপনার ছেলেটি বেশ পড়ে, বেশ বুদ্ধিমান্ ছেলেটি, আমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে। কি বল অমি?

পুত্রের প্রশংসায় কোন্ পিতার হৃদয় না উল্লাসিত হয়। রামলোচনবাবু হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "নীলা আমার দাদার মেয়ে, দাদা ব্রাহ্ম ছিলেন।"

—আমি তাঁকে খুব জানতুম; কি সুকণ্ঠই তিনি ছিলেন। দুঃখের বিষয় সে-কণ্ঠ বাংলা দেশের কেউ শুনলে না।

রামলোচনবাবু আশ্চর্য্যভাবে বলিলেন, "আপনি তা হলে দাদাকেও জানতেন! আপনার বাসা কোথায় হয়েছে? ও-বাড়ী তো আজ ক'বছর বন্ধ!"

—আমি নদীর ধারে ছোট বাংলোতে আছি; আমি ও-বাড়ী মেরামত কোরবো। মিঃ রায়

প্রলয় ।

নীল গগন-গর্ভে সৌরজগৎ যত,
মিশাইবে মহাশূন্যে কল্পান্ত কালের মত।
বাতাস বহিবে নাকো, জ্যোতিঃ নির্ব্বাসিত হবে,
নিবিড় আঁধার-মাঝে চরাচর ডুবে রবে।

এ বিশ্ব ডুবিয়া যাবে অনন্ত শূন্যের কোলে
কেবল একটি শব্দ রহিবে সে স্থ
ওঁকার-ধ্বনিতে বিশ্ব [illegible]
তোমার রচিত বিশ্বে তুমি এক

শ্রীমতী কল্পনা দেবী।

নববর্ষ ।

এস নববর্ষ লয়ে সুপহর্ষ নবীন আশার ছাতি।
বিষাদ বেদন পুরাতন স্মৃতি করি দূরে
অপসৃতি ॥
নবীন বাসনা নবীন সাধনা লভি সিদ্ধ
মনোরথে।
প্রতিজন-চিত করি প্রফুল্লিত তব আগমনী-
গীতে ॥
হের গো প্রকৃতি করিছে আরতি গম্ভীর
মেঘ-মন্দ্রণে।
শুভ শঙ্খরবে সহকার-শাখা দোলাইয়ে বহু
পবনে ॥
পূত অশ্রুজল পাদ্য নির্ম্মল নীহার-কণিকা-
ছলে।
সুরভি কুসুমে সাজাইয়া অর্ঘ্য নব নব
হর্ষাদলে ॥
চাঁপা নাগেশ্বর গন্ধরাজ-গন্ধে মধুপ-গুঞ্জনে
মাতিয়া।
পিক কুহুরব বিহগের তানে জয় জয় রবে
ভরিয়া ॥
দিগঙ্গনা-সনে ফুল-আভরণে উজ্জ্বল-মধুর
বেশে।
বিজন বিপিনে তব আবাহনে মহা সাধনার
আবেশে।
মালতীর মালা পূজা-উপহার অর্পিতে
ভক্ত-ভরে।
কায়-মন-সহ পুষ্পাহুত পথে প্রেমের মোহন
বলে ॥
মুগ্ধ মানসে ভক্তি-প্রীতি-বশে গাহিয়া মঙ্গল
গীতি।
অনুদিন-ক্ষণ রয় নিগমন তব সুকল্যাণ মতি ॥
নিকুঞ্জ-ভবনে হৈম সিংহাসনে আকুল আহ্বান-
ভরে।
তন্ময়তা প্রাণে সুগভীর ধ্যানে আশাপথ চাহে
ধীরে ॥
ফুট মল্লিকার লাজ বরিষণ বরিয়া অক্ষয় শিরে।
এস গো ধরার সারা বরষের নিখিলের তাপ
হরে।
নিসর্গের খেলা না করিয়া হেলা এ বিপুল
আয়োজন।
না করিয়া ব্যর্থ প্রকৃতি-বালার রক্ষা কর
নিমন্ত্রণ ॥

শ্রীমতী সরলাবালা বিশ্বাস।

পেশীমণ্ডল।

জীবদেহে পেশীগুলি গতিশক্তি-বিধায়ক যন্ত্র। তাহাদিগের আকার ও সংখ্যা শরীরকে সুন্দর এবং সুঠাম করে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে পেশীগুলি অস্থির চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত এবং তাহারা তত্তৎ স্থানের রক্ষা করিয়া থাকে। কোনো কোনো গ্রন্থিস্থানের ইহারাই প্রধান রক্ষক। দেহের যে সকল স্থানে রন্ধ্র আছে, পেশীনিচয় তন্মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাহাদিগের আচ্ছাদনীরূপে অবস্থিত আছে; চাপ দিলে তাহারা অবনত হয় এবং ছাড়িয়া দিলে তাহারা স্বীয় অবস্থায় আগমন করে।

পেশীনিচয় মাংস বই আর কিছুই নহে। উহারা দেখিতে লালবর্ণ। উহাদিগের মধ্যে যেটি যেরূপ ক্রিয়ার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার আকৃতিও তদনুরূপে গঠিত। তাহারা সমান সমান তন্তুদ্বারা পুষ্ট, পাশাপাশি অবস্থিত এবং বৈশিক ঝিল্লীর বুনন দ্বারা একত্র রক্ষিত। অঙ্গের প্রান্তদেশে পৈশীক তন্তুরও অন্ত হইয়াছে। তাহার কোষময় গঠন প্রান্তদেশে পরিবর্ত্তিত হইয়া মাংসপেশী-বন্ধনীরূপে পেশী-নিচয়কে অস্থির উপর সংলগ্ন রাখিয়াছে।

বন্ধনীগুলি প্রশস্ত পেশীর অভ্যন্তরে বিস্তৃত। পেশীতন্তুর বিন্যাসও বন্ধনীনিচয়ের সংস্পর্শে আসিয়া বিভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে।

কোথাও তাহারা সমান্তরালভাবে বন্ধনীর মধ্য দিয়া প্রত্যেক প্রান্তে আসিয়া শেষ হইয়াছে। কোথাও তাহারা পাখার ন্যায় বন্ধনীর দেহাভিমুখে গমন করিয়াছে। কোথাও ইহারা পালকের ন্যায় বন্ধনীর একদিকে এবং কোথাও বা উভয় পার্শ্বে অবস্থিত।

পেশীনিচয় দেখিতে বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট পুলিন্দার ন্যায়। তাহারা অবশ্য আচ্ছাদনী দ্বারা আবদ্ধ। প্রত্যেক পুলিন্দা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তন্তুদ্বারা গঠিত। প্রত্যেক পেশী এবং প্রত্যেক বন্ধনীতে ধমনী, শিরা, পোষক নাড়ী, স্পর্শচেতন এবং পরিচালক স্নায়ু আছে। মানবশরীরে পেশীর সংখ্যা চারিশতেরও অধিক। ইহাদিগের প্রত্যেকের নাম লিখিবার আবশ্যকতা নাই।

পেশীর তন্তুনিচয় সঙ্কোচনের কার্য্য করিয়া থাকে। উত্তেজক পদার্থের সংস্পর্শে পেশী-গুলি সঙ্কুচিত হয় এবং উত্তেজনা অপসৃত হইলে তাহারা শিথিল হইয়া পড়ে। যে সকল পেশীর উত্তেজনায় হস্ত উত্তোলিত হয়, তাহাতে যদি আমরা মানসিক বল প্রয়োগ করি, তবেই হস্ত উত্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে আমরা মানসিক শক্তি আহরণ করি, সেই মুহূর্ত্তে সুদৃঢ় পেশীনিচয় শিথিল হইয়া পড়ে। শরীরের প্রত্যেক ক্রিয়ায় আমরা পেশীনিচয়ের সঙ্কোচন উপলব্ধি করিতে পারি। মনে কর আমাদিগকে কনুই বক্র করিতে হইবে। মাংসপেশীবন্ধনীর এক-প্রান্ত স্কন্ধাস্থিতে সংলগ্ন আছে এবং ইহা এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে ক্রিয়া করিয়া থাকে। অপর প্রান্তের মাংসপেশীবন্ধনী হস্তের উপরার্দ্ধের অস্থির সহিত সংযুক্ত। যখন মাংসপেশীর উদর সঙ্কুচিত হইল, তখন দুইটি প্রান্ত প্রত্যেকে প্রত্যেকের সন্নিকটে আসিল। ফলে কনুইয়ের সন্ধিস্থান বক্র হইল। এই নিয়মে প্রত্যেক সন্ধিস্থানের গতি নিয়মিত হইয়া থাকে। যখন

মাংসপেশীর তন্তুনিচয় সঙ্কুচিত হয়, তখন সঙ্কুচিত স্থান—যাহাকে আমরা পূর্ব্বে উদর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহা কঠিন হইয়া পড়ে। পেশীর সঙ্কোচন হয় বলিয়াই আমরা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে সক্ষম হই। ইহা দ্বারা কৃষক কৃষিকার্য্য, কর্ম্মকার হাতুড়িচালনা, গ্রন্থকার লেখনীসঞ্চালন, শিকারী শিকারের অনুসরণ, বক্তা বক্তৃতা, মহিলা বাদ্যবিনোদন এবং নর্ত্তকী নর্ত্তনকালে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হয়। কেবল যে অঙ্গচালনাই পেশীর সঙ্কোচনের উপর নির্ভর করে তাহা নহে; দৈহিক শক্তির যে-কোনো ক্রিয়া হউক না কেন ইহা দ্বারা সম্পাদিত হয়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, শোণিত-সঞ্চারণ, পাকাশয়িক আন্ত্রিক এবং মানসিক ক্রিয়ানিচয় সকলই পেশীর উপর নির্ভর করে। মনও যে পেশীর অধীন তাহা মূর্চ্ছিতাবস্থায় বিশেষরূপে উপলব্ধি হয়। যদিও মূর্চ্ছাকালে চতুষ্পার্শ্বে কি হইতেছে রোগী তাহা জানিতে পারে, কিন্তু তথাপি সে মৃতবৎ পড়িয়া থাকে।

যখন জীবনের সুখ, স্বাস্থ্য, আনন্দ এবং কার্য্যতৎপরতার সহিত পেশীর এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তখন কি নিয়মে তাহারা নিয়মিত এবং কি করিলে তাহারা সুস্থ এবং কার্য্যক্ষম থাকে, তাহা জ্ঞাত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

স্বভাবের নিয়ম এই যে, যখন কোনো পেশী ঘন-ঘন ক্রিয়া করে, তখন তাহার তন্তু মোটা, সুদৃঢ় এবং বিপুল বিক্রমের সহিত কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু যদি পেশী সামান্যমাত্র কার্য্য করে, তবে তাহার আকার এবং শক্তির খর্ব্বতা হইয়া থাকে। অতএব স্মরণ রাখা উচিত, যদি মানবের পরিচ্ছদ কোনোরূপে বক্ষের পেশী এবং স্নায়ুদণ্ডের অপ্রতিহত ক্রিয়াকে বাধা দেয়, তবে পেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তখন ইহাদ্বারা যে কেবলমাত্র ফুস্‌ফুসের উপযুক্ত বিস্তৃতি বাধা পায় তাহা নহে, বরং নেরুদণ্ড-ধারণকারী পেশীরও দৌর্ব্বল্য সম্পাদিত হইয়া শরীরকে বক্র করিয়া ফেলে; সুতরাং রোগ স্বতই দেখা দেয়।

কেন যে ক্রিয়াদ্বারা পেশীর আকৃতি পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহার কারণ এই যে, ধমনিক শোণিত শরীরের প্রত্যেক যন্ত্রে ক্রিয়ানুযায়ী আহরিত হইয়া থাকে। ইহার বৈপরীত্যে যখন কোনো যন্ত্র পুষ্টকারী শোণিতের সরবরাহ হয় না, তখন তাহা দুর্ব্বল এবং ক্রমশঃ অক্রিয় হইয়া পড়ে। বিষয়টি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। একজন নেহাই-প্রস্তুত-কারকের হস্ত দেখিবে কেমন বৃহৎ ও সুদৃঢ়; কিন্তু তুমি যদি স্বীয় হস্তকে বহুদিন দ্বারা ঝুলাইয়া রাখ, তবে দেখিবে তাহা কিরূপ ক্ষুদ্র ও কোমল হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির রক্তবহা নাড়ীর ক্রিয়া কেমন প্রবল আছে। কিন্তু তোমার তাহা কিরূপ দুর্ব্বল এবং কীণ-ক্রিয় হইয়া গিয়াছে তাহা তুমি সহজেই বুঝিতে পারিবে।

অতএব যখনই শক্তিহীনতা, মন্দাগ্নি এবং অপ্রফুল্লতা বোধ করিবে, তখনই উক্ত নিয়ম স্মরণ করিবে। ঔষধ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বর যে-নিয়মদ্বারা অস্থি এবং পেশীনিচয়ের ক্রিয়াকে নিয়মিত করিয়াছেন, তৎপ্রতি সতর্ক হইবে।

যে-ব্যায়াম-দ্বারা অধিকাংশ মাংসপেশী ক্রিয়াশীল হয়, তাহাই উত্তম ব্যায়াম জানিবে।

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

জন্মদিনে।

হাসিমুখে ওই এসেছে আবার
লইয়ে নবীন ডালি,
নবীন কিরণ নবীন ধরায়
পরাণে আনন্দ ঢালি'।
নবীন গাথায় ছিন্নাছে ভরিয়া
হৃদয়-অঙ্গন মোর
নবীন আশার মধুর নেশায়
নিশাটি হয়েছে ভোর।
উষার কিরণ উঠেছে রাঙ্গিয়ে
গগনে পূরব-দ্বার,
পুলকে গাহিছে মধুর প্রভাতী
মুছিয়ে আঁধার তার।
ধূপ-গন্ধ-ধূমে হয়ে ভরপূর
হের গো এ ভবন।
আনন্দ-আলোকে উজলিছে ভাতি
পূর্ণ নয়ন-মন।
করযোড়ে মাগি দেবতা-চরণে
প্রসাদ তোমার শিরে।
বরিষ বরিষ আশীর্ব্বাদ রাশি
শুভ জন্মদিন পরে॥

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

মরণ।

একিরে মরণ?
ঐযে মৃত্যু-পরপারে অনন্ত জীবন
[illegible]-বন্ধবিভয়, যেন আজি মৃত্যুঞ্জয়
দাঁড়ায়ে পরমপদ শুদ্ধ নিরঞ্জন!
এ নহে মরণ!
কেবলে মরণ?
মৃত্যু কি কখনো পারে ঘুচাতে বন্ধন?
সংসারের দুঃখ যত, আজি তার পদানত,
চিরতরে নির্ব্বাপিত বাসনা-ইন্ধন!
নহে এ মরণ।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

বিবিধ তত্ত্ব।

নেংটে ইঁদুরগুলি পিপারমেণ্টের গন্ধ [illegible] যেখানে নেংটে ইঁদুর ঘুরিয়া বেড়ায় সেইস্থানে একটু পিপারমেণ্ট রাখিলে তাহারা পলাইয়া যায়।

চিমনী কাটা নিবারণ করিবার বেশ উপায় আছে। এককড়া ঠাণ্ডা জলে চিমনী ডুবাইয়া কড়া আগুনের উপর রাখ। যখন জল ফুটিতে আরম্ভ করিবে, তখন আস্তে আস্তে আগুনের তেজ কমাইয়া দাও। যখন জল ঠাণ্ডা হইবে, তখন চিমনী বাহির করিয়া তাহা ব্যবহার কর।

সর্পাঘাতের চিকিৎসা — সর্পাঘাতের

চিকিৎসা আবিষ্কৃত হইয়াছে, অদ্যাপি সাহস করিয়া এমন কথা বলা যায় না। কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, কলাগাছের রসে সাপের বিষ নষ্ট হয়। সর্পদষ্ট রোগীকে কলাগাছের রস পান করাইলে সে আরোগ্য লাভ করে। 'টাইম্‌স্ অব্ সিলোন' পত্রে প্রকাশ;—সম্প্রতি কলম্বো সহরে এই চিকিৎসার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। মিষ্টার অবিসিকিয়ার বহু চিকিৎসকাদির সম্মুখে একটি কুকুরের কাছে একটি গোক্ষুরা সাপ ছাড়িয়া দেন। সাপটি কুকুরটিকে পুনঃ পুনঃ দংশন করে। কুকুর যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকে ও অল্পক্ষণ মধ্যেই অবসন্ন হইয়া পড়ে। তখন কলাগাছ হইতে সদ্য রস বাহির করিয়া কুকুরটিকে পান করাইয়া দেওয়া হয়। একপেয়ালা রস পানের পর কুকুরটি সবল হইতে থাকে ও অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে সমর্থ হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সাপের কামড়ে প্রতিবৎসর বহু লোকের মৃত্যু হয়—বিষধর সর্পবিনাশে সরকারী পুরস্কার দানের ব্যবস্থাও আছে। এই নূতন ঔষধের পরীক্ষা সরকারী হাসপাতাল প্রভৃতিতে হইলে ভাল হয়।

ভারতীয় আর্য্যগণের আদিম নিবাস — কাশ্মীরের শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর্য্যগণের ভারতাগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী বাসস্থান সম্বন্ধে যে-সমুদায় গবেষণা এবং নূতন তথ্যলাভ করিয়াছেন, তাহা বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর ৭ই এপ্রিল তারিখের বিশেষ অধিবেশনে প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত সভায় আমাদের গবর্ণর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতার মর্ম্ম সমুদায় নিম্নে প্রদান করিলাম;—

ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের পূর্ব্বপুরুষকে আর্য্যজাতি বলে। তাঁহারা অন্যদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। এই আর্য্যজাতি হইতে বেবিলোনীয়ান, ইজিপ্সিয়ান্, এসিরিয়ান্ এবং হিব্রুগণের উৎপত্তি হইয়াছে। পোণ্টাস্ এবং আর্ম্মেনিয়াতে আর্য্যগণ বাস করিতেন। চীনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এবং উল্লিখিত জাতিগণের পূর্ব্বপুরুষেরা কেহ কেহ আর্য্যদের সঙ্গেই একই স্থানে বসবাস করিতেন।

পোণ্টাস্, আর্ম্মেনীয়া ও এসিয়ামাইনরের বিভিন্ন স্থান হইতে আর্য্যেরা ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। বেদ এবং অপরাপর ঐতিহাসিক ও প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে যে-সমুদায় স্থানের নাম পাওয়া যায়, তাহা এবং ঐ সমুদায় অঞ্চলেরই বিবিধ স্থানের নাম ক্রীট্। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিকগণ অনেকস্থলেই আদিম বাসভূমির নানাস্থানের নামের দ্বারাই তাঁহাদের নূতন দেশের নানাস্থানের নামকরণ করিয়া থাকেন। সেইরূপ আর্য্যগণও যখন ভারতবর্ষে আসিলেন, তখন তাঁহাদের পরিত্যক্ত মাতৃভূমির স্থানসমূহের নামের দ্বারাই ভারতের নানাস্থানের নামকরণ করিলেন। ঠিক এই কারণেই বেদ এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে যে-সমুদায় স্থানের নাম এবং তাহাদের বর্ণনা পাওয়া যায়, অবিকল সেইরূপ দেশ ভারতবর্ষের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বেদ রচিত হইবার সুদীর্ঘ কাল পরে, কেবল তাহাই নহে;—মহাভারতের

বুদ্ধ এবং রামায়ণের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের বহুকাল পরে আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, হস্তিনা বর্ত্তমান মীরাটের সন্নিহিত কোনো স্থানে ছিল, এবং প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের বর্ত্তমান নাম দিল্লী। ভারতবর্ষের লোকের বিশ্বাস অযোধ্যা হস্তিনা ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি স্থান-সমূহেই মহাভারত, রামায়ণাদি-বর্ণিত কাহিনী-সকল ঘটিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুগণ জাভা ও বালিদ্বীপে হিন্দু-উপনিবেশ স্থাপন করার কালেও পুরাতন নামের দ্বারাই নূতন দেশের স্থানসমূহের নাম রাখিয়াছিলেন এবং তদ্দেশবাসিগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মহাভারত ও রামায়ণের ইতিহাস-লীলা তাহাদের দেশেই অভিনীত হইয়াছিল। ভারতবাসীদের ন্যায় তাহারাও এবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

বুদ্ধের অভ্যুদয়ের অল্প দিন পূর্ব্বে ভারতে আর্য্যসমাগম হইয়াছিল এবং এই সময়ের পূর্ব্বে ভারতে আর্য্যগণের অবস্থিতির কি পুরাতত্ত্ব কি শিলালিপিসংক্রান্ত কোনোরূপ প্রমাণই পাওয়া যায় না। বৌদ্ধযুগে ভারতবাসিগণ পশ্চিম-এসিয়ার অধিবাসীদিগের নামের মতন নাম গ্রহণ করিতেন। আড়ারকালান নামে একজন ঋষি ছিলেন। অথচ ঠিক এই নামেরই একজন প্রাচীন বেবিলোনিয়ান রাজার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

ফিনিসিয়ানেরা এবং ক্রিভি ও পঞ্চালগণ একবংশ-সম্ভূত। কাশীগণ এবং কেসাইটীগণ একজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কোসাদেরা কাশীদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়; কোশীয়গণ আবার কসাইট্‌দের আত্মীয় এদিকে আবার কোশীয়গণের সহিত কাশীদের আত্মীয়তা আছে।

আফ্‌গান ও কাশ্মীরীদের সহিত হিব্রুদের আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে; এবং তাহারা যে একই বংশজাত সে-বিষয়েও সন্দেহ নাই। এই আফগান ও কাশ্মীরীগণ কৃষ্ণসাগর ও কর্স প্রদেশ হইতে আসিয়াছে।

বাঙালীদের কতক কৃষ্ণসাগর এবং কর্স প্রদেশ হইতে আসিয়াছে; আর কতক সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছে এবং খুব সম্ভবতঃ তাহারা কোয়েনিশিয়নদের জ্ঞাতিভাই।

যে সমুদায় জাতি ককেসিয়ার, পারস্যের উত্তর-পশ্চিমে এবং এসিয়াটিক তুরস্কে বাস করিত, ভারতবর্ষের গুর্জ্জর ও আভীরগণও তাহাদেরই বংশজাত।

ভারতের দ্রাবিড়গণ কোলচিস এবং তন্নিকটবর্ত্তী দেশ-সমূহ হইতে এ দেশে আসিয়াছে।

বেদে যে দাসাগুরুর কথা লিখিত আছে, তাহারা আর্য্যদের ন্যায় অন্যদেশের লোক এবং তাহাদের বাসস্থান ককেসিয়ায় ও এসিয়ামাইনরে ছিল। ইহাদের মধ্যে অনাস নামে এক সম্প্রদায়ের কথা জানা যায়; এতাবৎকাল নাসিকাহীন লোক বলিয়াই তাহাদিগকে ঠিক করা হইয়াছিল। কিন্তু খুব সম্ভব বেবিলোনিয়াতে যে অনাসদের কথা আছে, ইহারা তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন এবং ইহাদের এইরূপ নামকরণ হইবার কারণ এই যে, আর্ম্মেনীয়ার উত্তরে অনাস নামক স্থানে উহাদের কোনো উপনিবেশ ছিল।

সুমেরিয়ান্ ভাষা যে উপাদানে গঠিত,

বেদের ভাষা এবং আর্য্যাভাষাসমূহও সেই সমুদায় উপাদানেই গঠিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে বালক-বীরগণ।—গত বৎসর ৪০ হাজার বয়স্কাউট ইংলণ্ডের সরকারী ও বেসরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া জন্মভূমির সেবা করিয়াছে। বর্ত্তমান মহাসমর স্কাউট-দের সেবার ক্ষেত্রের প্রসার বাড়াইয়া দিয়াছে। স্কাউটরা টেলিফোন ও রেলওয়ে-সেতু রক্ষা করিতেছে, রাজপথের প্রহরীর কার্য্য এবং ডাক বহনের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। যুদ্ধের নানা-বিধ কার্য্যসাধনের নিমিত্ত স্কাউটদের দ্বারা একটি বিশেষ দল গঠিত হইয়াছে। যে-স্কাউট প্রত্যহ তিন ঘণ্টা হিসাবে ২৮ দিন স্কাউটের কার্য্য করিয়াছে, তাহারই সামরিক দলে প্রবেশের অধিকার হইয়াছে। ১৬ হাজারের অধিক পুরাতন স্কাউট ও স্কাউট-মাষ্টার সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছে।

স্কাউটদলের প্রতিষ্ঠাতা লেফ্টেনাণ্ট জেনারেল সার রবার্ট বেডেন পাউয়েল বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের স্কাউট-কাউন্সিলের চেয়ারম্যান।

সংবাদ।

১। গত বর্ষে বঙ্গদেশে বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৯৫টি বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন সর্ব্বশুদ্ধ বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮,২৩৮। এই সকল বিদ্যালয়ে ৪৩৭,৯৭১টি শিক্ষার্থিনী বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে।

২। গত "কেম্ব্রিজ সিনিয়র লোকাল" পরীক্ষায় "হাকলুল মাস্তিন" নামক সংবাদ-পত্র-সম্পাদকের কন্যা বেগম সুলতান নাম্নী এক চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই বালিকা কখনো ইস্কুলে যায় নাই; গৃহে বসিয়াই ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, পাটীগণিত, ভূগোল, ইতিহাস, প্রাকৃতিক ভূগোল, শারীর-তত্ত্ব, স্বাস্থ্যনীতি, সঙ্গীত প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত উর্দ্দু ও পারসী ভাষাতেও বালিকার অধিকার যথেষ্ট আছে। মুসলমান-বালিকাদিগের মধ্যে এই বালিকাই সর্ব্বপ্রথম এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল।

৩। কলিকাতাবাসী মুসলমান-মহিলা-গণের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনার্থ গত ২১শে ফেব্রুয়ারী মুসলমান-মহিলাগণের এক সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মৌলবী আবদুল করিম মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমিতির প্রধান নায়িকা মিসেস মৌলবী আবদুল করিম, মিসেস মাহবুব আলি এবং মিসেস্ সামসুল উলাম কলমুদ্দীন, প্রিন্সেস আফজল জহান বেগম প্রভৃতি সহকারী সভাপতি ও মিসেস্ চৌধুরী মহম্মদ ইসমাইল এই সমিতির সম্পাদিকা নিযুক্ত হইয়াছেন।

৪। লেডী কারমাইকেল মহোদয়া শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন চিকিৎসকগণের পরামর্শানুসারে ইংলণ্ডে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য কয়েক মাস পূর্ব্বে গমন করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি ৬ই এপ্রিল তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

৫। পার্লামেণ্টের লর্ড-সভা ১৯১৫ সালের ভারতীয় আইনের সংশোধন করিয়া এই বিধি করিয়াছেন যে, ভারতের যে কোনো রাজ্যের রাজা ও প্রজাকে ভারতবাসীর প্রাপ্য যে কোনো পদে নিযুক্ত করা হইবে।

৬। মান্দ্রাজের পোর্টট্রাষ্টের চেয়ারম্যান তথাকার "মান্দ্রাজ মেইল" কাগজে নবাবিষ্কৃত একখানি বুদ্ধমূর্ত্তি ও একটা ৪০।৫০ সের ওজনের ঘণ্টা প্রাপ্তি-সংবাদ প্রচার করিয়াছেন। বুদ্ধমূর্ত্তিটি পিত্তল-নির্ম্মিত, উহার আকৃতি ব্রহ্মদেশীয়। কূপ-খনন-কালে সহসা এই মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

পান্থশালা।

পথিক! চলিছ কোথা কত দূরে কোন্ দেশে,
কেন বা দাঁড়ালে হেথা, অধরে মধুর হেসে?
একি পান্থ! একি ভ্রম! মহাপান্থ-শালে আসি
যেতে হ'বে কাজ সেরে, তাহা ভুলে আছ বসি?
এসেছ দু'দিন যদি, পথিক! পথিক সনে
দণ্ড দুই কাটাইয়ো পরিচয়-আলাপনে।
কোরোনাক অত্যাচার, অবিচার, রেষারেষি,
উভয়ে পথিক, আর কেহ নহে পরদেশী।
এক আসে, আর যায়, ইহাই বিধির লীলা,
সংসার কিছুই নহে, এ যে ভাই পান্থশালা।

• • কাগজ দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে যখন যেরূপ কাগজ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে পত্রিকা ছাপিতে হইতেছে। গ্রাহকগণ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।—কার্য্যাধ্যক্ষ।

---

৩৭ নং মধুরাই লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩১ নং আন্টনি বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বাদসাহী জরদা।

আপনারা কি বাদসাহী জরদা ব্যবহার করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি? বহুমূল্য মৃগনাভি ও নানা প্রকার মসলা দ্বারা উহা প্রস্তুত। ইহা পানের সহিত খাইলে মুখের সৌগন্ধে দিগন্ত মাতাইয়া তুলে। প্রতি শিশি।০ আনা, ডজন ২৷৷০ টাকা; ভিঃ পিঃ স্বতন্ত্র। মুকি জরদা—প্রতি সের ১৬৲, ১২৲, ৮৲, ৬৲, ৪৲। পাইকারি দর স্বতন্ত্র।

দি বেনারস টোব্যাকো ম্যানুফ্যাকচারিং কোং,
ব্রাঞ্চ আফিস ১৫৮নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নত:।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬০৪ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। জুন, ১৯১৬। | ১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

রাজা রামমোহন।

(মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের শ্রাদ্ধবাসরে
কটক ব্রাহ্মসমাজে পঠিত)

বসন্তের সমাগমে নূতন পত্র বিকশিত হইয়া উঠে এবং শীত আসিলে তাহা ঝরিয়া যায়। জগতের নিয়মই এই—আজ যাহা আছে, কাল তাহা থাকে না। মানবও জন্মগ্রহণ করে, আবার মৃত্যুর ডাক আসিলেই চলিয়া যায়। ৮৩ বৎসর পূর্ব্বে এমন দিনে সাগর-পারে সাগরাম্বরা ব্রিটানীয়ায় এক-জনের জন্য মৃত্যুর ডাক আসিয়াছিল। আজ তাঁহাকে স্মরণ করিবার জন্য ও তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবার নিমিত্ত আমরা সকলে এই স্থলে সমবেত হইয়াছি। এই স্মরণে শোক নাই, কর্ম্মী তাঁহার কর্ম্মাবসানে চলিয়া গিয়াছেন; তাই এই শ্রাদ্ধবাসরে দুঃখ করিবার কিছুই নাই; আনন্দ করিবার এই আছে যে, তাঁহার মত মহৎ হৃদয়কে আমরা আমাদিগের মধ্যে পাইয়াছিলাম; গর্ব্ব করিবার এই আছে যে, তিনি আমাদিগের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; গৌরব অনুভব করিবার এই আছে যে, আমাদিগের দেশের এবং সেই-জন্যই আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া আজ আমরা তাঁহার শ্রাদ্ধাধিকারী হইয়াছি।

রাজা রামমোহনের জীবন বৈচিত্র্যময় এবং কর্ম্মবহুল ছিল। তাঁহার ৫৮ বৎসর জীবিতকালের মধ্যে তিনি যত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং যত দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহা তখনকার দিনে আশ্চর্য্য-প্রকার শক্তি ও সাহসের পরিচায়ক। সকলের

অপেক্ষা বিস্ময়কর এই যে, পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে তিনি আরবী, ফারসী এবং সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

এই অল্প-বয়সে তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের কতকগুলি সংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তাঁহার ভারত-ভ্রমণ ও তিব্বত-গমন এই সময়েই ঘটে। পঞ্চদশবর্ষীয় বালক ভারতের নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশের আচার ব্যবহার পরিদর্শন ও পর্য্যালোচনা করিয়া ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিবার জন্য তিব্বত দেশে গমন করিয়াছিলেন ইহা কি অল্প শক্তির পরিচায়ক? যে শক্তি এই অল্প বয়সে তাঁহাকে হিমগিরি লঙ্ঘন করিতে সাহস দিয়াছিল, সেই শক্তিই তাঁহাকে হিমগিরির অপেক্ষাও বিশাল, তাহার পুঞ্জীকৃত তুষাররাশির অপেক্ষাও কষ্টদায়ক কুসংস্কাররাশির বাধা ঠেলিয়া হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে সত্য যাহা, সনাতন যাহা, তাহার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। কি বৃহৎ, কি অদম্য সেই শক্তি, যাহা শিলাবৎ কঠিন আচার-নিয়মের আবর্জ্জনার স্তূপরাশির মধ্যে লুক্কায়িত, অন্তর্হিতপ্রায় শিবসুন্দরকে লোক-চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিল।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে—The body is the index of the soul. রামমোহনের সম্বন্ধে এই কথাটি অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার সুগঠিত ও দীর্ঘায়ত দেহ তাঁহার উন্নত মন ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচায়ক ছিল। তাঁহার বহিরাকৃতি যেমন সুন্দর, যেমন তেজঃপুঞ্জসম্পন্ন ছিল, তাঁহার হৃদয়ও তেমনই সুন্দর, তেমনই তেজস্বী ছিল। রাজা রামমোহন শরীরে ও মনে 'রাজা' নামের উপযুক্তই ছিলেন। রাজা তিনি লোকের মনের উপর আধিপত্যে, রাজা তিনি চরিত্রের বলে, মনের দৃঢ়তায়, ভালবাসার গভীরতায়, করুণার, বিশালতায়। মানবমনের এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ খুব অল্প-লোকের মধ্যেই দেখা যায়। তাই অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহাকে রাজার রাজা, দেশাতীত এবং কালাতীত বলিয়া গিয়াছেন। আজ সেই দেশাতীত, কালাতীত রাজাকে আমরা দেশের মধ্যে, কালের মধ্যে টানিয়া আনিয়া নমস্কার করি।

পিতৃকুলের বিষয়বুদ্ধি ও নীতিকুশলতা এবং মাতৃকুলের জ্ঞানস্পৃহা, নিষ্ঠা ও তেজ একত্র সম্মিলিত হইয়া রামমোহনের মধ্যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। পিতৃকুল হইতে প্রাপ্ত বিষয়বুদ্ধি ও নীতিকুশলতা তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চপদ ও রাজসম্মান আনিয়া দিয়াছিল, স্বদেশের এবং স্বজাতির বৈষয়িক উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবার শক্তি দিয়াছিল। দেশের উন্নতি-সাধনের নিমিত্তই রাজনীতি-কুশল সুদক্ষ রাম-মোহনের সাগরপারে যাত্রা। সে যাত্রার ফলে ভারতের মুকুট-মণি খসিয়া পড়িয়াছিল, ভারত তাহার অকলের নিধি, হিতৈষী পুত্রকে হারাইয়াছিল।

মাতৃকুলের জ্ঞানস্পৃহা তাঁহাকে বহুভাষাবিৎ ও বহুশাস্ত্রবিৎ করিয়া তুলিয়াছিল। ইহা শুধু তাঁহাকে জ্ঞানবান্ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, এই জ্ঞান অপরের মধ্যে বিলাইয়া দিবার আকাঙ্ক্ষায়, অপরের প্রাণে এই স্পৃহা জাগাইয়া তুলিবার বাসনায় তাঁহার চিত্তকে অধীর করিয়া

তুলিয়াছিল; দেশের মধ্যে, দশের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁহাকে উদ্যোগী করিয়া তুলিয়াছিল, রাজশক্তির সহায় করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার তেজ তাঁহাকে সকল প্রকার বাধা ঠেলিয়া সকল প্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়া সত্যের মধ্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহার নিষ্ঠা পবিত্র যাহা তাহা হইতে সকল প্রকার অমঙ্গল ও অপবিত্রতাকে দূর করিবার, এবং তাঁহার নিজ-শুচিতার মধ্যে তাঁহাকে শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক রাখিবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা দিয়াছিল।

তেজে তিনি কুলিশ-কঠোর, কিন্তু করুণায় তিনি কুসুম-কোমল ছিলেন। তাই দেশবাসীর জন্য তাঁহার হৃদয় অজস্র মঙ্গল-কর্ম্মধারায় গলিয়া পড়িয়াছিল; এবং তাই নিগৃহীতা, দুঃখতাপিতা স্বদেশবাসিনীর জন্য তাঁহার রমণী-জাতির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ-চিত্তে স্নেহ-করুণার বন্যা ডাকিয়াছিল। রমণীজাতির দুঃখ দূর করিবেন, তাহাদিগের মঙ্গলসাধন করিবেন, এই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল এবং এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া তিনি অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। তাই তাহাদিগেরই একজন আমি আজ তাঁহাকে বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করি, তাঁহাকে নমস্কার করি। আমরা যে তাঁহার বিশেষ স্নেহভাজন এই মনে করিয়া গৌরব অনুভব করি এবং কৃতজ্ঞতানম্র চিত্ত লইয়া তাঁহার উদ্দেশে শির নত করি। তাঁহাকে নমস্কার করি।

আজ সেই ভিক্ষুতদেশীয় রমণীগণকেও এই সঙ্গে নমস্কার করি, যাঁহাদিগের সস্নেহ ব্যবহার, যাঁহাদিগের করুণ-দৃষ্টি ও নিপুণ সেবা রামমোহনের বৃহৎ চিত্তে রমণীগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও তাঁহাদিগের দুঃখনিরাকরণের জন্য বিপুল বাসনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। ধন্য তোমরা, তিব্বত-রমণি! মাতৃত্বের বিকাশ ও মূর্ত্তি; ধন্য তোমাদের স্নেহ ও সেবা! যে তোমরা তোমাদিগের কার্য্য দ্বারা ভারতের এবং জগতের এত বড় ও এত সুন্দর মঙ্গলের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছ।

সমাজ-শাসনের নিষ্পীড়ন ও কদাচার হইতে রমণীকুলকে রক্ষা করিবার জন্য রামমোহন নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতিকে হীনাবস্থায় কেবলমাত্র ক্রীড়নক করিয়া রাখিবার জন্য সমাজ যত প্রকার বিধি-ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল, সে সমস্ত গুলির বিরুদ্ধেই তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন; তাঁহার লেখনীমুখে অগ্নিময়ী ভাষার স্রোত ছুটিয়া সকল অন্যায় বিধিকেই দগ্ধ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু এক সতীদাহ নিবারণ ব্যতীত অপরগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ দেখিয়া যাওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

স্ত্রী পুরুষ-নির্ব্বিশেষে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিলে প্রচলিত কুসংস্কারগুলির মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে মনে ভাবিয়া তিনি শিক্ষাবিস্তারে যত্নবান্ হয়েন। কামনা অপেক্ষা নিবৃত্তি শ্রেয়স্কর, জ্ঞান-দান-দ্বারা স্ত্রীলোককে ঐই শিক্ষা দিয়া তাহাকে সহমরণরূপ আত্মহননের পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের নির্ম্মল জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত করা যাইতে পারে বলিয়া তিনি স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা পরে ফলবতী হইয়াছিল, অন্ত তাঁহার এই

কার্য্যভার আপনার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার ইচ্ছাকে সফল করিয়াছেন, আজ এই শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহাদিগকে আমরা স্মরণ করি, নমস্কার করি।

নিপুণ কারিকরের হাতে হীরক যেমন সুন্দররূপে কর্ত্তিত হইয়া চতুর্দ্দিকের আলোক-রশ্মি আপনার সকল মুখ দিয়া গ্রহণ করিয়া আপনার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের দ্বারা তাহাকে মণ্ডিত করিয়া, বিচিত্র ও শোভন ভাবে বিচ্ছুরণ করে, সেইরূপ রামমোহনের হাতে তাঁহার স্বাভাবিকী প্রতিভা এরূপ মার্জ্জিত হইয়াছিল যে, উহা অর্জ্জিত শিক্ষাকে চরিত্রের তেজ ও নিষ্ঠার দ্বারা মণ্ডিত করিয়া শোভন ও সুন্দর ভাবে বহির্জগতে ছড়াইয়া দিয়াছিল।

আজ রাজনীতিবিদ্ যিনি, তিনি তাঁহাকে আদর্শ রাখিয়া আপন পথে চলিতেছেন, তাঁহারই পথানুবর্ত্তন করিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধনে বদ্ধপরিকর হইতেছেন। সাহিত্যিক যিনি, তিনি আজ তাঁহাকে আপনার অগ্রগামী ও বঙ্গসাহিত্যের প্রধান হিতৈষী ও সাহিত্য-রচয়িতাদের মধ্যে একজন বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইতেছেন; সমাজ-সংস্কারক যিনি, তিনিও তাঁহাকেই নেতা বলিয়া বরণ করিয়া লইতেছেন, তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

রাজনীতিক্ষেত্রে যে গোখেল ও গান্ধি জন্মিতেছেন, সাহিত্যক্ষেত্রে যে অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হইতেছে, বিজ্ঞানমঞ্চে যে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র দাঁড়াইতেছেন, সমাজসংস্কারের পথে যে কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহার জন্য আজ ধন্যবাদ দাও সেই রাজা রামমোহনকে; তাঁহাকে নমস্কার কর।

আজ যে ভাই ভগিনী হাত ধরিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছ, দেশের জঞ্জাল ঝাঁটাইয়া ফেলিবার জন্য, আজ যে স্বদেশের দুর্দ্দশা মোচন করিয়া কল্যাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে পারিতেছ, আজ যে উপনিষদের ঋষিদিগের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ আদিত্যবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের বন্দনাগান গাহিতে পারিতেছ, তাহার জন্য নতশির হইয়া কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাকে নমস্কার কর।

দুঃখ করিবার কিছু নাই বলিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখ করিবার আছে, তিনি গিয়াছেন বলিয়া নহে, তাঁহার দৃষ্টান্তে তাঁহারই মত সহস্র জীবন গড়িয়া উঠিবার অভাবে। ভারত তাহার মুকুটমণি হারাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার আশা ছিল, এবং আছে যে, এক মণির স্থলে তাহার মুকুটে শত মণি শোভা পাইবে। কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তাই, বলি হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তোমার কৃতকর্ম্মের যশে দীপ্তিমান্ হও, জননীর গৌরব বর্দ্ধন কর, দেশ এখনও অজ্ঞান-তিমিরান্ধকারে আচ্ছন্ন; দাঁড়াও, হে সুধী, জ্ঞানের আলোক-হস্তে দাঁড়াও, দেশের এ অন্ধকার দূর কর, তাহার দুর্গতি মোচন কর। ধর্ম্ম ও সমাজ এখনও সংস্কারের প্রতীক্ষা করিতেছে, এস সংস্কারক, দুর্গম, বন্ধুর পথ বাহিয়া চলিয়া এস, কণ্টকর প্রশ্ন দ্বারা জঞ্জাল সরাইয়া সত্য ও ন্যায়ের আসন প্রতিষ্ঠা কর। শোন তোমরা, হে কর্ম্মী, শোন তোমরা, অতীত হইতে রামমোহনের

কণ্ঠশব্দ বাজিয়া উঠিতেছে "স্বকর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, নিশ্চেষ্ট বা অলস থাকিও না।"

আজ শ্রাদ্ধবাসরে নববল লাভ কর ভাই, পর্ব্বতপ্রমাণ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করিয়া সত্য যাহা, শিব যাহা, তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা লাভ কর। মনস্বিতা ও নিষ্ঠার দীক্ষালাভ কর, ধ্রুবকে, কল্যাণকে আপন গৃহে প্রতিষ্ঠিত কর।

নীলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৬

নীলা যখন মিঃ বসুর বাটীতে উপস্থিত হইল, তখন সে দেখিল সেখানে কয়েকখানি গাড়ী রহিয়াছে। গাড়ী যখন গাড়ী-বারান্দায় থামিল, তখন প্রভাতচন্দ্রের স্ত্রী বেলা দেবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নীলার হাত ধরিয়া সাদরে বলিলেন—

"এস ভাই, এত দেরি হল যে?"

নীলা লজ্জিত হইয়া বলিল "কই আমি ত বেশী দেরি করি নাই, গাড়ী পেলেই এসেছি।"

বেলা "এসো একেবারে ড্রইং রুমে যাই, সেখানে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি, মিস্ স্মিথ ও আর কয়েকজন আছেন। মিসেস ব্যানার্জ্জি আমাদের বহুদিনের পরিচিত, আমাদের আপনার লোকের মত। আমরা তাঁকে মাসীমা বলে ডাকি" বলিতে বলিতে ড্রইং রুমে প্রবেশ করিলেন। নীলা দেখিল গৃহসজ্জায় গৃহস্বামীর রুচির পরিচয় দিতেছে। সকল দ্রব্যই মহামূল্য ও সুন্দররূপে সজ্জিত। বারান্দায় সারি সারি বিলাতী তমাল বৃক্ষ বিলাতী চিনা মাটির টবে সজ্জিত। ড্রইং রুমের দ্রব্যাদিও যথাস্থানে সজ্জিত। মহামূল্য কার্পেট, এক পার্শ্বে বৃহৎ পিয়ানো। গৃহের মধ্যস্থলে একখানি অটোম্যানে একজন বর্ষীয়সী মহিলা শুভ্র পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া একজন যুবার সহিত কথা কহিতেছেন। অন্যান্য আসনে সমবেত পুরুষ ও মহিলা বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। নীলাকে সঙ্গে লইয়া বেলা অগ্রসর হইয়া যুবককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এই যে ছোট বাবু, এদিকে দেখ"।

যুবক বিস্মিতভাবে নীলার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

বেলা। নীলার প্রতি—"মিস মিত্র নীলা, আমার দেওর সুব্রত।" নীলা তাহাকে নমস্কার করিল। সুব্রতও সম্ভ্রমের সহিত মস্তক নত করিয়া সম্মুখের আসন অগ্রসর করিয়া দিলেন। বেলা পুনরায় বলিলেন—"মিসেস ব্যানার্জ্জি—মিস মিত্র"—

মিসেস ব্যানার্জ্জি হাসিয়া নীলাকে পাশে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাল আছ ত মা?" নীলা ভাল করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, তাঁহার দিকে চাহিতেই তাহার প্রাণে যেন ভরসা হইল। এতদিন পরে তাহার মনে হইল যে, সে ইঁহাকে বিশ্বাস

করিতে পারিবে; ইঁহার নিকট যথার্থ সহানুভূতি পাইবে। সে তাঁহার নিকট বসিয়া মনে করিল যেন আপনার লোকের আশ্রয় পাইল। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি শীলার হাত ধরিয়া বলিলেন—"তুমি কটকে কতদিন এসেছ? আমি একবার লক্ষ্ণৌতে গিয়া তোমাদের বাটীতে দুদিন ছিলাম। তখন তোমার মা ছিলেন, তুমি ছোট্ট মেয়েটি ছিলে।" শীলার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। অত লোকের মধ্যে একজনও যে তার বাবা ও মাকে চেনেন ইহা মনে করিয়া সে এত সুখী হইল যে, তাহার চক্ষে অশ্রু ভরিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে বলিল—"আমি আজ চার দিন হল এসেছি। বাবা আমায় ছেড়ে সম্প্রতি পরলোক চলে গেছেন"—আর বলিতে পারিল না। অত লোকের সম্মুখে অতি কষ্টে সে মনকে সংযত করিল।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি "আমি শুনলাম তোমার কাকা হিন্দু। তোমার তা'হলে সেখানে থাকতে খুব কষ্ট হয়। আচ্ছা তুমি মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে থেকো। আমি একলাই আছি। মহানদীর ধারেই আমার বাড়ী। আমিও বড় একেলা। আমার মেয়েটিও ইহলোক ছেড়ে চলে গেছে। একটি নাতনীর বিয়ে হয়েছে, সে তার স্বামীর কাছে সিমলায় আছে। অন্যটি আমার জামাইয়ের কাছে আছে। তুমি এই শনিবারে আমার বাড়ীতে যেও। বেলা যাবে, সুব্রতও যাবে। এই যে সুব্রত! তুমি ওধারে কেন। এসে মিস্ মিত্রের সঙ্গে কথা কওনা, আর আমরা কেন?" বলিয়া সুব্রতর দিকে চাহিয়া হাসিলেন। সুব্রতর মুখমণ্ডল লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

এমন সময় গৃহমধ্যে আরও কয়েক জন মহিলা আসিলেন। তন্মধ্যে দুই জন ইংরাজ মহিলাও ছিলেন। তাঁহারা আসিয়া সকলকার সহিত সম্ভাষণ করিয়া যে যেখানে পাইলেন বসিয়া পড়িলেন। প্রভাতচন্দ্রের মাতা আসিয়া সকলকে মিষ্টবাক্যে সমাদর করিলেন। যেখানে দুজন ইংরাজ মহিলা ছিলেন, সেখানে গিয়া বলিলেন "আপ্ আচ্ছা হায়।"

তিনি ইংরাজী না জানিলেও ইংরাজ-মহিলাদের সহিত অসঙ্কোচে মিশিতেন। ইংরাজ-মহিলারাও তাঁহার প্রসন্নমুখে ও সুমিষ্ট কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি তাঁহাদিগকে নিজের হাতের মিষ্টান্ন, চন্দ্রপুলী, লেডিকেনি, সরের বড়া ইত্যাদি খাওয়াইতে বড় ভাল বাসিতেন। একটী ইংরাজ মহিলা স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী। তিনি হাসিয়া বলিলেন "আপ আচ্ছা আচ্ছা হায়? আপকো বহু কাঁহা?"

প্রভাত চন্দ্রের মা "বেলা এ দিকে এস ত মা? মিসেস্ লরি তোমায় ডাকছেন।" এই বলিয়া তিনি শীলার কাছে গিয়া শীলার খুড়ীমার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

মিসেস্ লরি বেলাকে বলিলেন "How do you do, Mrs. Bose?"

বেলা মৃদু কণ্ঠে—"Quite well, thanks."

বেলা সবে ইংরাজী কহিতে শিখিতেছেন। সকলকার সম্মুখে ইংরাজীতে কথা বলায় তাঁর ভারি লজ্জা। স্বামী বা দেবরের সম্মুখে কিন্তু তিনি ইংরাজীতে কথা বলেন না। এদিকে

প্রভাতচন্দ্র চাহেন, যে বেলা খুব ইংরাজীতে কথা বলে। এমন সময় মিসেস্ লরির দৃষ্টি শীলার প্রতি পড়িল। তিনি চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

"By Jove, what a beauty! Who is she, Mrs. Bose? Please do introduce me to her."

মিসেস্ লরিকে লইয়া বেলা শীলার নিকট গিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন।

"মিসেস লরি, মিস্ মিত্র শীলা"

মিসেস্ লরি।"Shilla, it is an English name. Very sweet name. Is she a new commer, any relation of you?"

বেলা নিরুত্তর, কারণ শীলার সম্মুখে ইংরাজী বলিতে লজ্জা। তাহা দেখিয়া শীলা একটু হাসিয়া উত্তর দিল "Yes, I am a new commer. No relation of her. A new aquaintance. I have seen her only yesterday".

মিসেস্ লরি শীলার সহিত কথোপকথনে ব্যস্ত রহিলেন। সুব্রত নিকটে দাঁড়াইয়া শীলার ইংরাজীতে কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সেই প্রথম দর্শনেই শীলার রূপে-গুণে তিনি বিমোহিত হইয়া গেলেন। তিনি মনে মনে স্থির জানিলেন যে, শীলা তাঁহারই হইবে। এই অতুল ঐশ্বর্য্য, এত সম্মান, শীলা কি তাঁহার হইবে না?

এমন সময় বেহারা ট্রেতে করিয়া পেয়ালায় চা আনিল, রৌপ্য পাত্রে দুগ্ধ চিনি। অন্য এক বেহারা অন্য একখানি ট্রেতে নানা-প্রকার কাচের ও রৌপ্য পাত্রে নানাবিধ দেশী ও বিলাতী বিস্কুট লইয়া আসিল। প্রভাতচন্দ্র, সুব্রত ও বেলা সকলকে আহারীয় দ্রব্যাদি দেওয়াইতে লাগিলেন। প্রভাতচন্দ্রের জননী সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন ও বেলাকে বলিলেন, "বেলা সব খাবার ঠিক করে দাওত না। চিঁড়ে ভাজা ভুলো না, মিসেস্ লরি চিঁড়ে ভাজা খুব ভালবাসেন। এদিকে তোমার মাসীমাকে দাও। ঘরের খাবার গুলা যে কেউ নিলেন না। দাও তুমি পাতে তুলে দাও। এত কষ্ট করে করলাম, কেউ না খেলে হবে কেন? মিস স্মিথকে ওই কচুরিখানা দাওত।"

মিস স্মিথ মিশনারী মেম, তিনি বলিলেন "Excuse me please, let me have a plain Biscuit."

সুব্রত আনিয়া দিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন "Thanks, that will do; এবং শীলাকে দেখাইয়া বলিলেন I shall be obliged if you kindly introduce me to her after tea. She has got such a sweet face. I like to know her, who is she?

চা পান শেষ হইলে সুব্রত তাঁহাকে লইয়া শীলার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর মিস্ স্মিথ বলিলেন "I hope to come and call on you soon. Please let me know when it will suit you?"

শীলা চমকিত হইয়া উঠিল। সেই বাড়ীতে সে যে ভাবে থাকে, কাহারো সহিত দেখা করা সেখানে সুবিধার নয়। সে বুঝাইয়া দিল পরে সংবাদ দিয়া দিন স্থির করিবে।

তারপর চারিদিকে মধুমক্ষিকার গুঞ্জনের মত কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। অবশেষে মেয়েরা বেলাকে গান গাহিতে অনুরোধ করিল। বেলা ধীরে ধীরে নিরা লীলাকে বলিলেন "আজ ভাই তুমি গাও। আমি মোটে ভাল গাহিতে জানি না, অল্প অল্প শিখ্‌ছি।" লীলা বুঝিতে পারিল না কি করিবে, পিতার মৃত্যুর পর সে বাজনায় হাত দেয় নাই। অথচ বাজনা স্পর্শ করিবার ইচ্ছাও হইতেছে। বাল্যকাল হইতে সে গান বাজনার মধ্যেই প্রতিপালিত। গাহিতে বা বাজাইতে তার লজ্জা নাই। সে ভাবিতেছিল কি করিবে। এমন সময় সুব্রত আসিয়া অনুরোধ করিয়া বলিলেন—"আপনি অনুগ্রহ করে একটি গান শোনাইবেন আসুন।" সে উঠিয়া তাঁহার সহিত বাজনার কাছে গেল। কয়েকখানি গানের বই বাজনার উপরে ছিল, সে দু'এক খান বই লইয়া দেখিল। তারপর বই রাখিয়া দিয়া বাজনায় হাত দিল। তাহার হস্তের স্পর্শে বাজনা যেন পুলকিত হইয়া শিহরিয়া উঠিল, সে আপনার মনে বই না দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ বাজাইয়া গেল। সকলেই বুঝিল কি সুন্দর স্পর্শ, কি মধুর বাজাইবার ক্ষমতা। সে ধীরে ধীরে গাহিল, ক্রমে তাহার কণ্ঠ সঙ্কোচ ভুলিয়া আপনার মনে উঠিতে নামিতে লাগিল, শ্রোতারা বিমুগ্ধ হইয়া শুনিল।—

"সাথে সাথে থাক তুমি নিখিল নির্ভর
দিবসের আলো নিভে যায়,
চারিদিকে অন্ধকার হয় গাঢ়তর,
থাক তুমি ঘিরিয়া আমায়।
দীনবন্ধু তুমি বিনা কে দেখিবে আর,
কে দিবে তাপিতে শান্তি-সুধা সান্ত্বনার।

মানব-জীবন ক্ষুদ্র দুদিনে ফুরায়
ক্ষুদ্র ঢেউ নদীতে যেমন,
পৃথিবীর খেলা ধূলা ধূলিতে মিশায়,
হর্ষ জ্যোতি বিষাদে মগন।
আজ যাহা আছে কাল শুষ্ক ধূলিসার,
হে অনন্ত থাক নিত্য অন্তরে আমার।

চাহি না বারেক দৃষ্টি, সান্ত্বনার বাণী
থাক সদা হৃদয়-আসনে,
ভক্তের হৃদয়ে যথা দিবস রজনী
থাকিতে তেমনি সর্ব্বক্ষণে।
চির-পরিচিত প্রিয়, অসীম মহান্,
নহে ক্ষণতরে, এসো পূর্ণ কর প্রাণ।

এসনা দেখাতে ভয় হে রাজা আমার,
এস মোর জুড়াও হৃদয়।
তোমার শান্তির স্পর্শ, সুধা সান্ত্বনার
জুড়াইবে কত সমুদয়।
হও মোর দুঃখে দুঃখী দোষ ক্ষমা করি,
পতিতপাবন এস পতিতে উদ্ধারি।

আমি চাই সর্ব্বকাজে সকল সময়ে,
তুমি জেগো হৃদয়-কমলে,
পাপ প্রলোভনে আসে ছলিতে হৃদয়ে
তাহে যেন হৃদয় না টলে।
তুমি হও ধ্রুবতারা পথ দেখাইয়া,
আলো ও আঁধারে থাক লুকাও এ হিয়া।

নাহি শত্রু হেন কেহ যারে করি ভয়
তুমি যদি কর আশীর্ব্বাদ,
দুঃখে আর নাহি ব্যথা অশ্রু ব্যথাময়
নহে, যদি থাক সাথে সাথ।

মরণে নাহিক ভয়, আর কারে ভয়,
হইব বিজয়ী রণে ও-নাম অভয়।
নিশি দিন থাক জেগে নয়নে আমার,
স্বপনে বা ঘুমে জাগরণে,
ঢালো জ্যোতি আলো করি ঘন অন্ধকার,
লও টানি ঊর্দ্ধে ও গগনে।
ধরণীর কালো ছায়া স্বর্গ সুপ্রভাতে,
যাবে দূরে যদি তুমি থাক সাথে সাথে।

গানটি যেন বাজনার সুরে সুরে কাঁদিয়া গেল। তার করুণ সুর সকলকার প্রাণ স্পর্শ করিল। গান শেষ হইল, তখন গৃহ নিস্তব্ধতা-পূর্ণ। সুব্রত কাছেই দাঁড়াইয়াছিলেন, বলিলেন, "আপনি কি সুন্দর গান করেন।"

লীলা বলিল, "আমার বাবা আরো ভাল গাহিতেন, তাঁর কাছেই আমার শেখা।"

গানটি সুদীর্ঘ বলিয়া আর কেহ গাহিতে অনুরোধ করিল না। কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সেদিনকার মত সকলেই বিদায় লইতে উঠিলেন এবং উপস্থিত প্রায় সকল মহিলাই লীলাকে বলিলেন "আবার কবে দেখা হবে?"

মিসেস লরি যাইবার সময় বেয়ারাকে বলিয়া গেলেন "Please bring her some day." মিসেস ব্যানার্জ্জি বলিলেন, "আমিত ঐ পথে যাইতেছি, আমি বাড়ী যাবার সময় লীলাকে নামিয়ে দিয়ে যাব।" যাইবার সময় প্রভাতচন্দ্রের মা বলিলেন—

"আমি আবার শীঘ্রই আসিব, এবার সকাল হতে এসে থাকতে হবে। সুব্রত তাঁহাদিগকে গাড়ী পর্য্যন্ত তুলিয়া দিলেন ও বলিলেন—"আমি কাল সকালে আপনার কাকার সহিত দেখা করতে যাব। আশা করি, আপনার সহিতও দেখা হবে।" লীলা বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। সে মিসেস ব্যানার্জ্জির সহিত গৃহাভিমুখে ফিরিল। নামাইবার সময় মিসেস ব্যানার্জ্জি বলিলেন—

"আমি কাল বিকেলে তোমাদের বাড়ীতে আসব। তোমার খুড়ীমার সঙ্গে আলাপ হবে। তোমায় শনিবারে নিয়ে যাব, শনিবারে গাড়ী পাঠাব, নিশ্চয়ই যেও।" লীলা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া নামিয়া পড়িল।

সে যখন ভিতরে প্রবেশ করিল, তখন তাহার কাকা আহারে বসিয়াছেন। তাহার খুড়ীমা বলিলেন—

"এত রাত হল যে? ভাত খাবে কখন?"

লীলা। "আজ আমি আর খাব না, রাত হয়ে গেছে। আমায় মিসেস ব্যানার্জ্জি এসে রেখে গেলেন, কাল তিনি আস্‌বেন বলে গেছেন।"

তাহার খুড়ীমার বক্ষের রক্ত তপ্ত হইয়াছিল, কিছু বলিলেন না। রামলোচন বাবু খাইতে খাইতে একবার মাথা তুলিয়া বলিলেন—

"সকলকার সঙ্গে আলাপ হল? সব লোক কেমন?"

লীলা। "বেশ ভালই ত মনে হয়। এক দিনে কি করে জান্‌ব বলুন। আমার সঙ্গেতো সকলেই বেশ ভাল ব্যবহার করলেন।"

তাঁহারা নীরবে থাকিলেন দেখিয়া লীলা ধীরে ধীরে উপরে চলিয়া গেল। তাহার মনে হইল এই তার বাসগৃহ, সে যেন বন্দী হইয়া রহিয়াছে। তাহার পিতা তাহাকে এত ভাল-বাসিতেন, তবে কেন তাহাকে এমন স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। একটি মায়ার

কথা নাই, একটু স্নেহের ভাব নাই। সে নীরবে আপনার ঘরে গিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছিল, এমন সময় ধীরে ধীরে অমিয় সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—

"দিদিভাই, এত দেরি? আজ আমি সোণাকাকা সুপ্রকাশ বাবুর সহিত খেলা করেছি, তিনি কি ভাল। আজ আমায় এই ছবির বই দিয়েছেন দেখ।" এই বলিয়া একখানি সুন্দর ছবির বই বাহির করিল।

শীলা হাসিয়া বলিল "তোমার সঙ্গে তাহলে খুব ভাব হয়েছে।"

অমিয়। "কি সুন্দর ওবাড়ীর ঘরগুলি দিদিভাই, মাঝের হল সুধু শাদা পাথরের, এখানে বোধ হয় এমন বাড়ী কারো নাই, আর একটা ঘর ত ছবিতে ভরা, কত বই যে কি বলব; দিদিভাই, কাল আমরা আবার নদীর তীরে যাব, তুমি যাবে?"

শীলা। "তা কি করে হবে, সুপ্রকাশ বাবু আছেন।"

অমিয়। "তিনি ত আমায় বলেছেন, তুমি যদি এস, তোমায় বোটে করে একটু বেড়িয়ে আনব। আমি বল্লাম যে দিদিভাইকে নিয়ে আস্‌ব। তিনি বল্লেন, তা'হলে খুব ভাল হবে। বেশ ত দিদিভাই দুপুর বেলা যাব, কেমন।"

শীলা। "না তা হবে না, কাকা রাগ কর্ব্বেন, তবে নদীর ধারে যাওত আমি না হয় একবার যাব।"

অমিয়। "সেই ভাল; তুমি বসে থেক, আমরা নদীতে বেড়াব। সুপ্রকাশ বাবু কত গল্প জানেন, কত কত দেশের গল্প বল্লেন, তিনি বিলাত বেড়িয়ে এসেছেন তা জান?"

শীলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "সত্যি, কিন্তু তিনি ত সাদা সিধে ভাবে থাকেন।"

অমিয়। "তবে তিনি খুব গরিব। কারণ দেখনি কাপড় চোপড় কেমন পরেন, আর আমায়ও কেবল বলেন, গরিব আমি কোথায় পাব। তাঁর বন্ধু তাঁকে এই কাজ দিয়েছেন, বোধ হয় টাকা পাবেন, তাই তাঁর বন্ধুর কাজ কচ্ছেন।"

শীলা। "যে বিলাত যায়, সে গরিব কি করে হয়?"

অমিয়। "আমায় বল্লেন, তাঁর বন্ধুর সঙ্গে গিয়েছিলেন। তা দিদিভাই, আজ কেমন বেড়িয়ে এলে বল্লে না?"

শীলা। "সে সব কাল গল্প কর্ব্ব, আজ রাত হয়েছে, লক্ষ্মী যাও শুয়ে পড়গে।" অমিয় চলিয়া গেল, শীলা শয্যাতল গ্রহণ করিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে গৃহিণী বারান্দায় বসিয়া আছেন, তাঁহার তামাক-পোড়া ফুরাইয়া গেছে, তাহাই প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহার সম্মুখে বামুন বৌ বসিয়া আছে। বামুন বৌ তাঁর বিশেষ বন্ধু, দুপুরবেলা হাঁটিয়াই আসেন। দুজনে এ কথা সে কথা হইতেছিল, শীলার কথাই বেশী হইতেছিল।

বামুন বৌ। "হাঁগা দিদি, তা অত বড় মেয়ে সব জায়গায় বেড়িয়ে বেড়ায়, কাল সেই দুপুরে গিয়ে রাত্রে এলো, তোমরা কিছু বল্লে না?"

গৃহিণী। "বল্‌বো আবার কি? ওখানে ওর বিয়ে হবে, ওদের বিয়ের আগে দেখা সাক্ষাৎ না হলে বিয়ে ঠিক হয় না, বর কনেতে আগে দেখা সাক্ষাৎ হয়।"

বামুন বৌ। "সাহেব বিবির মত বুঝি,

তা এক রকম ভাল। আমাদের যে যাক পারে গলা টিপে দিলেই হল। আমার শৈলির কি দশা হবে ভেবে পাচ্ছিনে, এই নয় উত্তুরে দেশে পড়লো, আমার প্রাণ অস্থির হয়েছে। এখানে ত ক্ষেতের ছেলে পাওয়া ভার, আবার দেশে যেতে হবে, কি উপায় হবে জানি না। তোমার ভাসুর কি দিবি, ২০ বছরের মেয়ে, ছেসে খেলে বেড়াচ্ছে, বিয়েও কেমন বড় ঘরে হবে। তুমি না বলছিলে জমীদারের ঘর? তা তোমার ভাসুর বুঝি ঢের টাকা রেখে গেছেন।"

গৃহিণী। "ঢের আর কোথায়, মেয়ে যে সুন্দরী, দেখতে পাও না। মেমের মত রং, আর কি মুখ চোক। বড় ঘরে যে তাকে আদর করে নেবে। মেয়ে লক্ষ্মীও আছে।"

বামুন বৌ। "হাঁগা দিদি, তুমি ওঁর ছোঁয়া জল খাও?"

গৃহিণী। "রাম, রাম, আমি কেন ওর ছোঁয়া জল খাব? আমার গতরে কি ঘুন ধরেছে? ও নিজে এক পাশে ছুটি খায়, আর সারাদিন অমির সঙ্গে থাকে। এই দুপুরে কে জানে কি কচ্ছে, বোধ হয় বাইরের ঘরে আছে।"

বামুন বৌ। "কই আমি ত আস্‌বার সময় কাকেও দেখ্‌লাম না, সব নিঝুতি, একবার ডাকনা দিদি তোমার ভাসুর ঝিকে, ছুটো গান শুনি।"

গৃহিণী। "শীলা শীলা" বলিয়া বার কয়েক ডাকিলেন। শেষে বামুন বৌ নীচে উপর খুঁজিয়া আসিলেন, কোথাও পাইলেন না। তখন বামুন বৌ বলিলেন "কই নেই ত।"

গৃহিণী স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, দুপুর বেলা অমিয়কে নিয়ে বাহিরে কোথায় গেল বুঝিতে পারিলেন না। সে কথা ভিতরে তোলাপাড়া হইতে লাগিল। মুখে বামুন বৌর সহিত অন্য কথার উত্থাপন করিলেন ও গৃহ হইতে কিছু ফল তরকারী আনিয়া দিয়া বলিলেন "কাল প্রভাত বাবুর বাড়ী হতে অনেক ফল তরকারী দিয়ে গেছে, এই গুলি তুমি নিয়ে যাও, আমাদের বাড়ীতে কটাই বা লোক, কর্ত্তা ফল খান না, ভালবাসেন না। আর আমার এই পোড়া অম্বলের অসুখে কিছুই সহ্য হয় না।" বামুন বৌ হৃষ্টচিত্তে সেগুলিকে বাঁধিয়া লইলেন ও অন্য কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া গেলেন।

অমিয় শীলাকে লইয়া নদীর ধারে উপস্থিত হইল। শীলা সমস্ত দিন ঘরে বসিয়া থাকে, তাহার নদীর ধারে আসিতে ভালও লাগিল; তদ্ভিন্ন তাহার যে সুপ্রকাশের সহিত সাক্ষাৎ হইবে তাহাতেও অনিচ্ছুক ছিল না। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত যেন চলিয়া আসিয়াছে। তাহারা নদীর ধারে আসিয়া দেখিল, তৃণশয়নে সুপ্রকাশ শয়ন করিয়া আছেন। সুপ্রকাশ তাহাদিগকে দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও শীলার প্রতি চাহিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য যেন শীলার শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। শীলা মুখ ফিরাইয়া নদীর দিকে চাহিল। সুপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন ভাল আছেন? কাল খুব বেড়ালেন, কেমন লাগল?"

শীলা। "বেশ ভাল লাগল, মিঃ বসুর মা বেশ লোক, তাঁর স্ত্রীও বড় ভাল। তাঁর দেবরও ছিলেন।"

সুপ্রকাশ। "কে, সুব্রত? তাঁর সঙ্গে আলাপ হল? তাঁকে কেমন লাগল?"

নীলা তাঁহার এই প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া চাহিল, তাহার মুখে কোনও প্রকার ভাবের উদয় হইল না। সে বলিল "বেশ ত, কথাবার্ত্তা বেশ। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি কিন্তু সব চেয়ে ভাল, তিনি বড় ভাল লোক। আমার তাঁকে সব চেয়ে ভাল লাগ্‌ল। তিনি আমায় শনিবারে নিয়ে যাবেন বলেছেন।"

সুপ্রকাশ আনন্দের সহিত বলিলেন, "মিসেস্ ব্যানার্জ্জি, তিনি এখানে একলা আছেন, না সুষমাও আছে।"

নীলা। "আপনি তাঁকে জানেন বুঝি? সুষমা কে?"

সুপ্রকাশ। "খুব জানি, সুষমা তাঁর দৌহিত্রী, সে তাহলে সুশীলের কাছেই সিমলায় আছে। আমি এসে পর্য্যন্ত তাঁদের সংবাদও নিতে পারি নাই"।

নীলা। "মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে আমার খুব ভাল লাগ্‌ল।"

(সুপ্রকাশ চিন্তিতভাবে) "তিনি খুব ভাল লোক।" তারপর অমিকে বলিলেন "কি বল অমি, নৌকায় যাবে?"

অমিয়। "দিদিভাই যাবেন না, বল্‌ছেন।"

সুপ্রকাশ। "আপনি যাবেন না সত্যি! কেমন সুন্দর নদী, আর কেমন বাতাস দিচ্ছে, একটু গিয়ে ফিরে আস্‌তে পারেন।"

নীলা বলিল "না আমি যাব না, আপনারা যান।" অমি সুপ্রকাশের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল বোট হাউসে একখানি সুন্দর নৌকা ছিল, আর দু'জন লোক সেখানে ছিল। তাহারা নৌকা টানিয়া দিয়া দাঁড় ধরিল। সুপ্রকাশ অমিকে বসাইয়া হাল ধরিলেন। অমি চিৎকার করিয়া ডাকিল "দিদিভাই এখনও এস, একটু বেড়িয়ে আসব বইত নয়।"

নীলা দেখিল দু'জন লোক, অমি আছে সে একা নয়, সে যদি লক্ষ্ণৌতে থাকিত সে যাইত, কিন্তু এখানে কোন মতে নয়। তাহার নদীতে যাইবার খুব ইচ্ছা ছিল, তবু সে মস্তক নাড়িয়া উত্তর দিল "না তোমরা যাও"। সুপ্রকাশের কিছু বলিবার ছিল না, একবার নীলার প্রতি চাহিয়া বোট ছাড়িয়া দিলেন। বোট কিয়দ্দূর ভাসিয়া গেল, সে দিকে স্রোতের মুখ, যাইতে বিলম্ব হইল না। কিয়দ্দূর গিয়া তাঁহারা নৌকা ফিরাইলেন, তখনও নীলা নদীর ধারে দাঁড়াইয়া আছে। দূর হইতে নীলাকে যেন একখানি ছবির মত দেখাইতেছিল। সুপ্রকাশের ইচ্ছা থাকিলেও অনেকক্ষণ সে দিকে চাহিয়া থাকা তাঁহার যুক্তিসঙ্গত মনে হইল না। এই মুহূর্ত্তের দেখাতেই তাঁহার মনে যথেষ্ট আনন্দ হইতেছিল। কিন্তু এ যে ক্ষণস্থায়ী, এ সুখ যে এখনই ফুরাইয়া যাইবে। না, তাহা কিছুতেই হইবে না, এই ভাবেই ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, পৃথিবীতে অর্থ বড় না প্রেম বড়। নীলাও নদীর ধারে চাহিয়াছিল। এই দু'তিন বার দেখা হওয়াতেই সুপ্রকাশ যেন তাহার চিরপরিচিতের মত হইয়া গেছেন। সে যেন অন্তরের সহিত তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছে। তাঁহারা নদীর ধারে ফিরিয়া আসিলেন। নীলা অমিকে বলিল "এইবার চল বাড়ী যাই," অমিয় আনন্দের সহিত গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। পথে যাইতে যাইতে এক উচ্চ বৃক্ষে কয়েকটা ফুল দেখিয়া তাহা তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, না পারিয়া সুপ্রকাশের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল

ও বলিল "এই ফুল তুলে দিন।" সুপ্রকাশ সেই ফুল তুলিয়া দিলেন। অমিয় তাহা লইয়া লীলার হাতে দিয়া বলিল "দিদিভাই এই ফুল নাও"। লীলার লজ্জায় মুখ আরক্ত হইল। ফুল লইতে গেল, কিন্তু কয়েকটা ধূলিতে পড়িয়া গেল। সুপ্রকাশ সেগুলি তুলিয়া লীলার হস্তে দিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য একবার ত লীলার করে তাঁহার করস্পর্শ হইল। উভয়েরই মনে হইল, সমস্ত দেহে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। লীলা ও অমিয় বাগানের মধ্য দিয়া আপনাদের গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

সুপ্রকাশ সেই দিকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। তারপর মনে মনে ভাবিলেন, অদৃষ্টের উপহাস ভিন্ন ইহা আর কি বলিব। যে মায়াজালে জড়িত হইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া, এতদিন দেশ হইতে দেশান্তরে ছুটিয়া বেড়াইলাম, সেই জালেই এখানে জড়িত হইলাম। এই প্রণয়! একবার—শুধু একবার দেখিবার জন্য প্রাণে এই আকুল আকাঙ্ক্ষা। একবার দেখিয়া এত স্বর্গ-সুখ। লীলা—লীলা, তুমি স্বর্গের দেবী, কেন তুমি আমায় দেখা দিলে, যদি দেখা দিলে তবে কি আমার হইবে না? দেখি ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া, আমার এই বুক-ভরা প্রণয়ের কি পরিণাম, তাই দেখি।

লীলা ও অমিয় যখন গৃহে উপস্থিত হইল, তখন তাহাদের ব্রাহ্মণ সে স্থানে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল "খোকা বাবু, কো আড়ে যাইছিল, মা কেত্তে রিষা হউছন, চল আজ মার খাইব।" *

লীলা। "কেন গেলে অমি, আমি কেন গেলাম, তোমায় কত কথা শুনতে হবে"।

অমি। "আমায় শুনতে হোক তাতে ক্ষতি নাই, তোমায় যেন শুনতে না হয়।"

গৃহিণী তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া উঠিয়া আসিয়া রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন "লীলা তোমার একি কাণ্ড বাছা; দিন দুপুরে অত বড় মেয়ে, বাড়ী ছেড়ে চলে যাও। আজ আসুন তোমার কাকা, আমি বলে দেব। আমার বাড়ীতে এ সব পোষাবে না, তাই স্পষ্ট বলে দিচ্ছি"। তৎপরে অমিকে সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়া "লক্ষীছাড়া, দুপুর রোদে কোথায় গিয়েছিলি? ধিঙ্গি পন পেয়েছেন। দিনরাত দিদিভাই, দিদিভাই করে নেচে বেড়াচ্ছেন, সাত কালের দিদিভাই"।

অমি চক্ষের জল মুছিয়া "আমায় বক মা, দিদিভাইকে কিছু বোলো না মা।"

গৃহিণী পঞ্চমে গলা ছাড়িয়া "দিদিভাইকে কিছু বোলো না,—কেনরে লক্ষীছাড়া বোলবো না। বড় দরদ হয়েছে দেখ্‌ছি। দিদিভাই তোর বড় আপনার হয়েছে? মারে বাড়া বেদিনী তারে বলে ডান, দূরহ শীঘ্র চলে যা।" লীলা জীবনে এমন প্রচণ্ডমূর্ত্তি কখনো দেখে নাই। এমন ভাষাও তাহার প্রতি কেহ কখনও প্রয়োগ করেন নাই। সে অমিয়কে তাহার মায়ের হাত হইতে রক্ষা করিবার কোনও সুযোগ পাইল না। সে কি করিবে, ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময় ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিল —

"গুটে বড়া সুন্দর বগিরে মেম পরি জনে কে আসিছন্তি"। * গৃহিণী স্তম্ভিত, লীলা দ্রুত-পদে উপরে চলিয়া গেল।

* খোকাবাবু, কোথায় গিয়েছিলে, চল মা রাগ করছেন, মার খাবে চল।

* একটা সুন্দর গাড়ীতে মেমের মত কে আসছেন।

মিসেস ব্যানার্জ্জি হাস্যমুখে অন্দরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "কই গো, মালক্ষ্মী কোথায়?"

গৃহিণীর তখন পরিধেয় বস্ত্রেরও অসামাল, মস্তকে কাপড় টানিয়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন "কাকে খুঁজ্‌ছেন?"

মিসেস ব্যানার্জ্জি। "লীলা কোথায়? আপনি বুঝি লীলার খুড়ী মা? নমস্কার" এই বলিয়া নমস্কার করিয়া পুনরায় বলিলেন "আমি লীলাকে দেখ্‌তে এসেছি, কাল প্রভাতের ওখানে দেখা হয়েছিল। কাল প্রভাতের সকলে আমার বাড়ীতে যাবে। আপনি কাল সকালেই লীলাকে আমার বাড়ীতে পাঠাবেন, বুঝ্‌লেন, প্রভাতের মাও বলে দিয়েছেন।"

গৃহিণী। "অমি যা লীলাকে ডেকে আন।"

অমি অপমানিত হইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল, লীলাকে ডাকিতে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার দিদিভাই শয্যায় পড়িয়া আছে, অমির পদশব্দে চকিতে উঠিয়া বলিল "কি বল্‌ছ ভাই।"

অমি। তোমায় কে ডাক্‌ছেন।

লীলা ম্লানমুখে বলিল "চল যাই, তোমায় কি খুব লেগেছে!"

অমি। "না দিদিভাই, তুমি কিছু মনে কোরো না, মা না বুঝে বলেছেন, তুমি না থাক্‌লে আমি একলা থাকতে পার্ব্ব না।"

লীলা সস্নেহে তাহাকে আদর করিয়া বলিলেন "লক্ষ্মীটি, তুমি দুঃখ কোর না, চল যাই।" লীলা ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল এবং মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে দেখিয়া তাহার মুখমণ্ডল আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল সে গিয়া প্রণাম করিল। তিনি সস্নেহে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন "কাল সকালেই যেও, তোমার খুড়ীমাকে বোল্‌তে এসেছি, কেমন সকালে যাবে ত?" লীলা একবার খুড়ীমার দিকে চাহিল, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "যাব বই কি, আপনি যখন গাড়ী পাঠাবেন, তখনই যাব।" কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তিনি উঠিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় রামলোচন বাবু আসিলে, গৃহিণী তাঁহাকে সকল কথা বলিবার পর তিনি বলিলেন, "ওকে বকা তোমার ভাল দেখায় না, ৩।৪ দিনে যার এত বন্ধু জুটেছে, সে কি তোমার ভরসায় আছে? তুমি দেখ্‌ছি ও-দুহাজার টাকা খোয়াবে।"

গৃহিণী মৃদুকণ্ঠে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "জানিনা বাবু, যাতে ভাল হয় তুমি তাই কর।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পঞ্চম অধ্যায়।

রোগি-চর্য্যা।

রোগ হইলে তাপমান যন্ত্রের বিশেষ আবশ্যক। ইংরাজিতে এই যন্ত্রটীকে থার্ম্মোমিটার বলে। (১) রোগীর শরীরের উত্তাপ, (২) নাড়ী, (৩) শ্বাস প্রশ্বাস, (৪) নিদ্রা, (৫) আহার, (৬) কোষ্ঠসারল্য, (৭) রোগী কি অবস্থায় শয়ন করিয়া আছে, (৮) তাহার মানসিক অবস্থা কিরূপ—এই গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ৯৮ ডিগ্রি ৪ পইণ্ট তাপ থাকিলে স্বাভাবিক অবস্থা বুঝিতে হইবে। ইহাপেক্ষা ২ বা ৩ ডিগ্রি অধিক উত্তাপ উঠিলে সামান্য জ্বর, ৫ বা ৬ ডিগ্রি হইলে ভয়ানক জ্বর এবং ১০৭ ডিগ্রিতে বিপদের আশঙ্কা জানিবে। যদি ইহাপেক্ষা অধিক উত্তাপ উঠে, তবে জীবন সঙ্কটাপন্ন বুঝিতে হইবে। যদি স্বাভাবিক উত্তাপের দুই বা তিন ডিগ্রি কম উত্তাপ হয়, তাহা হইলেও ভয়ের কারণ থাকে। উত্তাপ উঠিলে জ্বর, এবং নামিলে নাড়ীচ্ছেদ বুঝিতে হইবে। উত্তাপ লইতে হইলে রোগীর মুখ বা কক্ষদেশ হইতে লওয়াই বিধি।

স্বাভাবিক অবস্থায় পুরুষের হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৬৮ বার, স্ত্রীলোকের ৭২ বার, শিশুর ১২০ হইতে ১৪০ বার, এবং বৃদ্ধের ৫০ বা তদপেক্ষা স্বল্প বার স্পন্দিত হয়। জ্বরে হৃৎপিণ্ড দ্রুত এবং নাড়ীচ্ছেদে ক্ষীণ হইয়া যায়। নাড়ীর স্পন্দন দেখিতে হইলে ঘড়ি ধরিয়া দেখিতে হইবে। মিনিট হইতে আরম্ভ করাই উচিত।

নিশ্বাস প্রশ্বাস দেখিতে হইলে এক হস্তে ঘড়ি ধরিয়া অন্য হস্ত রোগীর বক্ষে স্থাপন করিয়া হৃৎপিণ্ডের উত্থান ও পতন গণনা করিবে।

চিকিৎসকমাত্রেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, রোগীর নিদ্রা গভীর হইয়াছিল কি না, অথবা রোগী অস্থির ছিল কি না এবং কতক্ষণ সে নিদ্রা গিয়াছিল। সুতরাং ধাত্রীর এ সকল বিষয়ের উপর বিশেষ দৃষ্টি থাকা উচিত। এ সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে চিকিৎসককে উত্তর দিতে পারা যায় না। অথচ এগুলি জানা অত্যাবশ্যক।

রোগীর ঘর্ম্ম হইয়াছিল কি না অথবা তাহার ঘর্ম্ম শুষ্ক এবং উষ্ণ ছিল কি না, প্রস্রাব এবং মলের বর্ণ কিরূপ, বমনে কিরূপ পদার্থ নিঃসৃত হইয়াছিল—এ সকল বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখা উচিত। রোগী কিভাবে শয়ন করিয়াছিল, ধাত্রীর তাহা জানা বিশেষ আবশ্যক। ফুস্ফুসে রক্তসঞ্চয় হইলে রোগী ক্ষত-পার্শ্বে শয়ন করে এবং সুস্থ দিক উপরে থাকে। উদরস্ফীতিতে রোগী উত্তান চিৎ) হইয়া শয়ন করে এবং পদদ্বয় উঠাইয়া রাখে। যদি হৃৎপিণ্ড বা দুইটী ফুস্ফুস আক্রান্ত হয়, তবে রোগী ঠেসান দিয়া উপবেশন করিতে চায়।

রোগীর মানসিক অবস্থা রোগের উন্নতির বা অবনতির পরিচায়ক। খিট্‌খিটে হইলে বুঝিতে হইবে যে, রোগী রোগমুক্ত হইতেছে। রোগী নিস্তব্ধ ভাবে পড়িয়া থাকিলে রোগ বৃদ্ধি হইতেছে বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা করিতে হইলে চিকিৎসককে কয়েকটি বিষয়ের সাহায্য লইতে হয়, যথা (১) উষ্ণতা এবং শৈত্য (২) বিশ্রাম এবং অঙ্গচালনা, (৩) পথ্য ও ঔষধ, (৪) ধ্বংস ও পরিবর্ত্তন, এবং (৫) মানসিক শক্তি।

মনে কর জ্বর হইয়াছে, শরীর অত্যন্ত উষ্ণ। তখন শীতলতা রোগীর অত্যন্ত প্রিয়; তজ্জন্য ঠাণ্ডার উপায় করিতে হইবে। এই সময়ে শীতল আহার, শীতল জলের ব্যবহার, আক্রান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বরফ দেওয়া, উষ্ণ শরীরে শীতল জল অভিষিঞ্চন করিয়া ম্রক্ষণ করা এবং গৃহের বায়ুকে শীতল রাখা কর্ত্তব্য। কি উপায়ে ইহা সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা বলা যাইতেছে। ঘরের অভ্যন্তরে বায়ুর গমনাগমন অপ্রতিহত রাখিতে হইবে, গৃহে সূর্য্যকিরণ আসিতে দিবে না, গৃহাভ্যন্তরে বড় বড় পাত্রে জল রাখিয়া উষ্ণতা শোষণ করিতে হইবে, যদি বহির্বায়ু উষ্ণ হয়, তবে গবাক্ষে বা দ্বারে আর্দ্র পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া বায়ু-সঞ্চালনকে শীতল করিতে হইবে। মস্তক উষ্ণ হইলে এবং রক্তস্রোত জন্য ধমনী আদি স্পন্দিত হইলে Ice bag, অথবা তদভাবে কাপড়ের মধ্যে বরফ রাখিয়া, মস্তকে রাখিতে হইবে। টাইফইড জ্বরে উদরের উষ্ণতানুভূতির জন্য অথবা অস্ত্রোপচারজনিত স্ফীতি নিবন্ধন অথবা অস্থি ভগ্ন হইলে বরফ উক্ত উপায়ে প্রয়োগ করিতে হইবে।

শরীর শৈত্য দ্বারা আক্রান্ত হইলে উষ্ণতা প্রয়োগের আবশ্যক হয়। ইহা দ্বারা শরীরে রক্ত সঞ্চরণ নিয়মিত হইয়া থাকে। এই জন্য ভিতরে বাহিরে, বিশেষ স্থানে অথবা শরীরের সর্ব্বত্র উষ্ণতা প্রয়োগ সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শরীরের উষ্ণতা স্বাভাবিক; উষ্ণতার নিম্নে, অবস্থান করিলে উষ্ণতা প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন। উষ্ণতার উদ্রেক করিতে হইলে উষ্ণ বায়ু, উষ্ণ জল, উষ্ণ পোষাকের আবশ্যক। বায়ুনলীর স্ফীতি অথবা শৈত্যাক্রমণে ধূম পান দ্বারা উষ্ণতা লাগাইতে পারা যায়।

শুষ্ক এবং আর্দ্র উষ্ণতার আবশ্যক হইলে গৃহে অগ্নি রক্ষা করিয়া গৃহাভ্যন্তরস্থ বায়ুকে উষ্ণ করিতে পারা যায়। কাশি রোগে আর্দ্র উষ্ণতার আবশ্যক, সুতরাং গুড়গুড়ি বা হুকায় উষ্ণ জল ভরিয়া তাহাতে শীতল জল মিশ্রিত করিয়া কলিকার মুখে অগ্নি সংযোগ করণানন্তর নলটীকে মুখ দিয়া টানিলে আর্দ্র উষ্ণতার সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাতে কাশি নিবারিত হয়।

যদি কোন বিশেষ স্থানে উষ্ণতা লাগাইতে হয়, তবে ফোমেণ্ট বা পুল্‌টিস লাগাইলে যথেষ্ট হইবে। উষ্ণ জল স্নানের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঈষদুষ্ণ জল শিরানিচয়কে শীতল করে। উষ্ণতা প্রয়োগের আরও এক উপায় আছে। বোতল উষ্ণ জলে পূর্ণ করিয়া অথবা ইট গরম করিয়া আবশ্যকীয় স্থানের উপর রাখিলেও উষ্ণতা প্রয়োগ হইয়া থাকে। পদদ্বয় শীতল হইলে এইরূপ প্রথায় উষ্ণতা আনয়ন করা যাইতে পারে। উদরে শূল বেদনা অনুভূত হইলে এইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা প্রশস্ত জানিবে।

বিশ্রাম রোগীর পক্ষে অতীব হিতকর।

দূর-গমনে অথবা ক্লান্তি বোধ হইলে বিশ্রাম আবশ্যক। শরীরের অস্থি ভগ্ন হইলে বিশ্রাম ব্যতিরেকে তাহা জুড়িতে পারে না। মানসিক পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করিতেই হইবে। যদি চক্ষুকে বিশ্রাম দিতে হয়, তবে অন্ধকার গৃহই প্রশস্ত; কর্ণকে বিশ্রাম দিতে হইলে শব্দাদির অপগমতা চাই; শারীরিক বিশ্রাম আবশ্যক হইলে অঙ্গচালনাদি হইতে দেওয়া উচিত নহে; পাকাশয়কে বিশ্রাম দিতে হইলে অনাহারই প্রশস্ত এবং আত্মার বিশ্রামের জন্য ঈশ্বরের চিন্তা আবশ্যক।

রোগাক্রান্ত হইয়া অথবা আঘাত লাগিয়া যদি কোন অঙ্গ কঠিন হইয়া যায়, তবে তাহার চালনা প্রয়োজনীয়। যাহাতে উক্ত অঙ্গের চালনা হয়, তাহার প্রতি শুশ্রূষাকারিণীর দৃষ্টি থাকা উচিত। ঘর্ষণ দ্বারাও স্থানীয় অঙ্গের চালনা হইতে পারে।

রোগীর পক্ষে পথ্যই রোগমুক্তির প্রধান উপায়। পথ্যবিহীন হইলে শত ঔষধেও কিছুই করিতে পারে না। রোগীর কিরূপ আহার প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে শুশ্রূষাকারিণীর অভিজ্ঞতা থাকা চাই। শক্তিহীন হইলে বলকর আহারের আবশ্যক। অন্ত্রোপচার বা জ্বরে তরল খাদ্যই প্রশস্ত; অতি-ক্লান্তিতেও তরল খাদ্যের আবশ্যক হইয়া থাকে। নৈমিত্তিক বিল্লীর উত্তেজনায় লবণহীন এবং শীতল-গুণ-যুক্ত আহার প্রশস্ত। ডিপ্‌থিরিয়া বা কণ্ঠনলি-রোগে যখন গলাধঃকরণ কঠিন হয়, তখন তরল আহারই উপযোগী। বাত-রোগে শাকসব্জি এবং ফল প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিবে, মাংস না দিলেই ভাল হয়, সুরা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, তরল খাদ্যই প্রশস্ত।

শরীরের কোন স্থান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যদি অহিতকর হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে ধ্বংস করিবার আবশ্যক হয়। যে অঙ্গ অনাময় হইবার নহে, এবং যাহা থাকিলে প্রাণহানি হইতে পারে; তেমন স্থান কাটিয়া ফেলাই উচিত।

বাহিরের কোন বস্তু শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে তাহার নিষ্কাশন আবশ্যক। মনে কর, কাঁটা ফুটিয়াছে, তাহাকে যদি বাহির না কর, তবে কষ্ট অধিক হইতে পারে। এরূপ স্থলে তাহার নিষ্কাশণই প্রশস্ত। লোকে বিষ খাইলে তাহাকে বমন করানই বিধি।

মানসিক শক্তি রোগের উপর প্রভাব বিস্তার করে। রোগীর যদি ধারণা হয় যে, সে রোগমুক্ত হইতেছে, তবে আরোগ্যলাভ ত্বরিত-গতিতে হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত চিন্তায় বিপরীত ফল হইয়া থাকে। অতএব রোগীকে ভরসা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কখনও তাহার নিকট রোগাধিক্যের কথা কহিও না, কারণ তাহাতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

রোগীর গৃহ প্রশস্ত হওয়া উচিত। সে গৃহে অধিক আসবাব থাকা উচিত নহে। গৃহে বায়ু-সঞ্চরণে যেন কোনরূপ বাধা না ঘটে। হাওয়া খেলিতে না পাইলে গৃহের বায়ু দূষিত হইয়া যায়। গৃহে সূর্য্যকিরণ যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত থাকা উচিত। উত্তর-দিকের গৃহে রোগীকে কখনও রাখিবে না। শীতকালে দক্ষিণ দিকের গৃহ উত্তম জানিবে। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পূর্ব্ব অথবা পূর্ব্বদিকের কামরা হিতকর। কামরা যদি উষ্ণ থাকে, তবে জ্বরের বৃদ্ধি এবং রোগীর চাঞ্চল্য অধিক হয়। প্রাতঃকালের সূর্য্যকিরণ

প্রাণদ সুতরাং বালার্ক-কিরণ যাহাতে রোগীর গৃহে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা করা উচিত। মধ্যাহ্ন সমাগত হইলে যখন সূর্য্য-কিরণ প্রখর এবং উত্তাপ অধিক হয়, তখন গবাক্ষ বন্ধ করিয়া দিবে। অপরাহ্নে সূর্য্য-রশ্মি ক্ষীণ হইলে গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিবে। এই সময় বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত রোগী গল্প করিতে পারে।

রোগীর গৃহে কোনরূপ শব্দ হওয়া উচিত নহে। বাহিরের শব্দও যাহাতে গৃহে না যায়, তদ্রূপ করা উচিত। রাত্রে যদি নিদ্রা গভীর হয়, তবে রোগের আশু উপশম হইয়া থাকে।

রোগীর গৃহ বাটীর উপরে হওয়া উচিত, কারণ উপরে রন্ধনশালার পাকের শব্দ যায় না। এতদ্ভিন্ন রোগীর সান্নিধ্যও অহিতকর বলিয়া উপর তালায় রোগীর গৃহ হওয়াই বিধি। এরূপ হইলে নিম্নতালার ব্যক্তিগণের আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

রোগীর গৃহে শয্যা, জলপাত্র, থার্ম্মোমিটর, গামছা, এবং চেয়ার থাকা কর্ত্তব্য। রোগীর বিছানার চাদর যথেষ্ট উষ্ণ হওয়া উচিত, পরন্তু তাহা যেন হাল্কি হয়।

বাতজনিত জ্বরে অথবা বাতরোগে কম্বলের শয্যাই প্রশস্ত। এরূপ ক্ষেত্রে বিছানার চাদর না হইলেই ভাল। কারণ বিছানার চাদর পরিবর্ত্তন করা কষ্টকর এবং সূতার শয্যায় শয়ন করিলে রোগী ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পুনরায় শৈত্য দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। রোগীর শয্যার চাদর প্রত্যহ ধৌত করিয়া দিবে ও রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। গরম জলে শয্যা ধৌত করাই প্রশস্ত।

রোগীর পরিচ্ছন্নতার বিশেষ আবশ্যক। আর্দ্র গামছা দ্বারা শরীরকে পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। জ্বর হইলে মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয় এবং দাঁতে এক প্রকার হরিদ্রাভ পদার্থ জমিয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে রোগীকে উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন করিতে দিবে এবং দাঁত মাজিবার জন্য কিঞ্চিৎ লবণে তৈল সংযুক্ত করিয়া দিবে। ইহা দ্বারা যেমন মুখের দুর্গন্ধ নাশ হয়, তেমনি দন্তও পরিষ্কার হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহার আর একটি গুণ এই যে, ইহা দ্বারা মুখের বিস্বাদ দূরীভূত হয় এবং আহারে রুচি হইয়া থাকে। কেশে সামান্য গিসারিণ দিয়া ঘসিলে মস্তকে খুস্কি জন্মিতে পারে না। রোগীর গৃহে ভোজ্যবস্তু রাখিবে না। যখনই রোগীকে আহার দিবে, তখনই এরূপভাবে দিবে যেন তাহা দেখিবামাত্রই রোগীর আহারে ইচ্ছা হয়। আহার অধিক না দিয়া অল্প দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। অল্প ক্লান্তির পরিচায়ক হইলেও ভোজনেচ্ছার পরিজ্ঞাপক। রোগী যখন আহার করিবে, সে সময়ে যেন কোন ব্যক্তি তথায় উপস্থিত না থাকে। কারণ, তাহাতে আহারের বাধা হইয়া থাকে।

রোগী কোন্ পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিল, তাহা ধাত্রীর জানা আবশ্যক। কারণ ইহা দ্বারা বেদনা সম্বন্ধে অনুমান করা যাইতে পারে। সর্ব্ব-সময় শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলে গাত্রে ক্ষত হইয়া থাকে। এই ক্ষত যাহাতে না হইতে পায় তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করা উচিত। স্পিরীট এবং জল দিয়া ধৌত করিলে শরীরে শয্যাক্ষত হইতে পারে না।

ঘাম হইলে রোগী দুর্ব্বল এবং তাহার

ফুস্‌ফুস শক্তি-হীন হইয়া পড়ে। সুতরাং রোগ আরোগ্য হইলেও বহু দিন পর্য্যন্ত রোগীকে সাবধানে থাকিতে হইবে। উচ্চৈঃস্বরে পাঠ ও গীত তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ জানিবে। ফুস্‌ফুস আক্রান্ত হউক বা না হউক স্বরযন্ত্রকে ক্লান্ত করা রোগীর পক্ষে অবিধেয়, কারণ তদ্দ্বারা স্বরভঙ্গ-রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। ডিপ্‌থিরিয়া রোগে রোগী শারীরিক-শক্তি-হীন হয় বলিয়া সকল প্রকার ক্লান্তিই তাহার পক্ষে অহিতকর। বসন্ত-রোগে চক্ষু আক্রান্ত হয়, সুতরাং রোগীকে অন্ধকার-গৃহে রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। রোগী সুস্থ হইলেও কিছু দিন ধরিয়া তাহার পক্ষে পুস্তক-পাঠ অথবা ক্ষুদ্র বস্তুর উপর দৃষ্টি রাখা নিষিদ্ধ। যাহাতে গাত্রে বায়ু না লাগিতে পারে তদ্বিষয়ে সাবধান হইবে। বাত-জনিত রোগে হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হয় এবং সামান্য কারণেই ক্লান্তি-বোধ হইয়া থাকে এরূপ অবস্থায় রোগীর সম্পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক, নতুবা হৃৎপিণ্ড-স্পন্দনের রোগ জন্মিতে পারে।

রোগ নানা প্রকার, সুতরাং অবস্থা-বিশেষে বিধানও নানা প্রকার হইয়া থাকে। রোগীর জন্য বাহ্যিক যে সকল বস্তুর আবশ্যক হয়, তাহার উল্লেখ করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

আপন ঘরে।

পুণ্য-প্রভাতে নয়ন মেলিনু
তোমায় প্রণাম ক'রে,
দিবস আমার স্মরণীয় আজ,
কাটিল হরষ ভ'রে।
স্বচ্ছ একটী প্রীতি নিরমল,
হৃদয় হইল শান্ত,
ভ্রাতৃত্বের আজ হ'ল পরিচয়,
ঘুচিল ধারণা ভ্রান্ত।
বুঝিনু প্রভু! তোমার জগৎ,
নহেক পঙ্কিলময়,
র'য়েছে মানব মানবেরই মত
প্রেম-প্রীতি-করুণায়।
ভ্রান্তি করিয়া ভ্রমিলাম কত
হেথায় সেথায় ক'রে
আজি দেখিলাম ঈপ্সিত হৃদয়,
র'য়েছে আপন ঘরে।

মুর্শিদাবাদ-ভ্রমণ।

মুসলমানদিগের শেষ রাজধানী মুর্শিদাবাদ। যে মুর্শিদাবাদ প্রাচীন কালে নন্দন-কানন ছিল, আজ তাহা অরণ্য-বিশেষ। পূর্ব্বে যাহা লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করিত, আজ তাহার সমস্তই বিলীন হইয়াছে, আজ তাহা দর্শকের ক্ষোভের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাপি পুণ্যসলিল-গঙ্গাতীরবর্ত্তী যে রাজপ্রাসাদ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা মুসলমানদিগের গৌরব অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছে।

নবাব-Palace-এ প্রবেশ করিতে হইলে

নবাব-বাহাদুরের সেক্রেটারীর নিকট হইতে Pass লইতে হয়। যদি প্রবেশ করিবার অনুমতি পাওয়া যায়, তবেই প্রবেশ করিতে পারা যায়, নতুবা নহে। আমরা নবাবের সেক্রেটারীর কাছ হইতে অনুমতি লইয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিলাম। একজন রাজ-কর্ম্মচারী পথ-প্রদর্শক হইয়া আমাদিগকে লইয়া চলিল। সিঁড়ি দিয়া উঠিবার পথেই দুই পার্শ্বে, এক দিকে একটী কৃত্রিম গণ্ডার ও অপর দিকে একটী কৃত্রিম কুমীর, উভয়েই যেন দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়াছে—এই ভাবে রক্ষিত। সিঁড়ির উভয় পার্শ্বে কত রং-বে-রঙের ছবি, ফটোগ্রাফ; এ সকল কত কালের পুরাতন, কিন্তু দেখিলে নূতন বলিয়া ভ্রম হয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় আফগান-যুদ্ধ; প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় Mysore war, Burial of Sir John Moore, এবং নবাবের আত্মীয়-স্বজনের চিত্র-সকল প্রাচীরের গায় বিলম্বিত। দালানের পর দালান, কক্ষের পর কক্ষ, কত যে অতিক্রম করিয়া গেলাম তাহা নির্ণয় করা কঠিন। একটি দালানের প্রাচীরের গায় বর্ত্তমান নবাবের তৈল-চিত্র দেখিলাম। তাঁহার বাল্যের এবং যৌবনের চিত্রও দেখিলাম। বর্ত্তমান যুবরাজের চিত্রও তথায় দৃষ্ট হইল। দালানের উভয় পার্শ্বে কত সুন্দর সুন্দর শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি glass-case-এর মধ্যে সুরক্ষিত। দেখিয়া চক্ষু সার্থক হয় বটে, কিন্তু হাত দিবার অধিকার নাই; কারণ পাছে অসাবধানতা বশতঃ হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। আর একটী দালানে নবাবের পূর্ব্বপুরুষদিগের চিত্র। একটী কক্ষ দেখিলাম, সেখানে বেগমদিগকে লইয়া নবাব আমোদ-প্রমোদ, গান-বাজনা, নৃত্য প্রভৃতি করিতেন। সেখানে কয়েক রকম বাজনাও দেখিলাম, কক্ষতল সবুজ মক্‌মল-দ্বারা আবৃত। নবাব বেগমদিগকে লইয়া যে স্থানে বিশ্রাম করিতেন, সে স্থানও দর্শন করিলাম। নবাবের Dining Hall দেখিলাম, সে এক বিরাট ব্যাপার। প্রায় ২০০।২৫০ জন এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে পারেন। চারিদিকে দর্পণ; সেই ঘরে প্রবেশ করিলে চারিদিকে নিজের মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হয়। ইহার পর নবাবের লাইব্রেরীতে (পাঠাগারে) ঢুকিলাম। বাঙ্গলা, ইংরাজী, ফরাসী, হিব্রু, পারসী প্রভৃতি অনেক রকম বই দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিলাম। কোরাণ একখানি কত বড় গ্রন্থ; সেই কোরাণকে মাত্র দেড় পৃষ্ঠা, তিন, পাঁচ ও সাত পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে; এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া লেখা যে, দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ধনাগার দেখিলাম, সেখানে কত রকম হীরা! শুনিলাম, নানা দেশ হইতে জহুরীরা নবাবের কাছে হীরা পরীক্ষা করিতে আসে। আর একটী ঘরে ঢুকিলাম, সে ঘরটী শ্বেত-প্রস্তরে নির্ম্মিত, গোলাকৃতি। উপরে দেওয়ালের গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাল-কাটা গবাক্ষ, তাহার ভিতর দিয়া আলো আসিতেছে। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন বৈদ্যুতিক আলোকের দ্বারা কক্ষটী আলোকিত। সেই ঘরটীতে প্রবেশ করিয়া এত আরাম হইল বলিবার নহে। বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালের দিনে ঘরটী বড়ই আরাম-প্রদ। গৃহটী বরফের ন্যায় শীতল। একটী লাল মক্‌মলের আস্তরণ পাতা রহিয়াছে, তাহার উপর তাকিয়া, বালিস প্রভৃতি রহিয়াছে; ইহা অতীত লাল

মক্‌মলের চাঁদোয়া টাঙান রহিয়াছে। তাকিয়া, বালিস, আস্তরণ ও চাঁদোয়ার চারিধারে স্বর্ণের ঝালর। এই স্থানে নবাব বসিয়া মন্ত্রণা করেন। এই ঘরের মধ্যভাগে একটী প্রকাণ্ড ঝাড় লণ্ঠন ঝুলান। এখন তাহা শত শত বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা প্রজ্বলিত হয়। চারি পার্শ্বে চারিটী শ্বেত প্রস্তরের সতরঞ্চ, দশ পঁচিশ প্রভৃতি খেলিবার টেবিল ও চারিটি নারী-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। (Lord Carmichael আসিয়া এই ঘর দর্শকবৃন্দের জন্য সর্ব্ব-প্রথম উদ্ঘাটন করেন।)

নবাবের Drawing room-এর টেবিলের উপর নানা প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির পোষাক পরিচ্ছদের চিত্র এল্‌বামেতে অঙ্কিত রহিয়াছে। আরও কতকগুলি ঘর দেখিলাম, সে গুলি তেমন সুসজ্জিত নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে নবাবের ঐ ঘরগুলি ভাল করিয়া হিন্দুদিগের ছবিতে সজ্জিত করিবার ইচ্ছা আছে। কয়েক খানি হিন্দু ছবিও রহিয়াছে, রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি, গঙ্গাবতরণ, গৌর নিতাইয়ের কীর্ত্তন প্রভৃতি হিন্দু-চিত্র আছে। নবাবের Palaceএ জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির নানা রকমের চিত্র আছে; প্রাকৃতিক দৃশ্য, তৈল-চিত্র, দাম্পত্য-প্রেমের তৈল-চিত্র, যুদ্ধ বিগ্রহ, সমাধি প্রভৃতি অনেক প্রকারের দৃশ্য আছে। মুর্শিদাবাদের সর্ব্বপ্রধান মেলা, যাহাকে "বেড়া" বলে, অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই মেলা উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানের স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে। এই "বেড়া" মেলার একখানি তৈল-চিত্র রাজপ্রাসাদে আছে।

নবাবের বাগান দেখিলাম, কৃত্রিম পাহাড়, কৃত্রিম ঝরণা ও নদী দেখিলাম, মাঝে মাঝে আলোক-হস্তে প্রস্তরনির্ম্মিত নারীর প্রতিমূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গঙ্গাতীরে যে স্থানে বসিয়া নবাব বেগমদিগকে লইয়া সান্ধ্যবায়ু সেবন করেন, তাহাও দেখিলাম।

এই নবাব-প্রাসাদ—যাহা যুগ যুগান্তর ধরিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তেমনি অটুট ও নূতন রহিয়াছে। দেখিলে মনে হয় যেন ইহা কখনও মলিন হইবে না। প্রতি বৎসর কত স্থান হইতে কত লোক আসিয়া ইহা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিতেছে।

নবাবপ্রাসাদের অপর পার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড ইমামবাড়ী দেখিলাম; মহরমের সময় ইহা খুব ভাল করিয়া সাজান হয়।

মুর্শিদাবাদের নিকটে কাট্‌রা নামক একটী স্থান আছে; সেখানে পূর্ব্বে একটী খুব বড় মস্‌জিদ ছিল, এখন তাহার ভগ্নাবশেষমাত্র অবশিষ্ট। জাফর খাঁ নামক একজন নবাব জীবিতকালে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন; মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার অনুতাপ হয় এবং তাঁহাকে জীবন্ত কবর দিতে বলেন ও ইহাও বলিয়াছিলেন যে, এমন স্থানে কবর দেওয়া হয় যেন লোকে তাহার কবরের উপর পদধূলি দিয়া যায়। ঐ মসজিদের সিঁড়ির নীচে এমন ভাবে তাঁহাকে কবর দেওয়া হইয়াছে যে, মস্‌জিদের ভিতর প্রবেশ করিতে হইলে কবরের উপর দিয়া যাইতে হয়।

একটী কামান দেখিলাম, সেটী নিকটস্থ ঝিল হইতে বন্যার তোড়ে ভাসিয়া আসিয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষের trunk-এ আট্‌কাইয়া গিয়াছে, ইহা ১২ হাত লম্বা।

"কদম-মরিয়া" নামে আর একটা স্থান দেখিলাম। সেখানে প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় কাঙ্গালী-ভোজন হয়। সেখানেও অনেক মুসলমানের কবর দেখিলাম।

নবাব বাহাদুরের পুরাতন মস্‌জিদ দেখিলাম। সেখানে Keating সাহেবের কবর দেখিলাম। ঐখানে একটী ইঁটের পাঁজা আছে, তাহা এক্ষণে মসজিদের দেওয়াল দিয়া বেষ্টিত। প্রবাদ আছে যে, ঐ ইঁটের পাঁজার মধ্যে অনেক টাকা আছে। তাহা Keating সাহেব জানিতে পারিয়া লইতে আসেন। তিনি যখন পাঁজার ইঁট সরাইয়া অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তখন এক-জন মুসলমান ফকির মস্‌জিদ হইতে তাঁহাকে বলিল "ওরে সাহেব তুই ওখানে কি করিতে-ছিস্; তুই নিশ্চয় মরিবি।" সাহেব নিষেধ সত্ত্বেও যেমন একখানি ইঁট সরাইয়াছে, তাহার মুখ হইতে গল্‌গল্ করিয়া রক্ত বাহির হইল ও কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার মৃত্যু হইল।

ঐ মস্‌জিদের পশ্চাৎ দিকে একটী প্রশস্ত ঝিল আছে। ইহার নাম "মতিঝিল"। ইহা এত বড় যে, লোকে অনুমান করেন ইহা পূর্ব্বে গঙ্গার একটী অংশ ছিল; কালে স্রোত বন্ধ হইয়া বৃহৎ ঝিলে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে মুক্তা, সুক্তি, ঝিনুক প্রভৃতি পাওয়া যাইত, সেজন্য উহার নাম "মতি-ঝিল"। ইহাতে এখন অনেক মাছ পাওয়া যায়। নবাবের বাগান-বাড়ীর মধ্যে Green house ও Band stand দেখিলাম, নবাব যে স্থানে খেলা করেন তাহা দেখিলাম।

বহরমপুর হইতে ট্রেণে করিয়া মুর্শিদাবাদ যাইতে হইলে, Lord Clive সর্ব্বপ্রথম যে বাড়ীতে আসিয়া উঠেন, তাহা দেখা যায়। উহাও দেখিলাম।

মুর্শিদাবাদের ব্রাহ্মসমাজও দেখিলাম, তাহা এক্ষণে ভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা নবাবের অস্ত্রাগার আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছে। কত প্রকারের ছোট বড় কামান, বন্দুক, গুলি, গোলা, তরবাল, ঢাল, বর্শা প্রভৃতি দেখিলাম, তাহা এই ক্ষুদ্র শক্তিতে বর্ণনা করিতে অক্ষম। ইহা দেখিয়া অতীত কালের সেই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ চিত্রখানি যেন প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম।

শ্রীসুষমা সিংহ,
বহরমপুর।

আশীর্ব্বাদ।

শীতের কুহেলিময় পূরব আকাশে,
পট্টবস্ত্রে সুসজ্জিতা শুভ্র উষারাণী।
অধরে পুণ্যের ছায়া সুমধুর হেসে,
চেয়েছিল কুলাননী গাহি আগমনি॥
উপমার ডালি বাহি আনিয়াছে সাথে
ছুটায়ে অমিয়ধারা আকুলি পরাণ।
ত্রিদিব মন্দার গুচ্ছ ঝরিল প্রভাতে
কুড়ায়ে আঁচল পাতি দেবতার দান॥
চিরদিন প্রমুদিত নবীন সুন্দর
উজলিয়া থাক এই সাধের কানন
সৌরভে কররে প্রীত সকল অন্তর
মঙ্গল আলোক তুই হৃদয়-নন্দন॥

শ্রীসুনীতি দেবী।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

নমিতার পিতা, স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র মিত্র, মহাশয় লোক ছিলেন। তিনি স্বল্প-কাল-ব্যাপী কর্ম্ম-জীবনের অঙ্কে তেমন কিছু মহদনুষ্ঠানের চিহ্ন আঁকিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের দৃঢ় সত্যনিষ্ঠা, অকপট সরলতা ও উদার সহৃদয়তার কথা স্মরণ করিয়া এখনও, আত্মীয় স্বজনের কথা দূরে থাকুক, অনেক নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিও তাঁহার নামে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না।

নিজের অদম্য অধ্যবসায়বলে, নিঃসহায় নির্ব্বান্ধব যাদবচন্দ্র যৌবনে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় তিনি বিবাহ করেন। বিবাহের কিছু দিন পরেই তিনি মহাত্মা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

ধীর বিবেচনা-শক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা এবং অগাধ সত্যনিষ্ঠার বলে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিলেও ব্যবসায়ে আশানুরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু সেই অকৃতকার্য্যতা তাঁহার জীবনে যে শান্তি, যে সন্তোষ বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহাতেই তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন।

যথাক্রমে তাঁহার তিন পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ পুত্র অনিলের অপেক্ষা কন্যা নমিতা দুই বৎসরের ছোট; নমিতার পর বিমল ও অপর কন্যা সমিতা জন্ম গ্রহণ করে। সমিতার জন্মের প্রায় পাঁচ বৎসর পরে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র সুশীলকুমার ভূমিষ্ঠ হয়।

পুত্রকন্যাগুলিকে যথোপযুক্তরূপে শিক্ষা দিতে তিনি একটুকুও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, তিনি তাহাদের শিক্ষার ভার বিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই; নিজেও সর্ব্বদা শিক্ষকের যত্ন, পিতার স্নেহ, বন্ধুর সহৃদয়তা ও পরীক্ষকের তীক্ষ্ণ বিচারনৈপুণ্যে তাহাদের চরিত্রগঠনে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার শিক্ষাগুণে সন্তানগণ বুঝিয়াছিল যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু আত্মাভিমান নহে, শিক্ষা জীবনের উন্নতলক্ষ্যে অগ্রসর হইবার পন্থামাত্র।

যে বৎসর নমিতা এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, সেই বৎসর অনিলও ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া পিতার নির্দ্দেশক্রমে চিনা মাটীর কাজ ও অপরাপর প্রয়োজনীয় শিল্পবিদ্যা শিক্ষার্থ বিদেশে গমন করে। পিতা কন্যার মানসিক গতিপ্রবণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তাহাকে চিকিৎসা বিদ্যা-শিক্ষার্থে কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

যাদব বাবু সমস্ত জীবনের উপার্জ্জনের ফলে কলিকাতায় একখানি বাড়ী ও কয়েক সহস্র মুদ্রা ভিন্ন আর বেশী কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। পুত্র অনিল যখন বিদেশে যায়, তখন তিনি তাঁহার সমুদয় সঞ্চিত

অর্থের একটী কপর্দ্দকমাত্র অবশিষ্ট না রাখিয়া সমস্ত অনিলের হাতে তুলিয়া দেন। তাঁহার এই দুঃসাহসিকতায় অনেকেই দুঃখিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি পূর্ব্বাপর ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছিলেন, কোন প্রতিকূল ঘটনাতেই বিচলিত হন নাই, তাই বন্ধুবর্গের হিতৈষী মন্তব্যে ধন্যবাদ দান করিলেন, কিন্তু নিজের সঙ্কল্প-অনুযায়ী কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

নির্ব্বিঘ্নে একটী বৎসর কাটিয়া গেল। নমিতা ক্যাম্বেলে প্রথম-বার্ষিক-শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। কিন্তু সেই সময় সহসা জ্বর-বিকারে আক্রান্ত হইয়া পিতা ইহধাম ত্যাগ করিলেন,—সংসারটা আকস্মিক বজ্রদণ্ড-ভ্রষ্ট প্রাণীর মত অবলম্বন-হীন-রূপে ভয়াবহ অবস্থা-স্তরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, নমিতার পড়াশুনা বন্ধ হইল।

পিতা মৃত, অভিভাবক ভ্রাতা বিদেশগত; ছোট ছোট ভাই ভগিনীর প্রতিপালন, এবং বিধবা জননী ও নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার গ্রহণের দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। এরূপ অবস্থায় পড়িলে অন্যে কি করিত বলা যায় না, কিন্তু নমিতা ধৈর্য্যচ্যুত হইল না। শিক্ষালোকের সাহায্যে সে বিশ্বসংসারের যতটুকু চেহারা দেখিতে পাইয়াছিল, তাহাতে বুঝিয়াছিল যে, সংসারে অসুবিধা চির দিনই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে, এবং থাকিবেও,—কিন্তু অসুবিধা নিবারণের উপায়ও ভগবান্ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিয়াছেন। মানুষের কর্ত্তব্য, শুধু উপযুক্ত ক্ষেত্রে শক্তির সদ্ব্যবহার করা। নমিতা সত্বর কোন একটা উপার্জ্জন-পন্থা আবিষ্কারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। বিদেশগত অনিলকে সাংসারিক দুর্ঘটনার বিষয় সমস্ত জানাইয়া বা প্রশ্ন পরামর্শের দ্বারা উৎকণ্ঠিত করিয়া তোলার কিছুই আবশ্যক বিবেচনা করিল না, দিবারাত্র শুধু নিজের কর্ত্তব্য-সাধন করিতে লাগিল।

চেষ্টার ফলে শীঘ্রই দুই চারিটা শিক্ষয়িত্রীর কাজ জুটিল, কিন্তু নমিতা দেখিল সেরূপ অল্প বেতনে কলিকাতায় সংসার-খরচ চালান দুঃসাধ্য,—তাহা ছাড়া ভাবিয়া দেখিল, যখন পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ আহরণ করিতেই হইবে, তখন যথাসাধ্য তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত—নিজের দিক দিয়া সেখানে সুখ সুবিধাটাকে বড় করিয়া দেখিলে চলিবে না। নমিতা ক্যাম্বেলের কর্ত্তৃপক্ষকে ধরিয়া দার্জ্জিলিঙের নিকটবর্ত্তী কোন এক সহরের হাঁসপাতালে শুশ্রূষাকারিণীর কাজ গ্রহণ করিয়া সেইখানে চলিয়া গেল; বিমল, সমিতা ও সুশীল কলিকাতায় মাতার কাছে রহিল।

তাহার পর যথাক্রমে হিতৈষী বন্ধু-বান্ধবের পত্রে ও নমিতার পত্রে বিদেশবাসী অনিল একে একে সমস্ত সংবাদ শুনিতে পাইল। সংবাদ সকল শুনিয়া সে প্রথম প্রথম দেশে ফিরিবার জন্য বড়ই উতলা হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু শেষে নমিতার পরামর্শানুসারে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শান্ত হইল। আরব্ধ শিক্ষাটাকে ত্যাগ করা যেমন সহজ, তেমনই নিষ্ফল,—কিন্তু ইহাকে চোখ কাণ বুজিয়া সমাপ্ত করিয়া তোলা যতই কঠিন হউক না কেন, ইহা ভবিষ্যতের পক্ষে যে যথেষ্ট সুফলজনক তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অনিল চোখ কাণ বুজিয়া খাটিতে লাগিল। কনিষ্ঠ ভগিনী হইলে কি হইবে, নমিতাকে সে নিজের অপেক্ষা অনেক

অংশে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিত, পূর্ব্বাপর তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিত,—এখন অভাবের মুখে তাহার স্বেচ্ছা-স্বীকৃত-গুরু-দায়িত্ব-বহন-ক্ষমতাকেও অনিল অগ্রাহ্য করিতে পারিল না; বিশেষতঃ নমিতা যখন লিখিল—"পিতা যেমন উচ্চ-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তোমাকে বিদেশে শিক্ষা-লাভার্থ পাঠাইয়াছিলেন, তেমনই আমরাও প্রাণপূর্ণ নিষ্ঠায় ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া, ঐকান্তিক চেষ্টায়, তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে যত্ন করিব; যদি শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মার একটুকুও সন্তোষ বিধান করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সন্তানত্ব সার্থক বলিয়া জানিব, এবং জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিব;"—তখন অনিল অশ্রুর সহিত অন্তরের সমস্ত দ্বন্দ্ব সংশয় মুছিয়া, ঘন-কম্পিত-হস্তে তিন ছত্রে সমাপ্ত করিয়া নমিতাকে একখানি পত্র লিখিয়া, নিজের কাজে মন দিল; এবং নমিতাও সেই পত্র পাইয়া আশ্বস্তচিত্তে জগদীশ্বরকে প্রণাম করিল।

কিছুদিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিল। তাহার পর নিজের চেষ্টায় ও কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহে নমিতা যে হাঁসপাতালে কাজ করিতেছিল তথা হইতে বদলী হইয়া কয়মগঞ্জের হাঁসপাতালে আসিল। এখানে সকল বিষয়ের সুবিধা দেখিয়া, সে কলিকাতার বাড়ীখানি ভাড়া দিয়া, মাতা ও ভাই ভগ্নীগণকে এখানে লইয়া আসিল এবং বিমলকে স্থানীয় হাইস্কুলে ও সমিতাকে বালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিল। আর্থিক অসচ্ছলতা প্রযুক্ত সুশীলের পড়ার জন্য গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিল না, আপাততঃ সে ভার নিজের স্কন্ধেই লইল—নিজের খুব বেশী কাজ পড়িলে বিমলের উপর সুশীলের তত্ত্বাবধানের ভার দিত; কখনও কখনও সমিতারও যে, সে কাজে ডাক পড়িত না, এমন নহে,—কিন্তু কাজটা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠিত একমাত্র নমিতারই হস্তে। সুশীলকে বাগাইয়া চালান অপরে তেমন সুবিধা-জনক ব্যাপার মনে করিত না।

কলিকাতার বাড়ী-ভাড়ায় এবং নিজের উপার্জ্জনে এখন সংসারের অবস্থা অনেকটা সচ্ছল হইল; অধীনস্থ কর্ম্মিগণের উপর নিয়ত করুণাময়ী মিস্ স্মিথের যত্ন থাকায় নমিতার বাহিরেও কিছু কিছু উপার্জ্জন হইতে লাগিল। মিস্ স্মিথ তাঁহার অপর শুশ্রূষাকারিণী—খৃষ্টান যুবতী মিসেস দত্ত ও মিস্ চার্চ্চিয়ানকেও স্নেহ করিতেন, কিন্তু স্বভাবমাধুর্য্য এবং কার্য্য-নৈপুণ্য হেতু নমিতাকেই বেশী ভালবাসিতেন। অল্প দিনের পরিচয় হইলেও নমিতা মিস্ স্মিথের অনেকখানি হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছিল। আর নমিতাও যে কার্য্যব্যপদেশে তাঁহাকে শুধু অন্য পাঁচ জনের মত শ্রদ্ধা সম্মান দেখাইয়া চলিত — এমন নহে, তাঁহার হৃদয়ের ঔদার্য্যকে নমিতা অন্তরের সহিত ভক্তি করিত এবং এই বিদেশে তাঁহাকে শুভাকাঙ্ক্ষিণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিভাবিকা বলিয়া মনে করিত।

মিস্ স্মিথ ইংরেজকন্যা, সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা। কি কারণে বলা যায় না, আযৌবন বিবাহের প্রতি তাঁহার গভীর ঔদাসীন্য প্রযুক্ত তিনি চির-কুমারী। মৃতা সহোদরার একটী পুত্রকে লালনপালন করিয়াছিলেন, তাহাকে

যথাসময়ে লেখাপড়াও শিখাইয়াছিলেন; সে এখন সিবিলিয়ান হইয়া ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেই তাঁহার একমাত্র আত্মীয়। মিস্ স্মিথের ধাত্রীবিদ্যায় হাত-যশ ছিল, তদ্ভিন্ন তাঁহার সরকারী উপার্জ্জনের তুলনায় বেসরকারী উপার্জ্জন দ্বিগুণ হইত। দরিদ্রের প্রতি করুণা-প্রবণ-হৃদয়া এই নারীর দানশীলতাও যথেষ্ট ছিল—মিস্ স্মিথ অর্থের সদ্ব্যয় কিরূপে করিতে হয়, তাহা জানিতেন। কেহ কোন দিন তাঁহাকে অর্থ ভোগ-যোগ্য আত্মীয়ের জন্য আক্ষেপ করিতে শুনে নাই, বরং অনেকে সম-বেদনার স্বরে তাঁহার সমক্ষে সে প্রসঙ্গ তুলিয়া শেষে লজ্জা ও বিস্ময়ের সহিত নিরুত্তর হইতে বাধ্য হইত। মিস্ স্মিথ বলিতেন, পৃথিবীতে যিনি আমায় যতটুকু সাহায্যের সুযোগ দেন, আমি তাঁহার কাছে ততটুকু কৃতজ্ঞ; আমার ধনের যোগ্যাধিকারী,—পৃথিবীর প্রত্যেক অযোগ্য, উপায়হীন, দরিদ্র ব্যক্তি; আর আমার সন্তান ?"—মিস স্মিথ হাসিয়া কথাটা সমাপ্ত করিতেন, প্রতিপক্ষ এইখানেই পরাভব মানিত।

৩

পূর্ব্বদিন রাত্রে মিস্ স্মিথের সহিত একটা 'কলে' গিয়া, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া, নমিতা যখন বাড়ী ফিরিল, তখন বেলা সাড়ে দশটা। গত রাত্রে সাড়ে এগারটার সময় 'ডাক' পাইয়া মিস্ স্মিথ নমিতাকে হাঁসপাতাল হইতেই লইয়া চলিয়া যান। আহ্বানকারী ভদ্রলোকটী স্থানীয় জজ কোর্টের উচ্চপদস্থ গণ্য মান্য ব্যক্তি। তাঁহার কন্যাকে প্রসব করাইয়া মিস্ স্মিথ রাত্রি এগারটার সময় ফিরিয়া আসেন, কিন্তু অল্পবয়স্কা প্রসূতি প্রসবের পর বারম্বার মূর্চ্ছিত হওয়াতে নমিতা সারারাত্রি শুশ্রূষার জন্য সেখানে থাকে। সকালে মিস্ স্মিথ গিয়াছিলেন, রোগিণী তখন অনেকটা ভাল; মিস্ স্মিথ বলিলেন এখনও নমিতাকে সেখানে কয় দিন যাওয়া আসা করিতে হইবে; কারণ শিশুটী অত্যন্ত ক্ষীণ এবং রোগিণীরও পরিচর্য্যা আবশ্যক।

ক্লান্তদেহে অনিদ্রা-শুষ্ক-মুখে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে নমিতা আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। বাহিরের 'চলন' ঘরের চৌকাঠ পার হইয়াই—নমিতা অবাক হইয়া দাঁড়াইল! দেখিল, সুশীল এক চড়ুই পাখীর পায়ে মোটা 'টোয়াইন্' সুতা মজবুত করিয়া বাঁধিয়া, তাহাকে উড়াইয়া উড়াইয়া মহা উল্লাসে খেলা করিতেছে। পাখীটা প্রাণপণ-শক্তিতে উড়িবার চেষ্টায় ব্যর্থপ্রয়াস হইয়া ঘন ঘন পড়িয়া হাঁপাইতেছে, আবার ডানা ঝট্‌পট্ করিয়া উড়িয়া যাইতেছে, — বন্ধন-রজ্জুতে আটকাইয়া,পুনশ্চ থরথর-কম্পিত দেহে মেঝেয় লুটাইয়া ধড়্‌ফড়্ করিতেছে;—আর বালক ভৃত্য রামশঙ্কর কতকগুলা জবাফুল একটা সুতায় গুচ্ছবদ্ধ করিয়া—ভয়-কাতর পাখীটার সম্মুখে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে সার্কাসের জকারের মত নাচিতেছে! তাহার নৃত্য নৈপুণ্যের বিচিত্র কৌশলে সুশীল এবং যুবক পাচক গৌরী পাঁড়ে মুখে হাত চাপা দিয়া প্রবল হাস্যাবেগে অধীর হইয়া উঠিয়াছে!

নমিতাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া, রাম শঙ্কর গোয়ালার অদ্ভুত নৃত্যলীলা অকস্মাৎ সমাপ্ত হইয়া গেল। সুশীলও তাড়াতাড়ি পাখীটাকে মুঠায় পুরিল, গৌরী পাঁড়ের

হাস্যোচ্ছ্বাস বন্ধ হইল, তাহাদের স্ফূর্তি-কৌতুকের হস্ত-বিবর্ত্তন ভঙ্গীটা এমনই তীব্র হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠিল যে, নমিতাও আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া—সামলাইয়া লইয়া বলিল, "এই পাখী নিয়ে খেলা হচ্ছে! আজ বুঝি আপনার পড়াশুনা মোটেই হয় নি?"

অবশ্য এ স্থলে গ্র-জন্মিত 'আপনার' সর্ব্বনামটী শ্রদ্ধা ভক্তির গুরুত্ব নিবন্ধন বা সবিনয় শিষ্টতার অনুরোধে প্রযুক্ত হয় নাই,—ইহার গূঢ়ার্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ! সুশীল বুঝিল। সে ছুতা পাইয়া কষ্টরুদ্ধ হাস্যবেগ তৎক্ষণাৎ সোচ্ছ্বাসে মুক্ত করিয়া দিয়া, খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল "সে হয়ে গেছে মেজদার কাছে, মেজদা তোমায় খুঁজতে গেছে, তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে?"

ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত নমিতা বলিল "আমার সঙ্গে? কই নাত! সে কি আজ স্কুল যায় নি?"

"স্কুল! হা-হা-হা-হা! আজ যে রোববার দিদি!"

অপ্রতিভ হইয়া নমিতা সুশীলের দিক হইতে দৃষ্টি তুলিয়া লইল, চপলপ্রকৃতি বালক এখনই হয়তঃ তাহাকে আবার হাসাইয়া ফেলিবে! সে মুখ ফিরাইয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

নমিতার সম্মুখে অপ্রস্তুত হইয়া, ভৃত্য ও পাচক এতক্ষণ পলাইবার ছুতা খুঁজিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল। নমিতাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া দ্বারপার্শ্ববর্ত্তী পাঁড়ে ঠাকুর নিতান্ত নিরীহ আকৃতির দুর্গা-অবতারের মত গলা বাড়াইয়া মিটমিটে চক্ষে তাকিয়া বলিল "আপ্‌কো চা-পানি বইল,' গোনে দেগা দিদিমায়?"

নমিতার পক্ষে 'দিদিমায়' সম্ভাষটুকু ঠিক ন্যায়ের যুক্তিসিদ্ধ না হইলেও কেহ কোন দিন সে কথা লইয়া তর্ক করে নাই, কারণ ইহা ভৃত্যগণের স্বেচ্ছা-দত্ত উপাধি। ভৃত্যেরা নমিতাকে শুধু 'মা' বলিয়া ডাকিতে পারিত না, কারণ নমিতার মাতা-রূপিণী 'মাই-জী' বাড়ীতে বর্ত্তমান, অথচ তাহাকে শুধু 'দিদি' বলিয়া ডাকিতেও বোধ হয় ইহাদের মুখে বাধিয়া যাইত; তাই ইহারা উভয় সঙ্কোচন সংযোগে এই পছন্দসই অভিধানটি যোগাড় করিয়াছে।

পাঁড়ে ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে পুনশ্চ প্রশ্ন করিয়া নমিতা জানিল যে, ঠাকুরের সমস্ত রন্ধন শেষ হইয়া গিয়াছে এবং এখনও উনানে যথেষ্ট আগুণ আছে। নমিতা বলিয়া দিল যে, চায়ের জল যেন অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে প্রস্তুত করা হয়, কারণ আগে সে স্নান করিবে।

গৌরী পাঁড়ে আর সেখানে অপেক্ষা করা সুবিধাজনক নহে বিবেচনা করিয়া, ধীরে ধীরে পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হইল; রামশঙ্করও কষ্ট-সৃজিত "ভাল-মানুষী"-ভরা মুখে ধীরে ধীরে তাহার অনুবর্ত্তী হইতেছিল, কিন্তু সেই সময় নমিতা সুশীলের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "পাখীটার ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধেছ, ওটাকে মেরে ফেল্‌বার জন্যে বুঝি? ওটা ধরলে কে?"

সুশীল তিরস্কার সম্ভাবনা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে মনোযোগী হইল। সে নমিতাকে জানাইল যে ইতিপূর্ব্বে

পাখীটাকে করায়ত্ত করিবার দুরভিসন্ধি তাহার মস্তিষ্কে আদৌ উদ্ভূত হয় নাই, কেবল গৌরী পাঁড়ে ও রামশঙ্কর দুই জনে তাহাকে পাখী লইয়া খেলাইবার সঙ্কল্পে প্রবুদ্ধ করিয়াছে মাত্র, এবং উহারাই দুই জনে পাখীটাকে যে রান্নাঘরের ভিতর ধরিয়াছে—সে কথা বলিতেও ভুলিল না।

গৌরী পাঁড়ে ততক্ষণে চৌকাঠের বাহিরে গিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল, কিন্তু রামশঙ্কর তখনও গৃহের বাহির হইতে পারে নাই; সুশীলের কথায় সে প্রমাদ গণিল। কৌশলে কাঁড়া কাটাইবার জন্য সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বিনয়াবনত দৃষ্টিতে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল "জী আপ্‌কো আসনান্-কি পানি তিনো টব্ উঠায় গা?"

তাহার ধূর্ততা দেখিয়া নমিতা ঈষৎ হাসিল। সস্মিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "তিনো টব নেই বাবা, দুনো টব মে হোগা,—"

রামশঙ্কর অধিকতর শান্তশিষ্টভাবে মাথা নত করিয়া বলিল "মগর্ খোখা বাবু বো আপ্‌কো বাস্তে আবিতক্ আস্‌নান্ কিয়া নেই।"

নমিতা সুশীলের দিকে চাহিয়া বলিল "চান্ করিস্ নি কেন রে?"

সুশীল বিপদে পড়িল। ইহাদের সকল ভাই বোনেরই সকালে স্নান করা অভ্যাস। সুশীলকে স্নানের সময় নমিতা সাহায্য করিত, অপরের সাহায্য সুশীলের মনঃপূত হইত না। ক্বচিৎ নমিতার কাজের বেশী ভিড় পড়িলে তাহাকে ছোটদিদির হাতে পড়িতে হইত, সেটাও অবশ্য নমিতার নির্দ্দেশক্রমে; আজও অবশ্য স্নানের সময় 'ছোটদিদি' তাহাকে ডাকাডাকি করিয়াছিল, কিন্তু সে সময় সদ্য-ধৃত পাখীটা লইয়া সুশীল ঘোরতর ব্যস্ত থাকায় তাহার আহ্বানে কর্ণপাত করে নাই। এখন নমিতার 'কেন' প্রশ্নের উত্তরে রামশঙ্করের কথিত 'আপকোবাস্তে' উত্তরটা প্রয়োগই সে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ বিবেচনা করিল; চক্ষুদ্বয় যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া, ঢোক গিলিয়া বলিল "এই তুমি আসনি কিনা—তাই। যাও শঙ্কর, দিদিমায় কি সাত হাম্‌রাত্তি আসনান্-কি পানি উঠায় দেও।"

শঙ্কর বিদায় হইলে নমিতা পাখীকে অনর্থক কষ্ট দিয়া খেলার জন্য ও ভৃত্যবর্গের নিষ্ঠুর আমোদে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য, সত্য সত্যই সুশীলাকে কিঞ্চিৎ ভৎর্সনা করিল। পাখীর পায়ের বাঁধন তখনই খোলা হইল, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টার বহুক্ষণব্যাপী টানাটানির ফলে পা-টা কিছু আহত হইয়া গিয়াছিল, বেচারী উড়িতে গিয়া পড়িয়া গেল। তাহার দুর্দ্দশায় অনুতপ্ত সুশীল তাড়াতাড়ি তাহাকে তুলিয়া সকাতরে বলিল, "একে এখন ধামা চাপা দিয়ে রাখি দিদি, পায়ে আইডিন্ লাগিয়ে দেব, ব্যথা সারলে কাল পরশুর মধ্যে উড়িয়ে দেব এখন, কি বল?"

ক্ষুণ্ণভাবে নমিতা বলিল "অগত্যা, কিন্তু আইডিন্ লাগান'র কাজটা না করাই সব চেয়ে ভাল ছিল, হিঃ অমন করে কি কষ্ট দিতে আছে?"—ভাইটীর বিষণ্ণ-মলিন মুখের পানে চাহিয়া নমিতা থামিল, আর বেশী বলা অনুচিত।—প্রসঙ্গটা ফিরাইয়া লইয়া সস্নেহে বলিল "বাড়ীর ভেতর আয়।"

উভয়ে বাড়ীর মধ্যে চলিল, চলিতে চলিতে নমিতা বলিল "হ্যাঁরে, বিমল কি আমায় খুঁজতে হাঁসপাতালে গেছে?"

সুশীল মাথা নাড়িয়া বলিল "না, ছাঁস-পাতাল থেকে তুমি যে কাল মিস্ স্মিথের সঙ্গে 'কলে' গেছ, সে কথাত কাল রাত্রেই তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার বলে গেছে, তবে…"

বাধা দিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত নমিতা বলিল "তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার? কই আমার সঙ্গেতো তাঁর দেখা হয়নি, আসিতো সর্দ্দার মেথরকে বাড়ীতে খবর দিতে বলে গেছলুম।"

সুশীল বলিল "সর্দ্দার মেথরই আসছিল, কিন্তু সে বুড়া মানুষ, আহা কষ্ট করে আবার এতটা পথ আসবে?—তাই তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার তাকে ফিরিয়ে দিয়ে নিজেই এসে বলে গেল, ও-লোকটি খুব ভালমানুষ কিনা?"

পরিহাসের স্বরে নমিতা বলিল "সত্যি নাকি? লোকটি তাহলে তোমার মত নয়?"

সোৎসাহে ঘাড় নাড়িয়া সুশীল বলিল "নাঃ, মোটেই না, ও-লোকটি বেশ ভাল লোক,—ও এসে কাল কাকে ডাক্‌লে জান? আমাকে! —আমাকেই চেনে কি না! তারপর মেজ্‌দা বেরিয়ে যেতে সব বল্‌লে; আজ আমরা এত-ক্ষণ তোমার জন্যে অপেক্ষা কর্‌লুম, মা ভাব-ছিলেন কি না—তাই মেজ্‌দা মিস্ স্মিথের কুঠীতে তোমার খবর আন্‌তে গেল।

উভয়ে আসিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল; সম্মুখে রৌদ্রালোক-ঝলসিত, কর্‌কর্‌ে পরিষ্কার মাটীর উঠান, উঠানের ও-পাশে টালির ছাদ-যুক্ত বারেন্দা ও সারি সারি কয়খানি একতলা ঘর, বামদিকে কূপযুক্ত প্রাচীর-ঘেরা স্নানাগার। অন্য দিকে খড়ের ছাওয়া রান্নাঘর; তাহার পাশে সুশীলের সযত্ন-পালিত ছাগলের একটি ক্ষুদ্র চালাঘর। চালাঘরের খোয়া-পিটান মেঝের উপর বসিয়া ছাগমাতা দুইটি সদ্যোজাত শাবক লইয়া,—টাট্‌কা ডাল-ভাঙ্গা কতকগুলা পাতা ঘন ঘন চোয়াল নাড়িয়া সাগ্রহে চর্ব্বণ করিতেছিল। বৎস দুইটি ইতস্ততঃ লাফাইয়া খেলা করিতেছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

কাঙ্গালী।

আশা-পথ তব চাহিয়া
ভগ্ন মন প্রাণ　　কত দিন আর,
রাখিবে এমন বাঁধিয়া?
যতই আমারে রাখনা ভুলায়ে
দেখাইয়ে প্রলোভন,
তত হায়! মোর কেঁদে উঠে হিয়া
প্রবোধ মানে না মন।

নাহি ঠাঁই কিগো চরণে?
এ জীবন কিগো　　লক্ষ্য-হারা-প্রায়,
ভাসিবে এমন ভুবনে?
রূপ-গুণ হীন হয়েও ধুতুরা
শিব-পদে পায় ঠাঁই,
হয়েও নগণ্য আমিও তেমতি
শুধু যে চরণ চাই।

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

পেশীমণ্ডল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বালকেরা কি ভাবে দণ্ডায়মান হয়, তৎপ্রতি পিতা মাতা এবং শিক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি থাকা উচিত। যদি বাল্যকালে বালকেরা বোকা শিক্ষা করে, তবে বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চয়ই তাহারা বক্র হইয়া পড়িবে। পৃষ্ঠের পেশী-নিচয়ের যাহাতে রীতিমত ব্যায়াম হয় তাহা করিতে হইবে, কারণ তাহারা রীতিমত বিস্তৃত হইলে বালকেরা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে। এইরূপে তাহাদিগের স্কন্ধদ্বয় পশ্চাদ্ভাগে রহিয়া যাইবে এবং বক্ষঃস্থল বিস্তৃত হইবে। ইহার বিপরীতে যদি বালকদিগকে মস্তক এবং স্কন্ধ অবনত করিতে অভ্যস্ত করা হয়, তবে বক্ষঃস্থল ক্ষুদ্র এবং পৃষ্ঠদেশের পেশী-নিচয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এইরূপে যে বিরূপতার সৃষ্টি হইবে, তাহা বয়োবৃদ্ধির সহিত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

বালকদিগকে সোজা হইয়া উপবেশন করিতে শিক্ষা দিবে; কারণ যে ভাবে তাহারা উপবেশন করিবে, তাহা তাহাদিগের স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থতার সহায়তা করিবে। পাঠকালেই হউক বা কার্য্যকালেই হউক, তাহাদিগকে সোজা হইয়া উপবেশন করিতে হইবে, কারণ তদ্দ্বারা শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রের কোনরূপ ক্রিয়ার বাধা হয় না, সুতরাং লাবণ্য এবং গঠন-পারিপাট্য তাহার ফলস্বরূপ উদ্ভূত হয়।

বেঞ্চের বন্দোবস্ত এরূপ হওয়া উচিত যেন বালকগণ তাহাতে ঠেসান দিয়া বসিতে পারে। ঠেসান দিবার বন্দোবস্ত না থাকিলে বালকেরা প্রায়ই সম্মুখস্থ টেবিল বা ডেস্কের উপর কনুই রক্ষা করিয়া ঝুঁকিয়া উপবেশন করে। এক্ষণে যদি কাহারও মেরুদণ্ড বক্র হইবার উন্মুখতা থাকে, তবে তাহা বক্র হইবার ইহাপেক্ষা আর কি সুবিধা হইতে পারে। যদি কোন বালক বালিকা সোজা হইয়া না দাঁড়াইতে পারে, তবে তাহাকে বরং দণ্ডায়মান থাকিতে অথবা কোন বস্তুতে ঠেসান দিয়া বসিতে দেওয়া প্রশস্ত, কিন্তু তথাপি টেবিলে কনুই রাখিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া থাকিতে দিবে না।

স্কুলের সমস্ত বেঞ্চগুলিতে যে কেবলমাত্র ঠেসান দিবার বন্দোবস্ত থাকিবে তাহা নহে, পরন্তু ডেস্ক অথবা টেবিল এত উচ্চ হওয়া উচিত যেন বালকেরা সম্মুখে না ঝুঁকিয়া স্বীয় স্বীয় পুস্তক দেখিতে পারে।

স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, ব্যায়ামের পর বিশ্রাম আবশ্যক। পেশীর পক্ষেও সেই নিয়ম প্রযোজ্য। বিশ্রামের যে কিরূপ আবশ্যক তাহা কোন সভাতে যাইলেই বুঝিতে পারা যায়। শ্রোতৃবর্গ বক্তার বক্তৃতা শুনিবার জন্য উৎগ্রীব থাকে। তৎকালে তাহাদিগের পেশীনিচয় কার্য্যে পরিণত হয়, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অস্থিরতা দেখা যায়। বস্তুতঃ, বহুক্ষণ ধরিয়া মেরুদণ্ড উন্নত করিয়া থাকিলে পেশীনিচয় ক্লান্তি অনুভব করে এবং তজ্জন্য চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অধিকক্ষণ পেশীগুলিকে ক্রিয়াশীল রাখিলে তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং

ক্রমশঃ তাহাদিগের সঙ্কোচন শক্তি লোপ পায়। স্কুলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকেরা অল্পক্ষণ উপবেশন করিয়াই চঞ্চল হইয়া পড়ে, তাহা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। অতএব ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাদিগের একটু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। ঐ পরিবর্ত্তন হইলেই তাহাদিগের ক্লান্ত পেশী-নিচয় সবল হয় এবং মেরুদণ্ডকে পুনরায় উচ্চ করিয়া রাখিতে পারা যায়। বালকদিগকে অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত সোজা হইয়া বসাইয়া রাখা অত্যন্ত গর্হিত, কারণ ইহা দৈশিক-নিয়ম-বিরুদ্ধ। ইহাতে মেরুদণ্ডের বক্রতা সম্পাদিত হইয়া অধিকতর বিপদ্ আনয়ন করে।

বিদ্যালয়ে যে বালকেরা টিফিনের ছুটি পায়, তাহা দৈশিক-ক্রিয়া-সম্বন্ধীয় নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। দৈশিক উত্তেজনার পর বিশ্রাম আবশ্যক, এই জন্যই বালকেরা টিফিনের ছুটি পায়। বালক যতই ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল হইবে বিশ্রামের ততই আবশ্যক হইবে। পেশীর সঙ্কোচন এবং বিতানের অনিবার্য্য ফল ক্লান্তি। এই হেতু কার্য্যের পরিবর্ত্তন করিলে অথবা ভিন্ন ভাবে উপবেশন করিলে ক্লান্ত পেশীগুলি বিশ্রাম লাভ করে এবং নূতন পেশীগুলি কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। এইরূপে পরিবর্ত্তন দ্বারা অধিক পরিশ্রম করিতে পারা যায়। পরিশ্রমের পরিবর্ত্তন বিশ্রামের ন্যায় হিতকর। এই নিয়মটী ভূয়োদর্শন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, পেশীগুলিও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের, তাহারা স্নায়ুবিশেষের অবস্থিতি এবং শক্তি অনুসারে ক্রিয়া করিয়া থাকে। যদিও পেশী-গুলি সঞ্চালন-ক্রিয়ার জন্য সৃষ্ট তথাপি তাহারা স্বয়ং সঞ্চালিত হইতে পারে না। তাহারা ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক গতিবিষয়ক স্নায়ুমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মস্তিষ্কের ভিত্তি এবং মেরুদণ্ড হইতে শ্বেত সূত্রবৎ যে সকল স্নায়ু নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাদের সহিত পেশীর প্রত্যেক তন্তু সংযোজিত। 'অনৈচ্ছিক-শক্তি-সম্পন্ন স্নায়ু-মণ্ডলী পরিপাক, রক্ত সঞ্চরণ এবং শ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় পেশীনিচয়কে উত্তেজিত করে। ইহাদিগের উপর ইচ্ছার কোনরূপ প্রভাব দৃষ্ট হয় না। উক্ত ক্রিয়াগুলি আমাদিগের জীবনের প্রথম শ্বাস হইতে শেষ শ্বাস পর্য্যন্ত স্বতঃই হইয়া থাকে। আমরা নিদ্রিতই থাকি বা জাগরিতই থাকি, আমরা জ্ঞাত থাকি আর অজ্ঞাতই থাকি, ক্রিয়াগুলি নিশ্চয়ই হইবে; ইচ্ছাশক্তি তাহার বাধা সম্পাদনে সমর্থ হইবে না।

ঐচ্ছিক-গতি-বিধায়ক স্নায়ুমণ্ডলী মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং তাহারা ইচ্ছার অধীন। তাহারা কেবল মাত্র ইচ্ছার আদেশ বহন করিয়া পেশীনিচয়ের নিকট লইয়া আইসে মাত্র, সুতরাং তাহারা সংবাদ-যন্ত্র বই আর কিছুই নহে। মন কিছু করিতে ইচ্ছা করিলে ঐচ্ছিক স্নায়ুমণ্ডলী মস্তিষ্ক হইতে শক্তি বহন করে এবং তাড়িতের ন্যায় দ্রুতবেগে উপযুক্ত পেশীনিচয়ে সংবাদ দেয়; অমনি পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে। এইরূপে যখন আমরা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, তখন মস্তিষ্ক ঐচ্ছিক স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে জিহ্বা, কণ্ঠ এবং ওষ্ঠের পেশীনিচয়ে শক্তি প্রেরণ করে, তখন তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া আবশ্যকীয় শব্দ উৎপন্ন করে।

মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড এবং স্নায়ুনিচয়ের যেরূপ স্বাস্থ্য, তৎপরতা, আকার এবং গুণ হইবে, তদনুরূপ পৈশিক ক্রিয়ারও ব্যতিক্রম ঘটিবে। মস্তিষ্ক সুস্থ থাকিলে যেরূপ প্রবল বেগে পেশীনিচয়কে কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারে, রুগ্ন হইলে সেরূপ করিতে পারে না তাহার প্রমাণ আমরা, মোহক জ্বর, মস্তিষ্ক-প্রদাহ, সংন্যাস রোগ এবং মদ্যপানে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হইলে পেশী-নিচয়ের ক্রিয়াও স্থগিত হইয়া যায়। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, স্নায়ুমণ্ডলী পেশীনিচয়ের উপর কিরূপ আধিপত্য করে। যে সকল কলেরুকা মজ্জা বা স্নায়ু পেশীনিচয়ের সহিত সম্বন্ধীভূত আছে, তাহাদিগের যদি ধ্বংস সম্পাদন করা যায়, তবে তাহাদিগের সঙ্কোচন শক্তি এবং চৈতন্য-শক্তির লোপ হইবে। কোন স্থানের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর যদি চাপ পড়ে, তবে তাহার ক্রিয়া এবং আনুভাবিক শক্তিও লোপ পায়। এই তথ্যটী আমরা কঠিন বেঞ্চের উপর অধিকক্ষণ উপবেশন করিলেই বিশেষ রূপে বুঝিতে পারি। এইরূপ উপবেশনের ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, স্নায়ুনিচয়ের উপর চাপ পড়িয়াই আমাদিগের নিম্নাঙ্গ অসাড় হইয়া আইসে এবং তাহার ক্রিয়া শক্তিরও হ্রাস হয়। পাদদেশ-প্রসারিত কটিস্নায়ুর উপর চাপ পড়িলেই এই ফল ফলিয়া থাকে।

সচরাচর একই আকারের লোকের পৈশিক শক্তি এবং কার্য্যতৎপরতার প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। পৈশিক তন্তুগুলির আকার, বুনন এবং ঘনত্ব যেরূপ হইবে, মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-নিচয়ের কার্য্যকারিত্বও তদ্রূপ হইবে। ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়ার পেশীনিচয়ের ঘনত্ব এবং বুননের সহিত যেতো ঘোড়ার পেশীগুলির তারতম্য করিলেই উভয়ের পার্থক্য বিশেষ-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। এই জন্য যে সকল ব্যক্তিনিচয়ের পেশী পাতলা অথচ ঘন এবং মস্তিষ্ক ও স্নায়ুনিচয় তৎপর, তাহারা যেরূপ ক্ষিপ্রতা এবং শক্তির সহিত কার্য্য করিতে পারিবে, সেরূপ পুরু অথচ ঢিলা পেশী-যুক্ত ব্যক্তি অনুরূপ আকৃতির হইলেও করিতে পারিবে না। লোকের যদি পেশী ক্ষুদ্র এবং স্নায়ু সুবৃহৎ ও কর্ম্মী হয়, তবে সে বিপুল পৈশিক শক্তি দেখাইতে সমর্থ হইবে বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক যদি রুগ্ন থাকে, তবে অধিকক্ষণ ধরিয়া সে শক্তি থাকিবে না। শুদ্ধ বায়ুরোগ (হিষ্টিরিয়া) ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু লোকের যদি বিশাল পেশী এবং ক্ষুদ্র স্নায়ু-নিচয় থাকে, তবে সে অধিক শক্তির কার্য্য করিতে বা কর্ম্মে অধিক তৎপরতা দেখাইতে পারিবে না বটে, কিন্তু তাহার সহিষ্ণুতা অধিক থাকাতে অধিকক্ষণ ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইবে। এতদ্দ্বারা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, গঠন দেখিয়া লোকের কর্ম্ম করিবার শক্তির উপলব্ধি হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সূক্ষ্ম, ঘন, পূর্ণ বিকশিত পেশীনিচয়, বিশাল স্নায়ুমণ্ডলী এবং সুস্থ ও তৎপর মস্তিষ্ক হইলেই মানবের শক্তি, কার্য্য-তৎপরতা এবং সহ্যগুণ জন্মিয়া থাকে।

শরীরের যদি পূর্ণ বিকাশ প্রার্থনীয় হয় তবে বালকদিগের উপরকার অঙ্গের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ইহা সকলেই অবগত আছে যে যাহার উপরকার অঙ্গ সোজা তাহারা অধিকক্ষণ দণ্ডায়মান হইতে, অধিক ভ্রমণ করিতে এবং অধিক পরিশ্রম করিতে

সক্ষম, কিন্তু যাহাদের উপরার্দ্ধ বক্র হইয়া পড়িয়াছে তাহারা উক্ত কার্য্যের উপযুক্ত নহে।

এই তথ্যটী পৈশিক নিয়মের অনুকূল এবং তাহারও দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ পেশীকে সঙ্কুচিত অবস্থায় ধারণ করিতে হইলে মস্তিষ্ক হইতে তাহাতে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। যত অল্প সংখ্যায় পেশী সঙ্কুচিত থাকিবে ততই স্নায়ুমণ্ডলীর শক্তি অল্প মাত্রায় ব্যয়িত হইবে এবং ততই অল্প ক্লান্তি অনুভূত হইবে। শরীরে উপরার্দ্ধ যদি উন্নত থাকে তবে তাহা দেহ ও মস্তক, মেরুদণ্ডের অস্থি ও উপাস্থিনিচয়ের উপর সমতা রক্ষা করিবে।

শরীর সম্মুখে সামান্য বক্র হইয়া পড়িলে মেরুদণ্ড-সংলগ্ন পশ্চাৎদিকের পেশী ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হইয়া শরীরকে খাড়া রাখে এবং পশ্চাৎদিকেও ঈষৎ বক্র করিয়া দেয়। কিন্তু যদি মেরুদণ্ডের সম্মুখস্থ পেশীনিচয় আকুঞ্চিত হয়, তবে সোট আর হইতে পার না। খাড়া শরীরে দেহটা পশ্চাৎ এবং সম্মুখে সামান্য দুলিতে থাকে। কিন্তু বক্র অবস্থায় মেরুদণ্ডের পশ্চাদ্ভাগের পেশীগুলি সঙ্কুচিত থাকায় দেহকে সম্মুখের দিকে পড়িতে দেয় না বটে কিন্তু তদ্দ্বারা পৃষ্ঠদেশীয় পেশীগুলি এবং স্নায়বিক শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। খাড়াভাবে এইগুলির উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে, কারণ দেহটীর সম্মুখ এবং পশ্চাতে সামান্য দোলন জন্য সঙ্কুচন এবং শিথিলতা পর্য্যায়ক্রমে আসিয়া তাহাদিগের স্বাস্থ্য সম্পাদন করে।

যখন পেশীর কোন অংশ কার্য্য করিতে থাকে এবং অন্যাংশের পেশীগুলি অপেক্ষাকৃত বিশ্রাম উপভোগ করিতে থাকে, তখন স্নায়ুমণ্ডলীর শক্তি তৎতৎ অংশে যাহা কার্য্য করিতেছে প্রধারিত হইবে, এবং তাহারা শীঘ্র ক্লান্ত হইবে না, কারণ স্নায়ুমণ্ডলীর ক্ষমতা অধিক সংখ্যায় পেশীতে বিতরিত থাকে। বার্ত্তালাপ, পাঠ, গান গাওয়া অথবা অন্য কোন পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হইলে তদ্বিষয়ে চেষ্টা তখনই অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে যখনই দেহ ও মস্তক উন্নতভাবে থাকিবে।

উপবেশনেও উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য। কোন ব্যক্তিকে ঝুঁকিয়া বসিতে দাও, দেখিবে যে তাহার পৃষ্ঠদেশীয় পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া শীঘ্রই স্নায়ুমণ্ডলীকে ক্লান্ত করিয়া ফেলিবে কিন্তু খাড়াভাবে থাকিলে সে তত শীঘ্র ক্লান্তি বোধ করিবে না।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

নবীন অতিথি।

ওগো! এসেছে আজিকে নবীন অতিথি,
তোমারি দুয়ার কাছে,
সেযে আনন মোহন বয়স নবীন,
সলাজে দাঁড়ায়ে আছে।
তারে, ডেকে নিয়ে এস করিয়া যতন,
ভাষা আর নাহি ফুটে,
হেরে, প্রথম অতিথি আর ত কখন,
বাহিরে আসেনি ছুটে।

আজ, শতধা বিচ্ছিন্ন হৃদয় লইয়া,
লয়ে আর ভাঙ্গা মন,
শুধু, তোমারে বলিতে হৃদয় বেদনা,
করিয়াছে আগমন।
তুমি, শুন, শুন, যদি পার প্রতিকার,
অথবা নাইবা পার,
তবু, সমবেদনায় অভিথির সনে,
ফেল বিন্দু অশ্রুধার।

আমাদের কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভিতরে একটা দেওয়ালগিরি জ্বলিতেছে, নীচে ফরাস বিছানা। আমার দেবর একটি তাকিয়ার উপর ঘাড় রাখিয়া চিৎপাৎ হইয়া শুইয়া আছেন, মুখে গড়গড়ার নল, পার্শ্বে একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক তাঁহার তাকিয়ার উপর কনুই রাখিয়া, তাঁহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কিসব বলিতেছিলেন, আমি যেখান হইতে শুনিলাম, তাহা এই :—

"এ তোমার অন্যায় বৈ কি"—

"আরে ভাই, তুমিও যেমন,—মরুক গে।"

"তার সর্ব্বনাশ করলে, এখন বল মরুক্ গে? তার মা বুড়ো মানুষ, আমার কাছে কেঁদে, আকুল। যা হয় একটা বিহিত কর, না হয় তোমার শালাকে বল। এযে তোমার অন্যায় কথা! তুমি তো খোকা নও। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়স হ'তে গেল—এখন যে এ প্রবৃত্তি হবে এতো স্বপ্নেও কেউ ভাবে না।

"ধিক্ তোমার জীবনে! এদিকে মাথায় সাড়ে চা'র ইঞ্চি টিকি, দীক্ষাও লওয়া হ'য়েছে, হাতে পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ, তার সঙ্গে একখানা কবচও আছে দেখ্‌ছি?"

"ওহে, টাকায় সব হয়। কৈ, তোমার তো এমন কার্ত্তিকের চেহারা—কত মজা ক'রেছ?"

"মা ব্রহ্মময়ী যেন একদিনের তরেও আমায় অমন কুমতি না দেন। তোমার সঙ্গে ছোট বেলায় বন্ধুত্ব,—নইলে তোমার মত লোকের সঙ্গে কথা বল্‌তেও প্রবৃত্তি হয় না। তুমি খুব পুণ্যশ্লোক—এখন এর একটা গতি কর।"

আমায় কে ধ'রে পায়? নামতো আর লেখা নেই। আমার নাম যদি করে, তবে জমীদারের সঙ্গে সড় ক'রে, তার মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গাঁয়ের বা'র ক'রে দেবো।

গলায় দড়ি জোটে না?

বালাই—ষাট!! এমন সকের প্রাণ—বলকি? খেটে খুটে দু-পয়সা রোজকার

ক'রছি—একটু ফুর্ত্তি কোরবনা? দেখনা, ইস্তলাগাৎ কতগুলি পয়সা গুণেছি—নইলে খেতো কি? তার বাপ কত টাকা রেখে গেছ্লো? শ্বশুরবাড়ীতে তো খেতে দেবার ভয়ে একবার খোঁজও করে না।

খুব বাহাদুরী ক'রেছ—এখনও একটু দৃষ্টি দেও। এমন কাজও মানুষে করে? ছি ছি—সহস্র ধিক্ !!

এমন সময় আমাদের চাকরাণী বাজার হইতে আসিতেছিল, আমায় দেখে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখছো—চল বাড়ীর মধ্যে চল।" ভিতরে যাইতে যাইতে তাহাকে ন্যাকার মত বলিলাম "একটা নূতন কে লোক এসেছে, তাই দেখ্ছিলুম।"—ওঁকে চেন না? উনি যে ও পাড়ার নন্দবাবু, পশ্চিমে চাকরী করেন, সে দিন ছুটী নিয়ে বাড়ী এসেছেন। উনি খুব লেখাপড়া জানেন। আগে আমাদের বাড়ী এসে কত গান বাজ্না ক'রতেন। ছোট বাবুর সঙ্গে খুব ভাব।"

আপনার ঘরে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। কি সর্ব্বনাশ! পুরুষ মানুষ!—তোমরা কি? এই পুরুষ মানুষকে যে বিয়ে করে তার সাত জন্মের অধর্ম্ম; পুরুষ মানুষের ছায়া মাড়ালেও পাপ, পুরুষ-মানুষের বাতাস গায়ে লাগিলেও দেহ অপবিত্র হয়,—কার পেটে কি আছে, বুকে কার বাবার সাধ্য? আমার জায়ের মত রূপসী খুব কমই চোখে পড়ে—কে ব'লবে এতগুলি ছেলে পিলে হয়েছে? আর ঠাকুরপো! তুমি নিজে ঐ হোদল্‌কুৎকু'তে, গায়ের ঘাম দোয়াতে পুরিয়া চিঠি লেখা যায়,—তুমি কি না আমার জা-কে বল "তার কি আছে?" যে পুরুষ মানুষের এই ধর্ম্ম, সেই পুরুষ মানুষের সঙ্গে কি না, মেজদি আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন! বড় হাঁড়াটা কেটে গিয়েছে!

মনে হইল এখনি গিয়ে আমার জায়ের কাছে সব বলি। যে ঠাকুরপোর এত গম্ভীর ভাব, এত জপতপ, এত লোক লোক্‌তো, তাঁর মুখে এই কথা? তাঁর কি না এই কাজ? মানুষটাকে তো আদৌ মন্দ বোধ হয় না। ক্রিয়াকর্ম্ম আছে, পূজা অর্চ্চনাও আছে, অতিথি সাধুদের দেওয়া থোয়াও আছে, তবে আবার এমন কুবুদ্ধি কেন? পুরুষ মানুষে কি এসব পাপ বলিয়া মনে করে না? কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলাম, আমার জাকে এসব কথা বলাটা ঠিক নয়। হয়তো তিনি অনেক দিন থেকেই এসব জানেন, আমি জানিয়াছি বলিলে আরো লজ্জা পাইবেন; আর নয়তো এ সব শুনিয়া ঝগড়া বাধাইয়া নিজেই মারা পড়িবেন। এখনি যদি ঠাকুরপো বলেন "নিকালো," তখন আর তাঁর অভিমান কোথায় থা'কবে? অনর্থক চিরদিন মনে অশান্তি ভোগ করিবেন,—এবং যদি জ্ঞানহীনা স্ত্রীলোক হয়েন, তবে স্বামীর উপর শ্রদ্ধা হারাইয়া মহাপাপগ্রস্তা হইবেন—আপনার মন কলুষিত করিবেন। তার চেয়ে, না জানেন সেই ভাল। কাহাকেও কিছু বলিলাম না।

৩

এ সব তো গেল পরের কথা। নিজের কথা এখনও বাকি আছে।—খুলিয়া না বলিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। আর অধিক দিন বাঁচিব না, সময়তো হইয়া আসিল,—এই বেলা বলিয়া রাখি।

পুরুষ মানুষ তো আজো চিনিলাম না।

কত দিনই বা আর সংসারে বাস করিলাম? কিন্তু যে কয়টি দিন বাস করিয়াছি, পুরুষ মানুষেই আমার হাড় জ্বালাইয়াছেন, বাবা হাড় জ্বালাইয়াছেন;—কেন তিনি মরিয়া গেলেন? কেন আমার রাত্রি দিন বাবার জন্য কান্না আসে? আমি আর কয়দিন বাঁচিব? একটা দিন থাকিয়া যাইতে পারিতেন না? মরিবার কি তাড়াতাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল? তারপর দাদা। দাদাই আমার পরম শত্রু—এমন শত্রু বুঝি আর নাই। আমার যে মরিয়াও সুখ হইবে না!—মরিয়া গেলে আর তো আমার সঙ্গে দাদার সম্বন্ধ থাকিবে না, দাদাকে ফেলিয়া যাইতে হইবে, দাদাকে আরতো দাদা বলিয়া ভাবিতে পারিব না। কি জানি? আচ্ছা, ভালবাসায় কি দাদা আর লোক পান নাই? নিজের বৌ আছে, তাঁর দিকে একবার ভাল করিয়া ফিরিয়াও চাহিতে শিখিলেন না। সংসারে কেবল চিনিয়া রাখিয়াছেন মেজদিদি আর সরলা। সরলা বলিয়া ডাকিতে গলা ভারী হইয়া আসিত, সরলার মুখের দিকে চাহিলে চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিত, সরলা হাতে করিয়া খাবার আনিয়া দিলে মুখে আহ্লাদ ধরিত না। তেমনি এখন টের পাইয়াছেন। এত লেখাপড়া শিখিয়া এটুকুও জ্ঞান হয় নাই যে, নিলজ্জজনকে আদর করিয়া ধরিতে গেলে নিজেও ডুবিতে হয়? এ হতভাগিনীকে যে স্নেহ করিতে যায়, তার চেয়ে অন্ধ কে? আর কি কাহারো দাদা নাই?—না আর কাহারো বোন থাকে না? যখন আমি নিজের হাতে দাদাকে প্রথম কলিকাতায় পত্র লিখিলাম, তাহার পর বাড়ী আসিয়া কত আহ্লাদ! সরলাকে কত আদর! সে চিঠি খানি আজো কাছে রাখা হয়েছিল। সরলা বিধবা হ'য়ে খাওয়া ত্যাগ করিল বলিয়া কিনা তাঁহারো খাবারদাবার তিক্ত লাগিতে আরম্ভ করিল,—প্রথম কয়দিন তো আহার ত্যাগই করিয়াছিলেন। এখন তেমনি টের পাইয়াছেন। দাদাকে সেই পর্য্যন্ত আর দেখি নাই—আমার দাদাকে। বেশ বাঁচিয়া আছি, খাইতেছি, পরিতেছি, ঘুমাইতেছি—আমার দাদাকেও দেখি নাই। পৃথিবীতে সবই সম্ভব। দাদা—আমার দাদা, কেমন করিয়া আছেন? কি জানি? আর এক শত্রু দাদাবাবু। শত্রু চারিদিকে। ভগ্নীপতি কি আর সোকের নাই? সেই এতটুকু বেলা থেকে কেবল কাঁধে পিঠে; কিসে সরলা লেখা পড়া শিখিবে, কিসে সরলা মানুষ হবে, কিসে কি হবে,—দুই স্ত্রীপুরুষে কেবল এই নিয়ে ব্যস্ত। আর এখন? এক দণ্ড কাছে না দেখিলে ব্যস্ত হইতে,—এখন? সরলাকে সঙ্গে না লইয়া গেলে তোমার গাড়ি খালি বোধ হইত,—বেড়াইতে যাইতে পারিতে না,—কিন্তু এখন? বিধবা হওয়া অবধি আমার দিকে আর যে চাহিতে পারিতে না।—তা আর চাহিতে হইবে না। বড় যে তখন বলিতে "সরলা! তোর বিয়ে হ'য়ে গেলে তুই যখন বরের কাছে থা'কবি, তখন আমি কেমন ক'রে থা'কবো? আমি মাসে মাসে গায়ে প'ড়ে গিয়ে তোর বাড়ী নিমন্ত্রণ খেয়ে আ'সবো—নহিলে যে আমি বাঁ'চবো না।" এখন একবার আমার বরের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাওনা এসে!—আমি তো বরের কাছে এসেছি।

এ ছাড়া মেজ দিদির শত্রুতা যার শত্রুতা

তো আছেই। কিন্তু স্ত্রীলোকের আর একটি শত্রু আছে,—মহাশত্রু। সে শত্রুর হাতে পড়িতে পারিলে, স্ত্রীলোকে আর সকল শত্রুকেই পরাস্ত করিতে পারে,—আর সকল শত্রুর হাত এড়াইতে পারে। শরীরে যদি কোনও স্থানে বড় যন্ত্রণাদায়ক পীড়া জন্মে, তবে সে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত অল্প যন্ত্রণাদায়ক পীড়াকে ভুলাইয়া দিতে পারে। বৃশ্চিক দংশন করিলে লোকে শত পিপীলিকা দংশনের জ্বালাও ভুলিয়া যায়।

সংসারে যত অত্যাচার আমরা সহ্য করি, তাহার মধ্যে ভালবাসার অত্যাচার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নহে কি? ভাবিয়া দেখ—বুঝিতে পারিবে। যে আপনা ভুলাইয়া দেয়, আমার আমিত্বটুকু পর্য্যন্ত কাড়িয়া লয়, তাহার অপেক্ষা অত্যাচারী কে? এখন বল দেখি, স্ত্রীলোকের সেই মহাশত্রু কে? এক দিনের পরিচয়ে যে তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, সব ভুলাইয়া দিতে পারে, এত দিনের এতগুলি স্নেহের বন্ধন যে একদিনে ছিন্ন করিতে পারে, এত দিনের আপনার জন-গুলিকে যে এক দিনে পর করিয়া দিতে পারে, একদিনের আলাপের পর যে তাহার অদর্শনের এক দণ্ডকে এক যুগ মনে করাইতে পারে, তাহার মত পরম শত্রু আর কেউ কি জগতে আছে? এই পরম শত্রুর হাতে পড়িতে হয় নাই বলিয়াই না আজ এতগুলি শত্রুর অত্যাচার আমাকে সহিতে হইতেছে? —নহিলে আজ আমার কিসের ভাবনা? তোমরা বলিবে "তুই কলঙ্কিনী,"—বল, আমার পাপ ক্ষয় হইবে।

নারী-হৃদয় স্বভাবত অমানিশার দিগন্তব্যাপী সুনীল-স্বচ্ছ-নভোমণ্ডল। কত নক্ষত্র ফুটিয়া আছে, ঝিক্‌মিক্ করিতেছে,—বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এরা কাহারা?—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, সঙ্গিনী, সই, মনের কথা, দেখন হাসি, গোলাপ ফুল, টকের আলু, এ, ও, সে,—যাহার যেমন থাকে। কিন্তু সেই হৃদয়াকাশে যে দিন হইতে পূর্ণ শশধর উদিত হয়, তখন আর কয়টি তারাকে দেখা যায়?—খুব নজর করিয়া না দেখিলে একটিকেও দেখা যায় না। বৃথা তাহার নারী জন্ম,—যাহার ভাগ্যে এই অনাবস্যার উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলিকে ম্লান করিবার সৌভাগ্য না হইয়াছে!

নারী-হৃদয়ের স্বচ্ছ সরোবরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্ম ফুটিয়া আছে,—অসংখ্য আসন,—কাহাকেও স্থানাভাবে বিমুখ হইয়া ফিরিতে হইবে না, কিন্তু তার মধ্যস্থলে যে পবিত্র শ্বেত-শতদলটী মুকুলিত হইয়া আছে,—তার উপরে কাহার আসন? মাত্র এক জনের;—সেই বক্ত-শ্বেত-শতদল কেবল এক জনের আগমনে প্রস্ফুটিত হইবে; যাহার কমল সেই ফুটাইবে, যাহার আসন সে আপনি বিছাইয়া লইবে।—তাহার পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র ভ্রমরেরও সাধ্য নাই তাহার পবিত্র কক্ষ উচ্ছিষ্ট করে, সেই শতদল পদ্মাসনে যাহার আসন তাহারও আর আসন নাই।—এক আসন; এক আকাশ একই শশধর, একদিন একই দিনমণি, এক দেহ একই প্রাণ, এক শক্তি একই শিব, এক মায়া একই ব্রহ্ম। জিজ্ঞাসা করি—শুধু বিবাহের মন্ত্র পড়িলে এই শ্বেতশতদল প্রস্ফুটিত হয় কি? তাহা হইলে অনায়াসে এই পৃথিবীকে স্বর্গ করা যাইত। আমি কলঙ্কিনী?—ইচ্ছা হয়,সহস্র মুখে বল।

(ক্রমশঃ) শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শিক্ষা ও সার্থকতা।

গৃহ-শিক্ষয়িত্রী চৌকীর উপর বসিয়া, কোলের উপর খোলা বই রাখিয়া ছাত্রীকে পাঠ বলিয়া দিতেছিলেন,—ছাত্রী চৌকীর উপর হাতের ভর রাখিয়া নতজানু হইয়া শুনিতেছিল;

শিক্ষয়িত্রী পড়াইতে ছিলেন, — "জীবে দয়াই মানব হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি

ছাত্রী তন্মুহূর্ত্তেই পড়া ছাড়িয়া,—তড়াক্ করিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল; শিক্ষয়িত্রী দেখিলেন, বাহিরের বারেন্দায় কাঠের উনানে গরম জল ফুটিতেছিল সেখানে—ছাত্রী সেই খানে গিয়া উনানের ভিতর হাত পুরিয়া, কি একটা জিনিস ক্ষিপ্র হস্তে তুলিয়া ফেলিল; শিক্ষয়িত্রী সবিস্ময়ে দেখিলেন,—সে একটা ছোট, কুণ্ডলাকার 'কেন্নো' কীট!

কেন্নোটা উনানের পাশ দিয়া চলিতে চলিতে সহসা, আগুনের তাতে ওটাইয়া—উনানের নীচে পড়িয়া গিয়াছিল, ছাত্রী ঠিক সময়ে তাহাকে না দেখিতে পাইলে সে আগুনে পুড়িয়া মরিত।

কেন্নোটাকে তুলিতে গিয়া ছাত্রীর হাতে আগুনের আঁচ লাগিয়া ফোস্কা হইয়া গেল; শিক্ষয়িত্রী বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তুমি ভারি ছট্‌ফটে, অত্যন্ত অমনোযোগী।

কেন্নোটা তখন শরীর পুনশ্চ প্রসারিত করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, ছাত্রী স্মিত দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিল "দেখুন আপনার কথায় আমি ঠিক মনোযোগ দিয়েছি, আপনি তো এখনই বল্লেন জীবে দয়া মানব হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি!"

শিক্ষয়িত্রী নীরব রহিলেন।

শিক্ষা শুধু মুখে আওড়াইয়া গেলে নিষ্ফল! তাহাকে মন দিয়া গ্রহণ করা ও কাজে খাটাইয়া তোলাই সার্থকতা!

উপযুক্ত শিষ্টাচার।

স্বর্গীয় পিতা হাতুড়ী পিটিয়া খাইলেও পুত্র এখন বি, এল, পাশ করিয়া উকীল হইয়াছেন, বার লাইব্রেরীতে তাঁহার গলার আওয়াজটা যত উচ্চে উঠে, তাঁহার পিতার লোহা পিটিবার শব্দ তত উচ্চে উঠিত না—বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ বলাবলি করিতেন;

আলোয়ান গায়ে, সৌখীন পম্প সু পায়ে চশমা চোখে উকীল বাবু বৈকালে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন; পথে একটী দোকানের পাশে দেশপূজ্য পণ্ডিত—বৃদ্ধ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় দাঁড়াইয়া,—দোকানের অধিকারী প্রৌঢ় কর্ম্মকার মহাশয়ের সহিত কথা কহিতেছিলেন, উকীল বাবু উদ্ধত তাচ্ছল্য-পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার কর্ম্মকারটীর পানে চাহিয়া, বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে সংক্ষিপ্ত নমস্কার করিয়া বলিলেন "ভাল আছেন তো!"

বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এক সময় তাঁহার শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার উদ্দেশে এ নমস্কার; কিন্তু প্রৌঢ় কর্ম্মকার যে এক সময় তাহার পিতার কর্ম্মের সহযোগী এবং

অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, সে স্মৃতি টুকু জাগিয়া উঠিবার ভয়ে তিনি তাহাকে সামান্য কোন রকম অভিবাদনও জ্ঞাপন করিলেন না ;

প্রৌঢ় কর্ম্মকারের যুবক পুত্র দোকানের এক পাশে হাপরের কাছে বসিয়া ঘোড়ার 'নাল' তৈয়ারী করিতেছিল ; সে পিতার বন্ধুপুত্রের ব্যবহারটী লক্ষ্য করিল, কিছু বলিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিল ;

প্রৌঢ় কর্ম্মকারের সসৌজন্য অনুরোধে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ও উকীল বাবু দোকানে উঠিলেন, উকীল বাবু স্বয়ং একখানা লোহার ঘোড়া চেয়ার টানিয়া কটাং করিয়া খুলিয়া সদম্ভে জাঁকিয়া বসিলেন,—আর বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বসিলেন,—পাশে যে বেঞ্চিতে দুই জন প্রতিবেশী ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন,—সেই-খানে।

অনেকক্ষণ নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিয়া সকলে উঠিলেন ; দোকানে উঠিবার পৈঠার উপর সকলে জুতা খুলিয়া আসিয়াছিলেন, কারণ সম্মুখে মেঝের উপর সতরঞ্চি পাতা ছিল।

সকলে উঠিলে প্রৌঢ় কর্ম্মকার স্বয়ং শশব্যস্তে আসিয়া সতরঞ্চি গুটাইয়া বিদ্যা-বিনোদ মহাশয়ের জুতা জোড়াটী হাতে করিয়া সরাইয়া দিলেন, চশমা চোখে উকীল বাবু সেটুকু লক্ষ করিলেন, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় জুতা পরিতে লাগিলেন, প্রতিবেশীদ্বয়ও নিজ নিজ জুতা লইয়া পরিতে লাগিল,—আর উকীল বাবু চেয়ার ছাড়িয়া গুটান সতরঞ্চির কাছে সরিয়া আসিয়া—নিজের জুতার আগমন অপেক্ষায় — যেন অন্যমনস্ক ভাবে, কথা কহিতে লাগিলেন।

বয়োজ্যেষ্ঠ কর্ম্মকার মহাশয়, তাঁহার সে আশার দৌড় আন্দাজ করিতে পারিলেন না, —জুতা সরাইলেন না। উকীল বাবু শেষে মুখ ফুটিয়া বলিলেন "ওহে জুতোটা সরিয়ে দাও।"

প্রৌঢ় কর্ম্মকার বিস্মিত দৃষ্টিতে উকীল বাবুর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন,—তিনি যে তাঁহার পিতার বয়সী !—মনোদ্যত বিদ্যা-বিনোদ মহাশয়ও ফিরিয়া দাঁড়াইয়া স্তব্ধ দৃষ্টিতে ছাত্রকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন,—যুবক লেখাপড়া শিখিয়াছে না ?

উকীল বাবুর কথা শুনিবামাত্র,—যুবক কর্ম্মকার হাতুড়ী হাতেই—হাপরের পাশ হইতে উঠিয়া পড়িল, ঘরের বাহিরে তাহার ছিন্ন মলিন পাদুকা জোড়াটী অনাদৃত ভাবে পড়িয়াছিল,—তাড়াতাড়ি সেইটা পায়ে দিয়া সে—সেই জুতা শুদ্ধ পায়েই উকীল বাবুর চক্‌চকে বার্নিশ করা দামী পম্প সু ঠেলিয়া—তাঁহার সম্মুখে সরাইয়া দিল।

প্রতিবেশীদ্বয়ের ওষ্ঠপ্রান্তে গোপন হাস্যের রেখা বিজলী-বেগে ফুটিয়া অন্তর্হিত হইল ; বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অবাক হইয়া কর্ম্মকার যুবকের আপাদ মস্তকে শুধু একবার স্নিগ্ধ দৃষ্টির পরশ বুলাইয়া লইলেন ;—আর স্তম্ভিত উকীল বাবু মুহূর্ত্তের জন্য কুণ্ঠাগত দৃষ্টিতে একবার সেই নিরীহ আকৃতির, হাতুড়ী-পেটা যুবকটীকে দেখিয়া—জুতা পরিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িলেন, একটী কথা কহিলেন না।

প্রৌঢ় কর্ম্মকারের বাক্‌শক্তি লোপ হইয়াছিল ! লোকগুলি সকলে দোকানের বাহিরে গেলে, তিনি ভর্ৎসনা-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে পুত্রের মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন "জানিস অভ্যাগত নারায়ণ ?"

পুত্র যুক্তকরে বিনীত ভাবে বলিল "জানি, কিন্তু তুমি আমায় মাপ কর বাবা,—ঐ ভদ্রলোকটী যে শিক্ষাগর্ব্বে মনুষ্যত্ব হারিয়েছেন, সেই টুকু তাঁর মনে পড়িয়ে দিয়েছি মাত্র,—তোমার কাছে নাকখৎ দিচ্ছি, —মাপ কর!—"

সংবাদ।

১। জনৈক মহাত্মা বোম্বেতে স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী হাঁসপাতাল নির্ম্মাণার্থ বোম্বাই কর্পোরেশনের হস্তে পাঁচ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

২। এইরূপ প্রকাশ যে, ভারত-রমণীগণ এখানকার নারী-বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস চ্যান্সেলর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হইবেন। প্রেসিডেণ্ট, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী, সমস্ত কলেজের প্রিন্সিপাল ও সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সাত জনকে লইয়া উক্ত নারীবিশ্ববিদ্যালয়ের এক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইবে।

৩। যখন ফ্রান্সের আমিয়েন সহর শত্রুহস্তে পতিত হয়, সেই সময় তথাকার কোন ফরাসী সন্ন্যাসিনী খুব সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এজন্য ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে উপাধি সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন।

৪। আগামী ডিসেম্বর মাসে বাঁকিপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দশম বার্ষিক অধিবেশন হইবে। তথাকার উৎসাহী সাহিত্যসেবী বাঙ্গালীগণ এখন হইতেই তাহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উক্ত সাহিত্য সম্মিলনীতে সাহিত্যানুরাগিণী মহিলাদের নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র বিভাগ রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। উক্ত বিভাগের পরিচালনার নিমিত্ত কোচবিহারের রাজমাতা শ্রীমতী সুনীতি দেবী অথবা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে সভানেত্রীর পদগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইবে স্থির হইয়াছে।

৫। এইরূপে প্রকাশ যে ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজ-প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ বৈদেশিক সেক্রেটরীর পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইবেন। ভারতে আসিবার পূর্ব্বেও লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।

৬। বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম তিন মাসে জাপান হইতে ৩৩ কোটী টাকার দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসরের প্রথম তিন মাস অপেক্ষা ১১ কোটী টাকার বেশী দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে।

---

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীমন্মথলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩১ নং আপ্টনি বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নত:।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬৩৭ সংখ্যা। | আষাঢ় ১৩২৩। জুলাই, ১৯১৬। | ১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

উঠানে রৌদ্রে বসিয়া নমিতার জননী পাথরের গোরার ক্রাসুন্দীর আচারে সরিষা-গুঁড়া মাখাইতেছিলেন; রোগে, শোকে মানুষটি যেন অকাল-বার্দ্ধক্যে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন, সমস্ত শরীরের মাংস শ্লথ ও কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু রং টুকু পাকা আমের মত টুক্ টুক্ করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গে যেন শান্ত সহিষ্ণুতার জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে, মানুষটিকে দেখিলেই সহসা মনে করুণা-মিশ্রিত ভক্তির উদয় হয়। মাথার চুলগুলি প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট কয়গাছি পাকিয়া শাদা হইয়া গিয়াছে। সুশীলের আপত্তিতে এই অনর্থক জঞ্জাল তিনি এখনও মাথায় বহিতেছেন, ছাঁটিয়া ফেলিতে পারেন নাই। সময় সময় চুলগুলা লইয়া অত্যন্ত বিরক্তি ধরিলেও ছেলে মেয়েদের দুঃখ এ দুর্ভোগ নীরবে সহ্য করিয়া পরিচ্ছদাদির মধ্যে শাদা থান ছাড়া আর কিছুই ব্যবহার করিতেন না। অঙ্গে কোন আভরণ নাই।

বারো বছরের সুন্দরী কিশোরী নমিতা পিঠের উপর সদ্যস্নাত কৃষ্ণ-চিক্কণ কেশরাশি এলাইয়া দিয়া আচারের জন্য হামান-দিস্তায় হলুদ কুটিতেছিল। নমিতার আকৃতি, গঠন ঠিক নমিতারই মত,—তবে বয়ো-গুণ-সিদ্ধ প্রকৃতির চপল-কৌতূহল-পরায়ণতা ও অস্থির-চঞ্চলা এখনও স্বভাবে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান, নমিতার সহিত তাহার পার্থক্য এইখানেই—আকাশ, পাতাল।

নমিতার পরিধানে একখানি সাড়ী ও

একটি সেমিজ, হাতে দুইখানি সোণার তে-তারের কণী, একছড়া সরু ছেলা-গোট-হার, কাণে দুইটি ফুল। ফুল দুইটি ও হার ছড়াটি পূর্ব্বে নমিতা ব্যবহার করিত, এখন অনাবশ্যক বোধে তাহা সমিতাকে দান করিয়াছে, নমিতার হাতে এখন শুধু তিন গাছি করিয়া সরু সোণার চুড়ি ছাড়া আর কিছুই নাই।

সমিতার পাশে বসিয়া তাহাদের পুরাতন দাসী কুশ্রি-রমণী লছমীর-মা তাহার চুল গুলা কুলাইয়া দিতেছিল; সমিতা একমনে হলুদ গুঁড়াইতেছিল,—নমিতার পদশব্দে তিন-জনেই মুখ ফিরাইয়া চাহিল; সঙ্গে সঙ্গে সুশীলকুমার চিৎকার শব্দে জানাইল "দিদি এসেছে মা"।

"মাতা আগমনশীলা কন্যার রৌদ্র-তাপ-রক্ত শুষ্ক ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া বেদনা-পীড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"কাল রাত্রে কিছু খাওয়া হয় নি বুঝি?"

"না, সেই সন্ধ্যে বেলায় চা খেয়ে বেরিয়ে-ছিলুম—" বলিতে বলিতে নমিতা আসিয়া উঠানে মাতার কাছে দাঁড়াইল, সহসা মাতার ক্লেশ-ব্যঞ্জক মুখভাব অবলোকন করিয়া অন্তে আত্ম-সম্বরণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "খেলে নিশ্চয়ই অসুখ করত, কাল সমস্ত রাত জাগ্‌তে হয়েছে। ভাগ্যে খাওয়ার আগে ডাকটা এসেছিল!"

মাতা কিন্তু এ কথায় বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করিলেন না, ধীরে একটি নিঃশ্বাস ফেলিলেন। লছমীর-মা বলিল "উঠে আয়, উঠে আয় দিদি, বড় রোদের তাত, ছায়ায় আয়"।

কাপড়ের আঁচলে মুখের ঘাম মুছিয়া নমিতা বলিল "মাও বড্ড ঘেমেছেন যে, রোদ থেকে উঠে চলুন।"

মাতা হাত ধুইয়া আসিয়া দালানে উঠিলেন, দেয়ালের গায়ে ঠেস্ দিয়া বসিয়া অল্প অল্প হাঁপাইতে লাগিলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে ইহাঁর হাঁপানির ব্যারাম ধরিয়াছে, সময় সময় ব্যাধির ঝোঁক খুবই বাড়িয়া উঠে; অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়েন, ব্যাধি-সংঘাতে তাঁহার শরীর দিনে দিনে বড়ই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, কাজের মানুষ, চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না, সংসারের দুই একটা কাজ যাহা করেন, তাহাতেই শ্রান্ত হইয়া পড়েন। লছমীর-মা অনেক দিনের পুরাণ লোক, দেখিয়া শুনিয়া সংসারের শৃঙ্খলা বিধানে তাহার বুদ্ধি বেশ পাকিয়াছে, সেই এখন গৃহিণী-পণা করে। ছেলেদের নিজে হাতে মানুষ করিয়াছিল বলিয়া যত না হউক,—লছমীর-মা নিজে লোকটা বেশ মানুষের মত মানুষ ছিল বলিয়া, ছেলে মেয়েরা তাহাকে বাধ্য হইয়া মানিয়া চলিত। অনেক দিন বাংলা দেশে বাস করার জন্য লছমীর-মার চাল চলন কথাবার্ত্তা সব বাংলা দেশের মত হইয়া গিয়াছে; কেবল স্বজাতীয় পরিচ্ছদ পরিধানের বিশেষত্ব-টুকু সে ছাড়ে নাই; তবে একথা শতবার স্বীকার্য্য যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় তাহার কোথাও ত্রুটি ছিল না।

মাতাকে বসিয়া হাঁপাইতে দেখিয়া নমিতা নিজের গায়ের জ্যাকেট ও মাথার 'ভেলের' আচ্ছাদন খুলিয়া মাতার কাছে,—একটু স্বতন্ত্র ভাবে আসিয়া উপবেশন করিল,—নিকটে একখানা তালপাতার পাখা পড়িয়াছিল, সেইটা

তুলিয়া জননীকে বাতাস করিতে এবং বিনা প্রশ্নে স্বয়ং ভূমিকা ফাঁদিয়া গত কল্য রাত্রের ঘটনাবলীর আদ্যোপান্ত বর্ণনা আরম্ভ করিল। সমিতা যখন শুনিল যে প্রসূতি তাহারই সমবয়স্কা ও দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় তাহারই সমকক্ষ একটি বালিকা মাত্র, এবং শিশুও একটি বারো-আনা দামের কাঁচের পুতুলের মত ক্ষুদ্র ও ক্ষীণাকার হইয়াছে,—তখন কৌতুক ও উদ্বেগের যুগপৎ সংঘাতে তাহার হামানদিস্তার শব্দ বন্ধ হইয়া আসিল, তৎক্ষণাৎ মনে মনে নিজের কোলে, বই শ্লেটের বোঝার পরিবর্ত্তে একটি কচি শিশুর আবির্ভাব কল্পনা করিয়া তাহার যেমনই অসহিষ্ণুতা বোধ হইল, তেমনই হাঁসি পাইল; মুখে কাপড় চাপা দিয়া অকারণ চপলতায় থক্ থক্ করিয়া খানিক হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ দিদি, ছেলেটিকে দেখে তার মা কি বলছে?"

নমিতা সহাস্যে বলিল "কি আর বলবে?"

সমবেদনা পূর্ণ কণ্ঠে সমিতা বলিল "আহা বেচারীর বোধ হয় খুব ভয় হয়েছে না?"

"ভয় কেন?"

আহা অতটুকু ছেলেকে কি করে বাঁচিয়ে রাখবে?

নমিতা একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, করুণ-বিষাদ-ছায়ায় সহসা তাহার মুখমণ্ডল ভরিয়া উঠিল, সে দৃষ্টি নত করিল, কোন কথা কহিল না—নীরবে পাখা ঘুরাইতে লাগিল।

গত কল্য এই ক্ষীণজীবী শিশুটিকে দেখিয়া অবধি ঠিক এইরূপ ধরণের অনেক প্রশ্নই তাহার মনে উদয় হইয়াছিল, কিন্তু নিষ্ফল তর্ক বুঝিয়া কোন কথা উত্থাপন করে নাই, আজ প্রাতঃকালে কথা প্রসঙ্গে মিস্ স্মিথ বালিকার অকাল-মাতৃত্ব সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলায়, প্রসূতির জননী যে উত্তর দান করেন, তাহাতে নমিতা স্তব্ধ স্তম্ভিত চমৎকৃত হইয়াছে, শুনিল———এই বালিকার বড় জা'য়ের খুব অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না,—সম্ভবতঃ সেই জন্যই সন্তান জন্মিতে কয়েক বৎসর দেরী হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার শাশুড়ি ঠাকুরাণী পুত্রের পুনশ্চ বিবাহ দেন, এই অজুহাতে যে তাঁহার পুত্র একশত টাকা মাহিনার চাকরী করে, এবং পৈতৃক জমী জমাও কয়েক বিঘা আছে, সুতরাং সন্তানব্যতীত এ সম্পত্তি ভোগ করিবে কে?—অতঃপর দুই পত্নীর গর্ভে যথাক্রমে ছয় কন্যা ও তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, ফলে সংসারে এমনই অনাটন ও অশান্তি বাড়িয়া উঠে যে, তাহার সংঘাতে গোষ্ঠী শুদ্ধ অস্থির; শেষে প্রথমা স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়া মরে, এবং অপর সকলের সুখ স্বস্তির সীমাও যত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল তাহা সহজানুমেয়। এখন ছেলেদের পড়া ও মেয়েদের বিবাহের তাড়ায় সেই একশত টাকার মাহিনাওয়ালা ভদ্র লোকটি রেলের লাইনে মাথা দেওয়া কর্ত্তব্য কি না তাহাই ভাবিতেছেন। সুতরাং এ হেন সংসারের বধূ হইয়া পূজনীয়া শাশুড়ি ঠাকুরাণীর খুসীর উপর যথাসম্ভব সত্বর যে সন্তানের জননী হওয়া একান্ত নিরাপদ ব্যাপার সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই, তাহাতে হউক সন্তানের শারীরিক মানসিক অপুষ্টতা, আর না থাকুক সে জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া——তাহার জন্য অপর্য্যাপ্ত দুঃখ আছে তো,

সেই যথেষ্ট,—চিন্তার প্রয়োজন নাই! যাহা কিছু চেষ্টা ও চিন্তা তাহা থাকুক অন্য বিষয়ের উপর———সকাল সকাল মাতা হওয়াটা চাই-ই।

নমিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া লক্ষ্মীর মা সাংসারিক বিষয়ের কথা পাড়িল; নমিতাও চিন্তা ছাড়িয়া মাতার সহিত পরামর্শ করিতে মনোনিবেশ করিল, তিন জনে কথা বার্ত্তা চলিতেছে, ইতিমধ্যে সুশীল পাখীটাকে কিছু চাল ও জলসহ চক্ষুর অন্তরালে কোন নিভৃত অংশে বিশ্রাম করিতে দিয়া আসিয়া—নমিতার পিঠে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল, এবং অদূরবর্ত্তিনী সমিতার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল "আচ্ছা ছোড়্‌দি বল দেখি চড়াই পাখী কোন 'মাউন' (Noun)? উত্তর দানে অনিচ্ছুক ছোড়্‌দি বলিল—"জানিনে যা"। "আচ্ছা বল দেখি কোন 'জেণ্ডার' (Gender.)" ——"তুই বল দেখি?" এবার ছোড়্‌দি সোৎসাহে পরীক্ষকের আসন গ্রহণ করিল, কারণ সুশীলকে এই প্রশ্নে ঠকান' টা খুব সহজ কি না?—চক্ষু দুইটা সাধ্যমত গম্ভীর্য্যে ভরাইয়া লইয়া পুনশ্চ বলিল "তুই যদি বলতে পারিস্——"

"আহা আমি যেন জানিনে—ওত নিউটার জেণ্ডার (Neuter-Gender)"।

সমিতা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হাসিয়া ফেলিল, তাহার পর অবজ্ঞা-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "হুঁ, মেজদা আমায় একজামিন করে বলে উনিও আমায় একজামিন কর্ব্বেন, দৌড় কত! —তবু যদি প্রাণায় জিনিসটা কি তা জান্‌তিস্!"—বিজয়-গর্ব্বদৃপ্ত সমিতার হাসান-দিতার শব্দ উৎসাহ-ভরে উচ্চে আরোহণ করিল।

সুশীলের মুখ ম্লান হইয়া গেল; ছোড়্‌দির শব্দ জ্ঞানের অভিজ্ঞতা পরীক্ষার স্পৃহাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিতের মত নিবৃত্ত হইল, সে নমিতাকে ঠেলা দিয়া বলিল "দিদি চান কর্‌বে চল।"

নমিতা কথা কহিতে কহিতে মুখ ফিরাইয়া বলিল "যাচ্ছি দাঁড়া—"

মাতা বলিলেন "চান্ করবি এখন বাবু আগে একটু জল খা—"

নমিতা বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে কি'এর টাকা কয়টি বাহির করিয়া মাতার সম্মুখে রাখিয়া বলিল "সারা রাত থাকতে হয়েছিল বলে বারটি টাকা দিয়েছে—আমি অবিশ্যি চাইনি কিছু, মিস্ স্মিথ-ই বলে দিলেন, ...রাক গৌরী পাঁড়ে আর শঙ্করের কাপড় এক যোড়া করে পাওনা হয়েছে. ভাব্‌ছিলুম মাইনের টাকা থেকেই দেব, তা টাকাটা যখন পাওয়া গেল তখন কেন বেচারাদের অনর্থক দেরী করে কষ্ট দেওয়া,—বিমলকে বলবেন আজই বৈকালে যেন কাপড় দু যোড়া ভাল দেখে এনে দেয়। আর বাকী টাকাটা খুচরো হাত-খরচের জন্যে রেখে দেবেন ..."

সেই সময় পাশের ঘরের দ্বারের দিকে দৃষ্টি পড়িল, নমিতা দেখিল ইতিমধ্যে কখন সেখানে গিয়া, সুশীল দুই হাতে জলের গ্লাস ধরিয়া হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া চক্ চক্ করিয়া জলপান করিতেছে,—সে যে ঠিক ইচ্ছার সহিত জলপান করিতেছে এমন বোধাইল না। নমিতা বিস্মিত হইয়া বলিল "ও কিরে চান করতে যাবি, এখন জল খাচ্ছিস কেন, তেষ্টা পেয়েছে?"

সুশীল গ্লাস হইতে মুখ তুলিল, বলিল "না

তেষ্টা পায়নি, মা বল্‌লেন কি না তাই—" সে আবার গ্লাসে চুমুক দিল।

তাহার কথা শুনিয়া সকলেই অবাক!—সমিতা খোস-মেজাজে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিল "ওরে মূর্খ, মা কি তোকে জল খেতে বল্লেন; দিদিকে বলেছিলেন, বুঝতে পারিসনি? তুই কি বলে খামকা অতখানি জল খেলি, ভারি বোকা!"

সুশীল অত্যন্ত দমিয়া গেল; কষ্টে সৃষ্টে এতখানি জল অনর্থক খাইয়াই তো সে ঠকিয়াছে, তাহার উপর নিজের বুদ্ধি-বৃত্তির সম্বন্ধে ছোড়দির নি-দারুণ অভিমত শুনিয়া ভারি ক্ষুণ্ণ হইল—হায় মাতৃ-আজ্ঞা পালনের পরিণাম এত শোচনীয়!—আস্তে আস্তে গ্লাসটি নামাইয়া রাখিয়া সুশীল আসিয়া নমিতার পাশে দাঁড়াইল, সান্ত্বনা-কোমলকণ্ঠে, হাসি মুখে নমিতা বলিল "ভাই চল্, তোকে আগে চান্ করিয়ে দিচ্ছি;—ওরে সেলুন, বারসোপ সাবানখানা কোথায় আছে?"

সেলুন ওরফে সমিতা উত্তর দিল "ও ঘরে তাকের ওপর আছে।"

মাতা বলিলেন, "এখনো কিছু খাস্‌নি, এতখানি বেলা হয়েছে, আজ আর নাইবা কাপড়ে সাবান দিলি—"

"না মা, জামা সেমিজ সব ঘামে ভিজে গেছে, সারা রাত পরেছিলুম—তা ছাড়া আঁতুড়ঘরের বিছানা মাদুরে বসেছি, ও একটু সাবান দিয়ে রগ্‌ড়ে নিই, আর সুশীলের কাপড়খানিও ধূলোয় অপরিষ্কার হয়েছে, ওতে একটু সাবান দিতে হবে।"

সমিতা ফোঁস করিয়া উঠিল, "হুঁ ওকে তো আর নিজে হাতে সাবান দিয়ে কাপড় পরিষ্কার কর্‌তে হয় না—তাই অত ধূলো ঘাঁটার 'বিত্তেব' বেড়েছে, ওকে দিন কতক নিজে হাতে আমাদের মত সাবান দিয়ে কাপড় কাচাও দেখি,—দেখ্‌বে ওর ধূলো ঘাঁটার ধুম একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে!"

সুশীল ক্ষোভ এবং অভিমানপূর্ণ দৃষ্টিতে সমিতার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না। নমিতা হাসিতে হাসিতে তাহাকে কাছে টানিয়া লইল। লছমীর-মা বলিল "নমিদিদি, কাপড়ে সাবান দিয়ে রেখে দাও, আমি এরপর কেচে দেব।"

নমিতা, মাথা নাড়িয়া বলিল "কোন দরকার নাই, আমি এখনি কেচে নেব, কতক্ষণ আর দেরী হবে,—" সে হাই তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিল। সহসা বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে চাপ পড়াতে বেদনা বোধ হইল, হাতটা নামাইয়া দেখিল আঙ্গুলে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছে, মনে পড়িল কাল সারা রাত্রি পাখা চালাইতে হইয়াছিল, ফোস্কাটি সেই সংঘর্ষণেই উদ্ভূত হইয়াছে!—কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ফোস্কাটা যে উঠিয়াছে তাহা সে এতক্ষণ মোটেই লক্ষ্য করে নাই, আঙ্গুলটা জ্বালা করিতেছিল তাহা মাঝে মাঝে টের পাইয়াছিল ঐ পর্য্যন্ত,—ফোস্কার কথা আদৌ আন্দাজ করে নাই!

নমিতা আঙ্গুলটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছে, দেখিয়া সুশীলও সেই দিকে চাহিল, সবিস্ময়ে বলিল "ওমা, দিদির হাতটা কি পুড়ে গেছে? ফোস্কা উঠেছে,"

নমিতা মৃদু হাসিয়া বলিল "না পুড়ে যাওয়ার জন্যে নয়, পাখার বাঁটের ঘেঁসে ফোস্কা উঠেছে,—আমারই বুদ্ধির ভুল, অনেক-ক্ষণ এক হাতে পাখা চালিয়েছিলুম যে!"

সমিতা বিরক্ত হইয়া বলিল "তাদের বাড়ীতে কি আর লোক ছিল না?—তুমি অতক্ষণ পাখা করলে কেন?"

নমিতা হাসিল, "ওরে কাজের সময় কি অত দুঃখ কষ্টের মাপ লোক মনে রাখ্‌লে চলে? কত কোক্‌ কাল্‌-শিরে হাতে, পায়ে গুঠ তার ঠিক কি! এদের এখানে দুজন হিন্দুস্থানি দাই ছিল,—কিন্তু তারা আগের দিন থেকে রাত জেগে একেবারে ঘুমে আধ-মরা হয়ে পড়েছিল, বুড়ো মানুষদের আর উঠিয়ে দুঃখ দিতে ইচ্ছে হোল না, নিজেই ছোট খাট কাজগুলো সব করলুম্‌,—যাক তুই সাবানখানা দিবি আয় দেখি..."

নমিতা উঠিয়া পড়িল।

(৪)

বৈকালের সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছিল; পড়ন্ত রৌদ্রের ঝাঁজে তখন চারিদিকে আগুন ছুটিতেছিল। বাতাস তাপ-ভারে অবসাদ-গ্রস্ত হইয়া মন্থর-গতিতে চলিতেছিল; সূর্য্য-তাপে ঝল্‌সিয়া পীতাভ-মূর্ত্তি, বৃক্ষ লতা এখন বেলা অবসানের স্নিগ্ধ ছায়ায়, শ্যামচ্ছটা মেলিয়া ক্লান্তি আবেশে স্তব্ধ হইয়াছিল। সন্ধ্যার তখনও দেরী আছে।

নমিতা দ্রুত পদে হাঁসপাতালের দিকে চলিয়াছিল; আজ সে অন্য দিনের মত মিস্‌ স্মিথের সঙ্গে আসিতে পারে নাই,—মিস্‌ স্মিথ কোথায় তখন কলে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। একা আসিতে হইতেছিল বলিয়া —নমিতা যথাসম্ভব শীঘ্র পথটুকু অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য-ই ব্যস্ত পদে চলিয়াছিল।

হাঁসপাতালের মোড় ফিরিয়া দেখিল—ফটকের সম্মুখে পথের উপর ব্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রমথবাবুর গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি বোধ হয় এইমাত্র কোন স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন,—এখনও হাঁসপাতালে ঢোকেন নাই, ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক লিচুওয়ালার সহিত লিচুর দর কসাকসি করিতেছেন। লিচুওয়ালা তাহার প্রকাণ্ড বাজরা-ভরা লিচু লইয়া ফটকের ধারে বসিয়াছিল, পথের ওপারে ডাক্তারের গাড়ী, এবং পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন স্বয়ং ডাক্তার। সেখানে আরও জন কয়েক লোক দাঁড়াইয়া ছিল, অবশ্য লিচুর আস্বাদ পরীক্ষার জন্য নহে, ক্রয় বিক্রয় দেখিবার জন্য।—নমিতা বুঝিল সিবিল সার্জ্জন বুড়া নরম্যান সাহেব তখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই।

নমিতার চরণ-গতি সংযত হইয়া আসিল। নতমুখে অনাবশ্যক আগ্রহে মাথার ভেলের আচ্ছাদন টানিয়া—সরাইয়া ঠিক করিয়া লইতে মনোযোগ দিল,—হাঁসপাতালের ফটক তাহার নিকট হইতে তখনও দুই রশি পথ দূরে, তথাপি সে খুব ধীরপদে চলিল; অভিপ্রায়, ফটকের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বে ডাক্তার বাবুর লিচুক্রয় পর্ব্বটা সমাধা হইয়া যাউক।

ডাক্তার প্রমথ বাবুর বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর; একহারা, খুব লম্বা, রং ফরসা; দাঁড়ি গোঁফ সযত্নে ক্ষৌর-নির্ম্মূলিত; মুখ চোখের আকার মন্দ নহে, তবে কপাল কিঞ্চিৎ নীচু এবং নাসিকার গঠন অত্যুগ্র-তীক্ষ্ণ বলিয়া কিছু বিসদৃশ দেখায়, মাথার সম্মুখ ভাগে ছোট খাট একটু টাক, তাহাও ত্রাস-মার্জ্জিত বিরল কেশের, মুমূর্ষু আকৃতির টেরিতে লক্ষিত এবং সচরাচর হ্যাটের আবরণে আত্ম-গোপন করিয়া থাকে। প্রমথ বাবুর চাল-

চলন ব্যক্তি-বিশেষের নিকট কেতা-দুরস্ত, তাচ্ছল্য ও দাম্ভিকতা-পূর্ণ হইলেও স্বভাবতঃ অন্যরূপ; কথাবার্ত্তা উচ্চারণের ভঙ্গী অতি দ্রুত এবং অস্পষ্ট। বন্ধুগণ বলিতেন প্রমথ মিত্রের কথা রুষের কশাক সৈন্যের শত্রু-আক্রমণের মত তীব্র হুড়াহুড়ির আস্ফালন মাত্র! —অর্থ বোঝা দুষ্কর, কিন্তু আওয়াজ শুনিলে ভয় হয়।

চলিতে চলিতে নমিতা দেখিল ওদিকের পথ হইতে একজন যুবতী বাঙ্গালী-দাসী দুগ্ধের পাত্র হাতে ও একটি শিশুকে কোলে লইয়া এই দিকে আসিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ডাক্তার বাবু এমন ভাবে মধ্য পথে দাঁড়াইয়াছেন যে, সে সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্য দিয়া স্বচ্ছন্দে আসা দুঃসাধ্য, কেননা, পথের অন্য পার্শে তাঁহার গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এবং মক্ষিকা-দংশনে বিরক্ত ঘোটকটি, অধীরভাবে পদচতুষ্টয় আস্ফালন সহ সঘন লাঙ্গুলান্দোলনে নৃত্য করিতেছে, রমণী ঘোড়ার পাশ ঘেঁসিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু পারিতেছে না, শঙ্কাবশতঃ বার বার পিছু হাটিয়া যাইতেছে। রমণীর মাথায়,—কপাল ঢাকা ঘোমটা, দৃষ্টি সঙ্কোচ নত, সে অসহায়ভাবে পিছু হটিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কোন-কথা বলিতে পারিতেছে না।

দণ্ডায়মান লোকগুলি মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রমণীর বিড়ম্বনা লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু কেহই সাহস করিয়া ডাক্তার বাবুকে সরিয়া দাঁড়াইবার কথা বলিতে পারিতেছে না; ডাক্তার বাবু বক্র-চকিত কটাক্ষে দুই চারি বার রমণীর দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাহাকে পথ দিবার কোন লক্ষণই দেখাইলেন না—দ্বিগুণ মনোযোগের সহিত ফলওয়ালার সহিত কথা কাটাকাটি করিতে লাগিলেন—"ইস্‌মে নেই দেওগে? কাঁহে নেই দেওগে?—কেৎনে কোড়ি? শও কেৎনে বোল?—ছ্যা' আনেমে তব্ কাঁহে নেই হোগা..." অনর্গল তিনি দ্রুত স্বরে বকিয়া যাইতেছেন।

নমিতার বড় অসহিষ্ণুতা বোধ হইল; সেখানে যতগুলি লোক দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা যে সকলেই মূর্খ বা ইতর শ্রেণীর লোক, এমন বুঝাইল না, একজন ভদ্রবেশধারী ব্যক্তিও সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—এইরূপ মনে হইল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য একজন একটু সরিয়া দাঁড়াইলে যে শিশু-ক্রোড়ে রমণীটি পথ পাইয়া বাঁচে, তাহাতে কাহারও দৃক্‌পাত নাই!—ধন্যবাদ এই লোকগুলির বুদ্ধিকে, আর নমস্কার ঐ শিক্ষিত ভদ্রসন্তান প্রমথ বাবুর কাণ্ড-জ্ঞানকে!—নমিতা ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া, দ্রুতপদে চলিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হাঁসপাতালের ফটকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া—দণ্ডায়মান লোকগুলির পাশ কাটাইয়া আসিয়া একটি লোক ডাক্তার বাবুর পাশে দাঁড়াইল, রমণীকে লক্ষ্য করিয়া বেশ শিষ্ট ভদ্রতা-পূর্ণ মুখে ডাক্তার বাবুকে সংক্ষেপে কি দুইটি কথা বলিল—বোধ হইল পথ ছাড়িয়া দিবার অনুরোধ।

ডাক্তার বাবু যেন বুঝিতে পারেন নাই, ঠিক এমনই ভাবে চাহিয়া' ভ্রূ-যুগল উগ্র কুঞ্চিত করিয়া তীব্র স্বরে বলিলেন "কি?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর এবং গ্রীবা উত্তোলনের উদ্ধত ভঙ্গীতে মনে হইল, তিনি এখনই

বুঝি তাহাকে ভড়াইয়া দিবেন, সে এমনই কোন অমার্জ্জনীয় গুস্তাখী করিয়াছে!—কিন্তু লোকটা তাহাতে কিছুমাত্র দমিল না, শুধু কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিয়া, পূর্ব্ব কথা পুনরুচ্চারণ করিল মাত্র, সে স্বরে সবিনয় নিবেদনের চিহ্নটা যত থাক না থাক—একটা শোভন-সঙ্গত গুরুত্বী ভাব বেশ পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল; কতকটা আদেশের ভঙ্গীতে!

নমিতা সন্তোষপূর্ণ দৃষ্টিতে লোকটার মুখ পানে চাহিয়া সহসা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল—লোকটা হাঁসপাতালের কম্পাউণ্ডার সুরসুন্দর তেওয়ারী!—বাঃ, এই মৃদু-কোমল প্রকৃতির লোকটার কর্ত্তব্য-জ্ঞান এমন নির্ভীক! আশ্চর্য্য বটে। এ লোকটি যে এমন অসঙ্কোচে কোন 'খাতির নদারতের' খাতির জমাইতে পারে, তাহা ইহাকে দেখিলে মনে হইত না!

সুরসুন্দরের কথায় এবার ডাক্তার আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, অপ্রসন্ন মুখে চঞ্চলচকিত নয়নে একবার রমণীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, যেন এতক্ষণ তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি কোন কিছুই জানিতেন না, এই তাহাকে দেখিলেন? তিনি একটু অবজ্ঞার সহিত-ই পিছন ফিরিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। রমণী সসঙ্কোচে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

সুরসুন্দর একটি কথা না বলিয়া তখনই ধীরে ধীরে হাঁসপাতালের ভিতর চলিয়া গেল; ডাক্তার বাবুও দর দামের সম্বন্ধে একটা হেস্ত নেস্ত ঠিক করিয়া—লিচুওয়ালাকে একজন কুলীর সহিত নিজের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন, তাহার পর নিকটস্থ ভদ্রলোকটির সহিত দুই চারিটি কথা কহিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া তিনি ফটকের মধ্যে ঢুকিতে উদ্যত হইতেছিলেন এমন সময় নিকট-সমাগতা নমিতার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই— একবার দাঁড়াইলেন, সৌজন্যের মর্য্যাদা বজায় রাখিতে গম্ভীর মুখে, মাথার হ্যাটটা ডান হাতে একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া পুনশ্চ সেটা পূর্ব্বের মত মাথায় বসাইলেন। নমিতা ত্রস্তসংক্ষিপ্ত নমস্কারে নিজের কর্ত্তব্য সমাধা করিল—কিন্তু ডাক্তারের শিষ্টাচারে তাহার অন্তরে একটা ঘৃণাব্যঞ্জক শ্লেষের কশাঘাত বাজিল.—ছিঃ, ইনিই কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আর একজন পথিক রমণীর প্রতি সেই অদ্ভুত শিষ্টাচার আচরণ করিয়াছেন না?—অথচ ইনিই নমিতার স্বদেশী, স্বজাতি,—অগ্রজের মাননীয় ব্যক্তি, ইঁহার এতদূর .....ধিক্, না না, ইনি মাত্র ওজন করিয়া নমিতার প্রতি যে সম্মানটুকু বিজ্ঞাপন করিলেন, তাহাই নমিতার প্রকৃত অপমান। পথের ঐ রমণীর প্রতি তিনি যে অবজ্ঞা-সূচক আচরণটি স্বচ্ছন্দ-চিত্তে সম্পাদন করিয়াছেন—সেইটুকুই ইঁহার আন্তরিক সৌজন্যের নির্ঘাৎ সত্য মূর্ত্তি!—হউক সে ইতর, দরিদ্র দাসী, না থাকুক তাহার শিক্ষা সভ্যতার কোন বর্ণজ্ঞান,—কিন্তু তাহা বলিয়া এই অভিজাত সম্প্রদায়ের শিক্ষা উদ্ধত প্রভুদের খুসীর উপর, যত্র তত্র অসুবিধা উৎপীড়ন ভোগের জন্য সে যে একান্তই বাধ্য, এ কথা তো কেহ বলিতে পারে না, তবে! চুলোয় যাউক এই নিষ্ফল চিন্তদাহ! ইঁহাদের খুসীর জয় জয়কার হউক!—নমিতা মাথা নোয়াইয়া ফটকের মধ্যে ঢুকিল; পাছে ডাক্তার বাবুর সহিত চলিতে হয় বলিয়া সে সম্মুখের পথে অগ্রসর

হইল না, ডানদিকে বাঁকিয়া বাগানের সরু কুটপাথ ধরিয়া ফিমেল ওয়ার্ডের দিকে চলিল। এ পথ দিয়া যাইলে একটু ঘুর হয় কিন্তু ;

নমিতাকে বাগানের পথ ধরিতে দেখিয়া ডাক্তারবাবু বোধ হয় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, কারণ নমিতা সঙ্গে আসিবে মনে করিয়া তিনি একটু আস্তে হাঁটিয়া চলিতেছিলেন ; নমিতা বাগানের পথে কয়েক পদ অগ্রসর হইলে, ডাক্তার বাবু দাঁড়াইলেন ও একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "ম্যাডাম, মিস্ স্মিথের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল ?"

নমিতা দাঁড়াইল, মুখ ফিরাইয়া, মাথা নাড়িয়া জানাইল 'না'।

ডাক্তার পুনশ্চ বলিলেন, "তিনি দূরে কোথায় একটা কলে গেছেন, আজ আমার ওপর ফিমেল ওয়ার্ডের চার্জ দিয়েছেন।"

নমিতাও পুনরায় মস্তকান্দোলনে জানাইল —'উত্তম'।

ডাক্তার জানিতেন নমিতা মিত্র স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী, যেখানে মস্তক-সঞ্চালনে কাজ চলে সেখানে জিহ্বা-সঞ্চালনে সে অনিচ্ছুক। গাম্ভীর্য্য বা অপ্রসন্নতার আড়ম্বর না থাকিলেও এই সুন্দরী তরুণীর স্বভাবের মধ্যে এমন একটা স্নিগ্ধ-সংযতভাব দৃঢ়রূপে বিদ্যমান ছিল, যাহাকে ঠেলিয়া ইহার সহিত ইচ্ছামত আলাপ জমাইতে একান্তই কুণ্ঠা বোধ হয়।

ডাক্তার আর কোন কথা না বলিয়া, ডানহাত পকেটে পুরিয়া বাম-হাতে ওভার কোটের বোতাম ঘুরাইতে ঘুরাইতে, গম্ভীর-মুখে, দম্ভলাঞ্ছিত পাদক্ষেপে—চলনের তালে তালে শিট্‌কান ঘাড় শুদ্ধ মাথাটা কাঁপাইয়া—সম্মুখের পথে অগ্রসর হইলেন। আর নমিতা নতশিরে ওষ্ঠের উপর তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া, অন্য-মনস্কভাবে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ফিমেল-ওয়ার্ডে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দ্বিতলের সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে শুনিল, পাশের ঘরে তাহার অন্যতম সহযোগি-শুশ্রূষা-কারিণী মিসেস্ দত্ত, ওরফে চপলা দত্ত মহোদয়া উগ্র-বিরক্তিতে কাহাকে ধমকাইতেছেন, "চুপ কর, চুপ কর, অত অ-ত্রাহি হ'লে গবর্ণমেণ্টের হাঁসপাতালে আসতে নেই, নিজের বাপের ভিটের বসে সেবা খেতে হয়।"

তিরস্কৃত ব্যক্তি ক্ষীণ-কাতরোক্তি-সহকারে গেঙ্‌রাইয়া গেঙ্‌রাইয়া উত্তর দিল, "আহা মা, তা' হলে কি তোমাদের দুঃখ দিতে আসি ? থাক্‌লে আজ আমার ঘোয়ান ঘোয়ান তিন ব্যাটা, আহ্—আল্লা !—" তাহার কণ্ঠস্বর বাষ্পাবেগে রুদ্ধ হইয়া গেল !

নমিতা মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর নিঃশব্দে একটা ব্যথিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীর-পদে সেই কক্ষের উদ্দেশে অগ্রসর হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

প্রফুল্লতা।

প্রফুল্ল প্রফুল্ল আজি সকলি প্রফুল্লময়,
প্রফুল্ল সরসে ওই প্রফুল্ল কুমুদচয়।
কুসুম হাসিছে আজি প্রফুল্লতা লয়ে কত,
বহিছে সমীর ওই আনন্দেতে অবিরত।
আনন্দে নাচিছে আজ পৃথিবীর সুখ বুক,
গাহিছে বিহঙ্গ ওই জাগায়ে অমৃত সুখ।
কি প্রফুল্ল দিনমণি সুনীল আকাশ মাঝ,
আপন আনন্দ যেন আপনি প্রকাশে আজ।
কি আনন্দ ভাসে হেরে শিশুর অধর পরে,
প্রফুল্ল গোলাপ যেন ফুটিয়া পড়িছে ঝরে।
আমার (ও) প্রফুল্ল আজি তপন হৃদয়খানি,
গাহিছে আনন্দ কত চির প্রফুল্লতা বাণী।

শ্রীমতী বিনোদিনী সেন গুপ্তা।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বন্ধনী বা ব্যাণ্ডেজ :—ইহা দ্বারা উষ্ণতার সৃষ্টি হইয়া থাকে, রোগী আরাম পায়, এবং আবশ্যক স্থানে বন্ধন এবং চাপ সম্পাদিত হইয়া থাকে। ব্যাণ্ডেজের জন্য নানারূপ বস্ত্র ব্যবহৃত হয়, যথা ফ্লানেল, ক্যালিকো, মস্‌লিন, চিক এবং ইণ্ডিয়া রবার। অঙ্গুলির জন্য ব্যাণ্ডেজ আবশ্যক হইলে তাহার প্রস্থ দেড় ইঞ্চ এবং শরীরের জন্য নয় ইঞ্চ হওয়া উচিত। লম্বায় ব্যাণ্ডেজ তিন হইতে ছয় গজ হইয়া থাকে। ব্যাণ্ডেজ রাখিতে হইলে গুটাইয়া রাখিতে হয় এবং বন্ধন করিতে হইলে নিম্ন হইতে উপরে বাঁধিতে হয়।

যদি হাতকে ঝুলাইয়া রাখিতে হয় তবে কনুই অপেক্ষা হাতটীকে উচ্চে রাখিতে হইবে নতুবা তাহাতে রক্ত জমিবার সম্ভাবনা। ঝুলনটী গলায় ঝুলাইতে হয়।

স্নান—নানা অভিপ্রায়ে স্নানের আবশ্যক হইয়া থাকে। ধৌত করিবার আশয়ে এবং লোমকূপ পরিচ্ছন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে স্নানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। শীতল জলে স্নান করিলে একটু পরিশ্রম আবশ্যক হয়, সুতরাং রোগী হয় স্বয়ং শরীর ঘর্ষণ করিবে নতুবা অন্য কাহার-দ্বারা ঘর্ষণ করাইবে। শীতল জলে স্নান করার অব্যবহিত-কাল পরে কিঞ্চিৎ ভোজন করা বিধেয়। শরীর সুস্থ থাকিলেও এরূপ করিবে; অসুস্থ অবস্থায় অন্যরূপ বিধি। উষ্ণ জলে স্নানের পর বিশ্রাম আবশ্যক। রোগী বালক হউক বা যুবকই হউক বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া একটু বিশ্রাম করিবে। তাহাকে ভোজনের জন্য অথবা জাগরিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে না। যাহাদিগের যক্ষ্মা-রোগ আছে তাহাদিগকে ৯৮ ডিগ্রির উষ্ণ জলে স্নান করাইবে না। বালক হইলে ৯৬ ডিগ্রির উষ্ণ জল যথেষ্ট।

৬০ হইতে ৭০ ডিগ্রির উষ্ণ জলে স্নানকে শীতল স্নান কহে।

পটি—যা যত বড় পটিও তত বড় হওয়া আবশ্যক। পটি উত্তম করিয়া কাটিয়া তাহাতে মলম লাগাইয়া ক্ষত স্থানে বসাইয়া দিবে। ন্যাকড়ার অপেক্ষা তুলার পটি উত্তম, কারণ ন্যাকড়ায় নূতন নূতন চর্ম্ম উৎঘাত হইয়া থাকে।

পিচকারী—কোষ্ঠকাঠিন্য হইলেই পিচকারী দেওয়ার আবশ্যক হয়। পিচকারী ব্যবহার করার পর তাহাকে শুষ্ক করিতে হইলে তাহার জল নির্গত করিয়া বাতাসে টাঙ্গাইয়া দিবে, বাক্সের মধ্যে রাখিবে না; কারণ তাহাতে পিচকারী কাটিয়া যাইতে পারে। পিচকারী ব্যবহার করিতে হইলে উষ্ণ বা ঈষদুষ্ণ জল, সাবানের ফেনার সহিত সংযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিবে। কোন কোন স্থলে শীতল জলের ব্যবহারও হইয়া থাকে। জলের পরিমাণ এক পাইণ্ট হইলে যথেষ্ট। পিচকারী ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে তাহার ভিতরের হাওয়া বাহির করিয়া দিবে, নতুবা রোগীর পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। পিচকারী দিতে হইলে রোগীকে বাম দিকে শয়ন করাইবে, পরে পিচকারী দিবে। কোন কোন স্থলে পিচকারী দ্বারা রোগীকে আহার দেওয়া হয়।

ফোমেণ্ট—ফোমেণ্ট করিতে হইলে উষ্ণজল এবং ফ্লানেলের আবশ্যক। আর্দ্র ফ্লানেলকে নিংড়াইবার জন্য এক টুকরা কাপড় চাই। ফোমেণ্টের সহিত উত্তেজক অথবা ব্যথা-নাশক ঔষধের ব্যবহার হইয়া থাকে। তার্পিন তৈল উত্তেজক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ত-বহা নাড়ীর উপর ইহা অতি শীঘ্র প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ফ্লানেলকে ফুটন্ত জল হইতে নিংড়াইয়া উঠাইয়া তাহাতে অর্দ্ধ আউন্স তার্পিন তৈল ছড়াইয়া দাও এবং আর একবার চাপন দিয়া সেই তৈলকে বিস্তার করিয়া লও; অনন্তর আবশ্যক স্থানে ব্যবহার কর।

লডেনাম এবং অহিফেন বৃক্ষের ফল বেদনা-নাশক। এক কোয়ার্ট জলে দুইটা অহিফেন ফল থেঁতো করিয়া ফেলিয়া দিয়া ফোমেণ্ট করিবে অথবা একড্রাম লডেনাম ফ্লানেলে দিয়া তার্পিন তৈলের ন্যায় নিংড়াইয়া ফোমেণ্ট করিবে। লডেনাম-ব্যবহারে অধিক মাত্রায় বেদনার উপশম হয়। অহিফেন ফল সুলভ।

এক ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া ফোমেণ্ট করিবে ও পরে স্থানটীকে আবৃত করিয়া দিবে। ১২ ঘণ্টা বা ২৪ ঘণ্টা অতীত না হইলে পুনরায় ফোমেণ্ট করা অবিধেয়।

কুলকুচার উপকরণ—থিমোল (thymol) এবং জল একত্র মিশ্রিত করিয়া কুলকুচা করিলে গলার ক্ষত আরোগ্য হয়। গলক্ষতে ফট্‌কিরি এবং উষ্ণজল অথবা Chlorate of potash এবং শীতল জল একত্র মিশ্রিত করিয়া গলা ধৌত করার বিধি আছে।

বরফ—বরফকে শীতল রাখিতে হইলে ফ্লানেল দ্বারা জড়াইয়া রাখা উচিত। বরফ-নিঃসৃত জল হইতে বরফকে রক্ষা করিতে হয়। একটা কোন পাত্রের মুখে দুইটা কাটি রাখিয়া অথবা একটা পাত্রের মুখে ফ্লানেল বাঁধিয়া তদুপরি বরফের টুকরা রাখিতে হয়। বরফ ভাঙ্গিতে হইলে একটি লৌহ গজাল দ্বারা বিদ্ধ করিলেই ইহা ভাঙ্গিয়া যায়। বরফ উত্তাপ হ্রাস-কারক। ইহার নিম্নে যদি কোন বস্তু দ্বারা উত্তাপের হ্রস্বতা সাধিত হয় তবে তাহা

লবণ এবং জল। লবণ ও জলদ্বারা পরিপূর্ণ পাত্রে খাদ্য রাখিলে খাদ্য শীতল হয়। শীতল জলে ন্যাকড়া সিক্ত করিয়া ছায়ায় রাখিলে অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আইস-ব্যাগ (Ice-bag)—Ice-bag এর প্রায় অর্দ্ধেক ভাগ বরফে পূর্ণ করিবে। বরফ গলিয়া যাইলে সেই জল ফেলিয়া দিয়া পুনরায় ব্যাগটীকে বরফ দ্বারা পূর্ণ করিবে। উত্তাপের বৃদ্ধি না হইলে পুনরায় বরফের ব্যাগ ব্যবহার করা অবিধেয়।

পটি—এক তৃতীয়াংশ অডিকলোন বা স্পিরিট এবং ¾ ভাগ জল একত্রে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে উহা উত্তম প্রলেপের কার্য্য করিয়া থাকে। একটা পাতলা পটি উক্ত প্রলেপে সিক্ত করিয়া কপালের উপর রাখিবে। প্রলেপের আর্দ্রতা নষ্ট হইলে কোন ফলোদয় হয় না বলিয়া পটিটীকে সর্ব্বদা আর্দ্র রাখিতে হইবে।

রাই সরিষার পলেস্তার—রাই সরিষা বাটিয়া কাপড়ে রাখিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিবে। ইহা দ্বারা চর্ম্ম দুর্ব্বল হইয়া যায় বলিয়া পলেস্তার বার বার রাখা অবিধেয়।

পুলটিস—উত্তাপ দিবার জন্য পুলটিসের প্রয়োজন। প্রত্যেক পুলটিস চার ঘণ্টার অধিক রাখা উচিত নহে। সাধারণতঃ তিন দিন ব্যাপিয়া পুলটিস রাখা যাইতে পারে। পূর্ব্ব ব্যবহৃত পুলটিসকে পুনরায় উষ্ণ করিয়া ব্যবহার করিবে না। মসিনার পুলটিস প্রশস্ত। কখনও কখনও উত্তেজনার জন্য মসিনার পুলটিসের সহিত রাই সরিষা বাটিয়া মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। এক পাইন্ট জলে বড় চামচের এক চামচ রাই সরিষা এবং যথেষ্ট মসিনা দিয়া গাঢ় করিয়া পুলটিস প্রস্তুত করণান্তর বক্ষে রাখা যাইতে পারে। এরূপ পুলটিস কখনও অধিকক্ষণ রাখিবে না; বয়স্কের জন্য অর্দ্ধ ঘণ্টা এবং বালকের জন্য দশ মিনিট কাল যথেষ্ট জানিবে। রাই সরিষার পুলটিস হইলে চর্ম্মের উপর এক খানা পাতলা কাপড় থাকা চাই। পুলটিস খুলিয়া ফেলিলে স্থানটীকে উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিবে, যেন শীতল বাতাস না লাগিতে পায়। যে স্থানে পুলটিস লাগাইবে তথায় তৈল মালিস করিয়া পুলটিস লাগাইলে মসিনা গাত্রে লাগিবে না।

স্পঞ্জ—স্পঞ্জ সর্ব্বদাই শুষ্ক ও পরিষ্কার রাখিবে। লবণাক্ত জলে স্পঞ্জ ধৌত করিলে তাহাতে শৈবাল জমিতে পায় না। যদি ক্ষত স্থানে স্পঞ্জ ব্যবহার করিতে হয়, তবে তাহাকে ফুটন্ত জলে ধৌত করণান্তর বিষনাশক দ্রব্যে যথা carbolic acid (কার্ব্বলিক য়্যাসিডে) নিমজ্জিত করিয়া উষ্ণ জল দ্বারা ধৌত করিয়া রাখিয়া দিবে।

উদ্ভিদ্‌গণের বায়ুমণ্ডল হইতে আহার-গ্রহণ।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে উদ্ভিদের অধিকাংশই জলীয় পদার্থ-দ্বারা গঠিত। বৃক্ষের পত্র দিয়া জল বাষ্পাকারে বহির্গত হইয়া যায়। যদিও এই ক্রিয়াটি মানব নেত্রের অগোচর, তথাপি পরীক্ষা দ্বারা আমরা এই তথ্যটি বিশেষরূপে জানিতে পারি। যদি

কোন উদ্ভিদকে আমরা বোতল দ্বারা আবৃত করি তবে অল্পক্ষণ পরেই দেখিতে পাই যে বোতলের অভ্যন্তরে আর্দ্রতা জন্মিয়াছে। বোতল দ্বারা আবৃত করিবার পূর্ব্বে তৈলাক্ত কাগজ বা তৈলাক্ত কাপড় দ্বারা বৃক্ষের তল-দেশটী ঢাকিয়া দিতে হইবে; তাহা হইলে বৃক্ষতলস্থিত মৃত্তিকা হইতে জলের বাষ্প বোতলের অঙ্গে লাগিতে পারিবে না। যদি পত্রের তলদেশ অণুবীক্ষণ বা বিপুল-দর্শক কাচ (magnifying glass) দ্বারা দেখা যায়, তবে দেখা যাইবে যে তাহাতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রগুলি দিয়া জল বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। উদ্ভিদ্‌গণ শিকড় দ্বারা মৃত্তিকা হইতে জল গ্রহণ করে এবং পত্র দ্বারা তাহা বাষ্পাকারে বহির্গত করিয়া দেয়। যতদিন গাছ জীবিত থাকে তত দিন এইরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে। এই প্রকারে উদ্ভিদগণ অনেক জল গ্রহণ করে।

পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে প্রতি-পাউণ্ড শুষ্ক পদার্থ ফলনের জন্য প্রায় ৩০০ পাউণ্ড জল উদ্ভিদ গ্রহণ করে, অর্থাৎ এক সহস্র পাউণ্ড শস্য, তাহার ফলন-কাল পর্য্যন্ত অন্ততঃ ৩০ টন জল লইয়া থাকে। এক একরের ১/৮ ভাগে এক হাজার পাউণ্ড শস্য ফলান যাইতে পারে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে এক একর জমির জন্য ৯০০ টন জলের আবশ্যক। এই জলটী জমির উপর ধারণ করিলে গভীর আট ইঞ্চ হইয়া থাকে। আমরা যে জলের কথা বলিলাম তাহার সহিত জমির ছিদ্র দ্বারা প্রস্থিত জলের কোন সম্বন্ধ নাই। অন্ততঃ পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ জল জমির অভ্যন্তর দিয়া নিঃসৃত হইয়া যায় সুতরাং শস্যের জন্য এক একর জমি অন্ততঃ ১৮০০ টন জল গ্রহণ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে জমির আর্দ্রতা রক্ষা করা কিরূপ আবশ্যক।

পক্ক ফলে ৮০ ভাগ এবং শুষ্ক পদার্থে ১০ ভাগ জলের অস্তিত্ব দেখা যায়। উদ্ভিদকে ওজন করিলে তাহা হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ৯০ ভাগ জল পাওয়া গিয়া থাকে। সুতরাং উদ্ভিদ-জীবনে যে জলের বিশেষ আবশ্যক তাহা সহজেই অনুমেয়।

উদ্ভিদগণ দ্রবাকারে আহার গ্রহণ করে। দ্রব না হইলে উদ্ভিদে আহার প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং উদ্ভিদের আহার দ্রব করিবার জন্যও জলের আবশ্যক। জল ভিন্ন উদ্ভিদের রসাল স্থানগুলিও কঠিন হয় না; সুতরাং তজ্জন্য জলের বিশেষ প্রয়োজন। এই তথ্যটী আমরা গ্রীষ্ম সমাগমে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে গ্রীষ্মকালের দিবাভাগে উদ্ভিদ্‌-গুলি ঈষৎ হেলিয়া পড়ে। তাহার কারণ এই যে, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে জমির রস শুষ্ক হয় ও পত্র-দ্বারা বাষ্পাকারে জল উড়িয়া যায়। জমি যখন ত্বরিত-গতিতে জল যোগাইতে পারে না তখনই বৃক্ষগুলি ঈষৎ অবনত হয়। উদ্ভিদের উষ্ণতার উপর যে জলের প্রভাব নাই একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। রাসায়নিক প্রক্রিয়া উদ্ভিদকোষে উষ্ণতা উৎপাদন করে। যদি উষ্ণতা অতিমাত্রায় হয় তবে কালতু উষ্ণতা বাষ্পীভূত হইয়া জল-কারে পত্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। মনুষ্য-শরীরেও অনুরূপ প্রথায় উষ্ণতা ঘর্ম্মাকারে পরিণত হয়। উদ্ভিদ্‌ জমি হইতে শিকড়-দ্বারা

যে আহার গ্রহণ করে অথবা পত্র-দ্বারা যে আহার শোষণ করে তাহা তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে আবশ্যকতানুযায়ী দ্রবাবস্থায় গমন করে। যে জমিতে জলের মাত্রা যত অধিক সে জমি ততই উর্ব্বর। যে সকল প্রক্রিয়া-দ্বারা জমিতে জলীয় অংশ অধিক মাত্রায় সঞ্চিত হয় তদ্বিষয়ে মানবের জ্ঞান থাকা উচিত এবং সেই সেই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে জমি যে উর্ব্বর হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

উদ্ভিদ্‌গণ কেবলমাত্র বায়ুমণ্ডল হইতে অক্সিজন গ্রহণ করে। বায়ুর ½ ভাগ অক্সিজন সুতরাং উদ্ভিদ্‌গণ কিয়ৎপরিমাণে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। উদ্ভিদ্‌গণ জীবগণের ন্যায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে। জীবন রাখিতে হইলে কোষগুলিতে অক্সিজনের সরবরাহ অনিবার্য্য। ইহা যেমন উদ্ভিদ্‌জীবনে প্রযোজ্য জীবগণের পক্ষেও তদনুরূপ। কোষের পদার্থ-নিচয়ের সহিত বায়ুমণ্ডলের অক্সিজন মিলিত হইয়া উষ্ণতার সৃষ্টি করিয়া থাকে। জীবদেহেও অনুরূপ প্রক্রিয়ায় উষ্ণতার উদ্ভব হয়। সঞ্জীবিত উদ্ভিদ্-কোষ হইতে যে উষ্ণতার উদ্ভব হয় তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা কোন গৃহে শস্য রক্ষা করিয়া তাহা আবৃত করিয়া দিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারি। গৃহ আবৃত হইলে তাপ-বিকীরণ হইতে পায় না, সুতরাং গৃহটী অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া উঠে। শস্য-কোষগুলি নিঃশ্বাস গ্রহণ করে বলিয়াই উষ্ণতা বাহির হইয়া যাইতে পারে না এবং উষ্ণতা ক্রমশঃ পুঞ্জীকৃত হইয়া গৃহটীকে অত্যন্ত উষ্ণ করে।

উদ্ভিদে যে সকল কঠিনাংশ আছে তন্মধ্যে অর্দ্ধভাগ কার্ব্বন দ্বারা গঠিত। বায়ুমণ্ডল-স্থিত কার্ব্বণিক এসিড হইতে উদ্ভিদ্ কার্ব্বণ প্রাপ্ত হয়। কার্ব্বনিক এসিড বর্ণহীন গ্যাস; ইহা কার্ব্বন ও অক্সিজন নামক দুইটী পদার্থে গঠিত। কয়লা জ্বালাইলে ইহা উদ্ভূত হইয়া থাকে। বায়ুমণ্ডলের সর্ব্বত্রই কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস বিদ্যমান আছে। আকাশের দশ সহস্র ভাগে কেবলমাত্র চারি ভাগ কার্ব্বণ দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ুমণ্ডলে কার্ব্বণের অংশ অতি অল্প হইলেও ইহা দ্বারা যে উদ্ভিদের এত কঠিনাংশ প্রস্তুত হয় ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। গ্যাসকে বিশ্লেষণ করিতে কাঁচা উদ্ভিদের বিলক্ষণ সামর্থ্য আছে; তাহারা কার্ব্বণ রক্ষা করে এবং অক্সিজন পরিত্যাগ করে। পত্র দ্বারাই এই ক্রিয়াটী হইয়া থাকে। উদ্ভিদে যে সবুজ বর্ণ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই কার্ব্বণকে আকৃষ্ট করে; সুতরাং যে সকল উদ্ভিদের পত্র সকল সবুজ বর্ণ তাহারাই কার্ব্বণিক এসিড গ্রহণ করিতে সক্ষম। বেঙের ছাতা এবং অন্যান্য উদ্ভিদ্ যাহাদিগের পত্রাদি সবুজ নহে তাহারা এরূপে কার্ব্বণ গ্রহণ করিতে পারে না, —জীবাণু পচিলেই তাহারা তাহা হইতে কার্ব্বণ গ্রহণ করে। সবুজ-বর্ণের উদ্ভিদ্‌গণ অন্য পক্ষে জলীয় অজৈবিক পদার্থ এবং বায়ুমণ্ডল হইতে আপনার খাদ্য আহরণ করে।

দিবাভাগেই উদ্ভিদ্‌গণ কার্ব্বণিক এসিডের বিশ্লেষণ এবং কার্ব্বণ গ্রহণ করিয়া থাকে। কার্ব্বণিক এসিডের কার্ব্বণ এবং অক্সিজনকে চূর্ণ করিবার জন্য উদ্ভিদের শক্তির আবশ্যক; সে শক্তি সূর্য্য-কিরণ প্রদান করিয়া থাকে। সূর্য্যরশ্মি যতই প্রখর হইবে কার্ব্বণও তত শীঘ্র বৃক্ষে লাগিয়া যাইবে। এই কারণ-প্রযুক্ত যে সকল উদ্ভিদ্ সূর্য্য-কিরণে অবস্থিত তাহারা

ছায়ান্বিত উদ্ভিদপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। সূর্য্যকিরণ ব্যতীত উদ্ভিদের কার্বণ ব্যবহার করিবার শক্তি থাকে না, সুতরাং রাত্রিকালে উদ্ভিদ্‌গণ কার্বণ গ্রহণ করে না। রাত্রিকালে অঙ্কুরোদ্গম হয় বটে, কিন্তু তাহার পল্লবাদি ফ্যাকাসে হইয়া থাকে এবং তাহার বৃদ্ধিও লক্ষিত হয় না। বীজে যত দিন আহার নিহিত থাকে তত দিনই উদ্ভিদ্ বর্দ্ধিত হয় কিন্তু তাহা জমি বা বায়ুমণ্ডলস্থিত আহার গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। এরূপে উৎপন্ন উদ্ভিদে বীজস্থিত কঠিনাংশ অপেক্ষা ন্যূন কঠিনাংশ বিদ্যমান থাকে ; —পরীক্ষা দ্বারা এই তথ্যটী স্থিরীকৃত হইয়াছে। আলোক-প্রাপ্ত হইলে পত্র দ্বারা উদ্ভিদ্‌গুলি বায়ুমণ্ডল হইতে কার্বণিক এসিড শোষণ করিয়া লয় এবং শিকড় দ্বারা গৃহীত জল ও ধাতবপদার্থের সহিত কার্বণকে মিশ্রিত করিয়া carbohydrate proteid প্রভৃতি স্বীয় পুষ্টির উপযোগী পদার্থ নিচয়কে প্রস্তুত করে।

বিশেষরূপে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে সবুজ বর্ণের উদ্ভিদ্‌গণ জমির কার্বণের উপর নির্ভর করে না—তাহারা বায়ুমণ্ডলের কার্ব্বণিক-এসিড হইতে কার্ব্বণ গ্রহণ করে। তাহারা কার্ব্বণকে কার্ব্বণিক-এসিড-গ্যাসাকার-ব্যতীত অন্য কোন আকারে গ্রহণ করিতে পারে না। বায়ুমণ্ডলে কার্বণিক-এসিডের অল্পতা-নিবন্ধন অনেকে আশঙ্কা করেন যে, কালে তাহা নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। জনসন নামক জনৈক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলেন যে পৃথিবীর উপরিভাগে প্রতি-একর স্থানের উপর ২৮ টন কার্বণিক-এসিড আছে এবং পৃথিবীর ¼ ভাগ জমি হওয়াতে বায়ুমণ্ডলে যে কার্বণিক এসিড দৃষ্ট হয় তাহা যথেষ্ট ;—শত শত বৎসর ব্যাপিয়া যদি কার্বণিক এসিডের নূতন সরবরাহ না হয় তথাপি তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইবে না। বস্তুতঃ নূতন গ্যাস প্রত্যহ এরূপ মাত্রায় জমিতেছে যে আকাশস্থিত কার্বণিক এসিড সকল সময়েই সমভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। যখনই কয়লা, কাষ্ঠ বা অন্য কোন পদার্থ জ্বালান হয় তখনই কার্বণিক এসিডের সৃষ্টি হইয়া বায়ুমণ্ডলে মিলিত হয়। জীবজন্তুও কার্বণের নিমিত্ত উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। তাহারা কার্বণিক-এসিড-গ্যাসাকারে যে গ্যাস নিঃশেষিত করে তাহা প্রশ্বাস দ্বারা বাহির করিয়া দেয়। এইরূপে উদ্ভিদ্‌গণ কার্বণ গ্রহণ করে এবং পুনরায় তাহা বায়ুমণ্ডলে প্রত্যর্পন করে।

পরীক্ষা-দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে বায়ুমণ্ডলে যে কার্বণ জন্মে তাহা উদ্ভিদের পক্ষে যথেষ্ট। উদ্ভিদ্‌গণ বিনামূল্যে কার্বণ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং জমিতে কার্বণ-সংযুক্ত খাদ দিবার কোন প্রয়োজন নাই—জমীর কার্বণ উদ্ভিদ্‌গণ গ্রহণ করে না। কার্বণ-সংযুক্ত খাদ কি প্রকারে উদ্ভিদের হিতকর হয় তাহা পরে বলা যাইবে।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

লীলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তাঁর বারান্দায় একখানি বেতাসনে বসিয়া তাঁর প্রিয় পোষাগুলির সেবা করিতেছিলেন। দুটি সুন্দর খাঁচায় দুটি কেনারা পাখী, দাঁড়ে একটি বৃহৎ কাকাতুয়া ও বাঁশের খাঁচায় একটি ময়না রহিয়াছে। তাঁহার একজন ভৃত্যকে তিনি বলিলেন, "গাড়ী পাঠিয়েছিস্ ত?" সে বাঙ্গালী চাকর, বলিল,—হাঁ মা গাড়ী গেছে।" এমন সময় একজন ভৃত্য একখানি কার্ড আনিয়া তাঁহার হাতে দিল, তাহাতে লেখা আছে—"সুপ্রকাশ রায়।"

তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন, "সেলাম দেও।" হাস্য-প্রফুল্ল-আননে সুপ্রকাশ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বলিলেন "তুমি? এখানে?"

সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিলেন "সে সব কথা পরে হবে। আমি কেন তা চাকররা থাক্ পরে বলিব।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। "এত দিন তুমি কোথায় ছিলে? কোন খবর পাইনি কেন?"

সুপ্রকাশ। জানেন্ ত মাকে নিয়ে দেশে দেশে বেড়াতে হয়েছে, তার পর কিছুতেই কিছু হল না। এমন দেশ নাই যেখানে বেড়াতে যাইনি, কিছুতেই রক্ষা হল না। ওয়ালটেয়ার, মসুরি, সিমলা সর্ব্বত্রই গেছি!

মিসেস ব্যানার্জ্জি। সে কথা থাক, প্রভাত-দের চেন? তারা এখানে নূতন জমিদারী কিনেছে এখানেই এবার তারা স্থায়ী হবে। তার ভাই সুব্রত এখানেই প্র্যাক্‌টিস করবে —কথা হচ্ছে"।

সুপ্রকাশ। "না আমি নিঃ বসুকে জানি না, তবে এখানে এসে নাম শুনেছি। সুব্রতকে সেদিন দেখ্‌লাম, আলাপ নাই।"

এতক্ষণে কেনারীকে স্নান করান শেষ হইল। অর্থাৎ তাহারা আপন-মনে তাহাদের পাত্রে ডুবিয়া ডুবিয়া পাখা ডুবাইয়া আনন্দে স্নান করিল। তাহাদের খাদ্য দিবার পর তাহাদিকে রৌদ্রে রাখা হইল। কাকাতুয়া ততক্ষণ আপন মনে চীৎকার করিতেছিল— "মালি! মালি! ফুল আন।" সে প্রথম হইতে "ফুল আন"—কথা শিখিয়াছে ও এই কথাই সে ক্রমাগত বলিতেছে। তাহাকে খাদ্য দিয়া তাহার খাদ্যের পাত্র সম্মুখে দাঁড়াইয়া পরিষ্কার করাইয়া তবে তিনি সুপ্রকাশের হাত ধরিয়া ড্রইংরুমে প্রবেশ করিলেন ও সুপ্রকাশকে বলিলেন, "তার পর।"

সুপ্রকাশ অতি মৃদু-কণ্ঠে গোপনে তাঁহাকে কয়েকটি কথা বলিলেন ও শেষে উচ্চ-কণ্ঠে বলিলেন, "এই পর্য্যন্ত থাক।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি (হাসিয়া)। "বেচারী সুব্রত।"

সুপ্রকাশ। "ও সব কথা থাক্। আপনাকে যা বলিলাম একটু মনে রাখিবেন।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। "আজ তুমি সকালে এখানেই খাও। বিকালেও আজ আমার

বাড়ীতে অনেকে আসবেন, তুমিও এসো। প্রভাত এবং সুব্রতও আস্‌বে, তাদের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব। নীলা খুব সুন্দর গান গায়; সে ত এখনই আসবে।

সুপ্রকাশ। এখনি, সকালেই আসবেন্?

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। গাড়ী আন্‌তে গেছে, এলো বলে। তোমার সঙ্গে কোথায় আলাপ হল?

সুপ্রকাশ। দু-তিন দিন দেখা হয়েছে, দু-চারটে কথা বলেচি; আলাপ কি করে হবে!

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। তোমার কি এখনও ঘুরে বেড়াবার মন? না এখানে থাক্‌বে?

গাড়ীর শব্দ শ্রুত হইল, সুপ্রকাশ উঠিয়া পরাক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন, মিসেস্ ব্যানার্জ্জি বারান্দায় উঠিয়া গেলেন।

সুপ্রকাশ দেখিলেন যে, নীলার সাজ-সজ্জা খুব সাধারণ হলেও বড় সুন্দর। তাঁহার সঙ্গে একটি ছোট ব্যাগ আনিয়াছেন এবং সারাদিন থাকিবেন বলিয়া আবশ্যক দ্রব্যাদিও আনিয়াছেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তাঁহাকে লইয়া 'ড্রইং রুমে' প্রবেশ করিলেন। সুপ্রকাশও হাস্যমুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়া নমস্কার করিলে নীলা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া গেল, মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইল। সে নমস্কার করিয়া বলিল, "আপ্‌নি এখানে?"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। এত দিন কেন এখানে আসে নাই, তাই জিজ্ঞাসা কর। অথচ ও যখন জন্মেছে তখন থেকে আমি ওকে জানি। এত দিন কটকে এসেছে তবু দেখা দেয়নি। আশ্চর্য্য ছেলে যা' হোক্। তোমরা একটু বসে গল্প কর, আমি দেখে আসি খাবার কত দেরী।

এই বলিয়া তিনি গৃহ ত্যাগ করিলে সুপ্রকাশ একখানি চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিলেন। নীলা আসন গ্রহণ করিলে, তিনিও দূরে একটি চেয়ারে বসিলেন। উভয়েই কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। সুপ্রকাশ কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। যাহাকে এত অল্প সময় দেখিয়াছেন, অথচ যে সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাহাকে প্রকাশ করিয়া কিছু বলিবার সামর্থ্য নাই। সে যেখানে থাকে সেখানে গিয়া সাক্ষাৎকার করিবার অধিকারও নাই। আর তাঁহাকে দরিদ্র জানিয়া কি রামলোচন-বাবু অগ্রসর হইতে দিবেন? এক দিকে ধনী সুব্রত, আর অন্য-দিকে দরিদ্র ভিখারী সুপ্রকাশ। একি অদৃষ্টের পরিহাস নয়? সুপ্রকাশ মুখ তুলিয়া দেখিলেন নীলা নতমুখে আছে। তিনি তাহাকে বলিলেন, "কটকে এসে আপ্‌নার কেমন লাগ্‌ছে? পশ্চিম থেকে উড়িষ্যা একেবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের মনে হয় না কি? আপ্‌নার কাছে সবই অপরিচিত?

নীলা মুখ তুলিয়া বিষাদের কণ্ঠে বলিল, "অপরিচিত বইকি, আমিত এখানকার কাহাকেও জানি না। মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সহিত মিসেস্ বসুর বাড়ীতে দেখা হল, তাতেই তিনি আজ আমায় আনিয়েছেন।"

সুপ্রকাশ। আপনার কাকা ও খুড়ীমাকে কি আপ্‌নি কখনো দেখেন নি?

নীলা। আমার বাবা ত এখানে কখনো আসেন নাই, সে-জন্য কাহাকেও দেখি নাই। আমার মাকে ব্রাহ্ম-মতে বিবাহ করার পর, তাঁর সমস্ত আত্মীয় তাঁর সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন।

সুপ্রকাশ। আপনি সেখানে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারে লালিত হয়েছেন, আর এখানে আপনার কাকার বাড়ীতে সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার, খুব কষ্ট পাচ্ছেন, বোধ হয়?

নীলা। না, তাতে আর কি হবে। জীবনের সকল দিন সমান যায় না। বাবার শেষ আদেশ, কাকার কাছে এসে থাকতে হবে; সেই কথা মনে করে আমার কষ্ট হয় না।

সুপ্রকাশ। সারাদিন্ কি করেন্?

নীলা। অমিয়কে পড়াই, দু-চারটে বই এনেছি পড়ি বা একটু সেলাই করি।

সুপ্রকাশ। বাজনা বাজান না? আপনার পিতার অমন সুকণ্ঠ, অত গান বাজনার সখ ছিল, আপনি নিশ্চয়ই খুব জানেন।

তাঁহারা এই প্রকার কথাবার্ত্তায় মগ্ন এমন সময় সহসা দ্বার খুলিয়া গেল। সুব্রত আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন,"মাসীমা! মাসীমা!" তার পর নীলাকে অপরিচিত ব্যক্তির সহিত বসিয়া কথা কহিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। সেই সময় অন্য দ্বার দিয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "এই যে সুব্রত। এস, তোমার সঙ্গে সুপ্রকাশের আলাপ করিয়ে দি। মিঃ সুব্রত বসু, আর মিঃ সুপ্রকাশ রায়—এইত বেশ ইংরাজি কায়দা হল।" তাঁহারা উভয়ে উভয়ের করমর্দ্দন করিয়া ইংরাজী ফ্যাসানেই আলাপ করিলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি উভয়কে দেখিয়া একটু হাসিলেন ও সুব্রতকে বলিলেন,"তারপর, কি মনে করে সুব্রত? মা কেমন আছেন? বিকালে আস্‌বেন্ ত?"

সুব্রত। সেই-জন্যইত এসিছি। মার শরীর ভাল নাই, সেজন্য আজ তিনি আস্‌তে পারবেন না। বৌদি, দাদা ও আমি আসব। তিনি মিস্ মিত্রকে আনাবার কথা বল্‌তে বলে পাঠিয়েছিলেন; তা মিস্ মিত্রত এখানেই আছেন গিয়ে বলব।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। নীলাকে আজ সকালেই এনেছি। নীলার সঙ্গেত একটুও কথা কইলে না।

সুব্রতের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল; সুপ্রকাশের দৃষ্টি তাঁহার আননে পতিত হইল। সুব্রত নীলাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "ভাল আছেন? আজ বৌদি বিকেলে আস্‌লে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।"

নীলা। তিনি কেমন আছেন? তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমি সুখী হব। আপনার মায়ের কি হয়েছে?

সুব্রত। বোধ হয় জ্বর হবে, মাথা খুব ধরেছে। (তার পর সুপ্রকাশের প্রতি) আপনি এখানে কতদিন এসেছেন? কোথায় আছেন?

সুপ্রকাশ। আমি অল্প দিনই হল এসেছি। মিঃ রায়ের জমীদারী দেখতে এসেছি, আর তাঁর বাড়ীখানা পোড়ো বাড়ী হয়ে আছে, তার সংস্কার করাতে এসেছি।

সুব্রত একটু উপেক্ষার সহিত বলিলেন, "ওঃ, মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সহিত এই প্রথম আলাপ?" সুপ্রকাশ একবার মিসেস্ ব্যানার্জ্জির প্রতি চাহিলেন, যেন চক্ষের দৃষ্টিতে কি বলিয়া দিলেন। তারপর সুব্রতের কথার উত্তরে বলিলেন— 'হাঁ, মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে অনেক দিন থেকে জানি। আমার মায়ের সঙ্গে ওঁর বহুদিনের আলাপ শুনেছিলাম।"

সুব্রত মিসেস্ ব্যানার্জ্জির প্রতি চাহিয়া

বলিলেন, 'সত্যি নাকি? কই আপনার কাছে কখনও ত এঁর কথা শুনি নাই।" মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সহিত সুব্রতদের বেশী দিনের আলাপ নয়। কটকে আসিয়াই পরিচয় হইয়া তাহা ঘনিষ্ঠতায় শেষ হইয়াছে।

সুব্রত সুপ্রকাশকে বলিলেন "আপনার নামও—রায়; আপনি জমীদার মিঃ রায়ের কি আত্মীয়?" সুপ্রকাশ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, —"আত্মীয় বটে, তবে দরিদ্র ও বেতন-ভোগী।"

সুব্রত সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নীলার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আপনার কাকা আজ আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। দাদা তাঁকে কয়েক-দিনের জন্য আপনাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। আমরা দুই ভাই কালই একবার কলকাতায় যাব।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। কেন, সেইখানেই প্র্যাক্‌টিস্ করবে বুঝি?

সুব্রত। সেই রকম ত মৎলব আছে, দেখি কি হয়। এখন তবে আসি মাসীমা। আবার বিকালে দেখা হবে।

সকলকে অভিবাদন করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি নীলাকে লইয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

সুপ্রকাশ উঠিয়া নিঃশব্দে বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সম্মুখেই মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সুদৃশ্য ফুলের বাগান। কয়েকটি সূর্য্যমুখী ফুল ফুটিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। নানা-বর্ণের রঙিণ ফুলে বাগান-খানি যেন সুরঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,'এখনও ফিরি। কেন নিজের জটিল অদৃষ্টের সহিত অন্যের অদৃষ্ট গ্রথিত করিব? আমার চেয়ে সুব্রত অনেক-বিষয়ে উপযুক্ত। সংসারে আত্মীয়-স্বজনে সে পূর্ণ—স্নেহময়ী জননী, স্নেহময় উপযুক্ত ভ্রাতা। আর আমি অভাগা, আমার সংসারে কে আছে? তার উপর জীবনে কলঙ্কের বোঝা। আমার আর এ-সব কেন? কিন্তু ফিরিতে কি পারিব? সূর্য্যমুখী সূর্য্যের দিকে চাহিয়াই ফুটিয়া উঠে। কেহ তাহাকে শেখায় নাই। তাহার স্বভাবই সূর্য্যের দিকে চেয়ে-থাকা। আমারও তাহাই হইয়াছে। এত দিন আমার অন্তরে প্রণয়-পুষ্প ফুটিয়া উঠে নাই; আজ প্রেমসূর্য্যা-লোকে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কে জানে ইহা ধূলায় দলিত হইবে, না কেহ সযত্নে তুলিয়া লইবে?

সুব্রত বিষণ্ণ-মনে গৃহে ফিরিয়া গিয়া জননীর সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন। তাঁহার জননী তখন বসিয়াছিলেন, শরীর সুস্থ ছিল না বলিয়া গৃহকার্য্যে অবসর লইয়াছেন। সুব্রত গিয়া মায়ের নিকট বসিয়া পড়িলেন ও ডাকিলেন, "মা।" মা সেই কণ্ঠস্বরে বুঝিলেন পুত্রের মনে কিছু দুঃখ হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেনরে? কি হয়েছে সুবো?"

সুব্রত। তুমি আজ মাসীমার বাড়ী যেতে বলেছিলে, গিয়েছিলাম। সেখানে নীলা রয়েছেন, আর কে একজন ভদ্রলোক—সুপ্রকাশ রায়—তিনি ছিলেন। তাঁরা দুজনে বসে ড্রইংরুমে গল্প কচ্ছিলেন, যেন কত দিনের ভাব। মাসীমা সেখানে ছিলেন না।

মা। সুপ্রকাশ রায় কে?

সুব্রত। মিঃ রায়ের কর্ম্মচারী, কোন দরিদ্র বেতনভোগী আত্মীয়।

মা। তোমার মাসীমাত জানেন যে, শীলার সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে; তা তিনি যার-তার সঙ্গে, আবার অমন ছোট-লোকের সঙ্গে শীলাকে মিশ্‌তে দেন কেন? শীলার কাকাকে আমি কথা দিয়েছি যে মেয়েটি দেখে পর্য্যন্ত আমাদের পছন্দ হয়েছে।

সুব্রত। মেয়ের যদি আমাদের পছন্দ না হয়?

মা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "সে আর আলাদনে, ঢের দেখেছি। এমন ঘর, এমন স্বামী—যদি মেয়ের পছন্দ না হয়, তাহলে আর কাকে হবে?"

সুব্রত। ঘরই বুঝি সব? তুমিত সব জান! আজ-কাল্‌কার মেয়েরা নিজের মন না হ'লে বুঝি বিয়ে কর্ব্বে? তা'ছাড়া, এ হিন্দুমতে বিবাহ নয়; শীলা সাবালিকা হয়েছে।

মা কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন, "আচ্ছা, আমি সব ঠিক করে নেব। যাতে কথা পাকাপাকি হয়, তা কর্ব্ব। তোমার যা কর্ব্বার, আমি যা ভাল বুঝবো কর্ব্বো।"

সুব্রত বিরক্ত-ভাবে বলিলেন, "তা বলে মাসীমার উচিত হচ্ছে না। আমি যখন চলে এলাম তখনো ত সেইখানেই ভদ্রলোকটি রইলেন। মাসীমাত তাকে দেখে গলে যাচ্ছেন।"

মা। মাসীমার পরিচিত, তা মাসিমা যত্ন না করে কি কর্ব্বেন? বেলা ত ও-বেলা যাবে, দেখে আসবে ব্যাপার কি। তুমি অত মুখচোরা কেন? নিজে ভাল করে আলাপ কর্ত্তে পার না?

সুব্রত। ঐটি বড় কঠিন। দেখি কি হয়? আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি যে এখানে না হলে, আমায় আর বিয়ের জন্ত অনুরোধ কোরো না।

হেমন্ত-প্রয়াণ।*

হেমন্ত! ভগিনি মোর! কবি বাঙ্গালার!
আশৈশব এক সুরে বাঁধি' হৃদি-তার
বাণীর মন্দিরে দোঁহে প্রাণ-উপায়নে
সাজাতেছিলাম অর্ঘ্য আপনার মনে
কি গভীর হর্ষে নিতি! বিজন বনের
দু'টী সুকুমার কলি অজ্ঞাতে বিশ্বের
বুঝি বিশ্ব-জননীর চরণ-সেবায়
পেয়েছিল অধিকার কেমনে যা হায়,
না জানি কি শুভক্ষণে! ছিল সাধ কত
সুগোপন মরমের সুধা-গন্ধ যত
নিঃশেষে উৎসর্গ করি' করিব সার্থক
ক্ষুদ্র পুষ্পজন্মটুকু!

নিয়তি কণ্টক
হায়রে স্নেহের বোন্! ভাবিনি স্বপনে
পূজা ফুরাবার আগে মধুর বোধনে
বিজয়ার বিসর্জ্জন! শশী পূর্ণিমার
অকস্মাৎ বসুন্ধরা করিয়া আঁধার
নিশি নাহি হতে শেষ হবে অস্তমিত
করাল রাহুর গ্রাসে! উৎসবের গীত
সমাপ্ত না হতে হায়, করুণ ক্রন্দনে
সব হবে সমাপন! আধেক জীবনে
এ সংসার-রঙ্গভূমে নাট্য-অভিনয়
হয়ে যাবে অবসান—সহস্র হৃদয়
ব্যাকুলিয়া তুমি হেন লইবে বিদায়

* লেখকের একমাত্র কনিষ্ঠা সহোদরা শ্রীমতী হেমন্ত বালা দত্তের মহাপ্রয়াণে লিখিত।

অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মাঝে! কে জানিত হায়,
কৃষ্ণা অষ্টমীর নিশি বর্ষণ-মলিনা
অতর্কিতে ছিন্ন করি গীতিময়ী বীণা
নিবিড় তিমির আর তপ্ত আঁখি-জল
রেখে যাবে শুধু আজ!
অর্ঘ্য নিরমল
"শিশির" "মাধবী"* তব প্রকৃতিলক্ষ্মীর
শিশির-মাধবী সম শ্যামা ধরিত্রীর
উদার বিশাল বক্ষে পবিত্র সুন্দর
আনন্দের প্রস্রবণ, আজি হা ঈশ্বর!
মাতৃহারা শিশুপ্রায় তারা নিরন্তর
কি করুণ আর্ত্তনাদে সকল অন্তর
দহিতেছে পলে পলে! "বৈশাখী"† তোমার
বৈশাখী-ঝড়ের মত প্রাসাদ আশার
সহসা বিচূর্ণ করি' নিল উড়াইয়া
অকূল সিন্ধুর কূলে—বুঝি ডুবাইয়া
দিল হায়, চির তরে!
কি নিঃসঙ্গ আজ
কি গভীর শক্তিহীন বসুন্ধরা মাঝ
অভাগা অগ্রজ তব! বজ্রাহত-প্রায়
কর্ম্মহারা প্রাণহারা বসে শুধু হায়,
ভাবিতেছি নিশিদিন, একি আকর্ষণ
অজ্ঞাত দেশের কোন্, সকল বন্ধন
টুটে যায় ক্ষণে ক্ষণে—হয়ে যায় শেষ
সব ব্যথা-যাতনার! কেমন সে দেশ—
কত দূরে—কোন্ খানে? প্রাণের ক্রন্দন
পশে কি সেথায় কভু? একটী স্পন্দন
তুলে কি ধরার শত স্নেহ-আকিঞ্চন
বারেক ভুলেও সেথা?

সেথা কি এমন
প্রকৃতি জননী হেন মুক্ত করি প্রাণ
সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে নিত্য সুধা-স্তন্য দান
পিপাসু সন্তানে করে? অনন্ত গগনে
রবি-চন্দ্র-গ্রহ-তারা নর্ত্তন-কীর্ত্তনে
অনাহত-সঙ্গীতের পীযূষ-প্লাবন
সেথা কি জাগায় কভু? স্নিগ্ধ সমীরণ
আনন্দের বার্ত্তা লয়ে দ্বারে দ্বারে দ্বারে
বহে কি এমনি সেথা? প্রসূন-সম্ভারে
ভরে উঠে অরণ্যানী? পাখী গায় গান
মুখরিয়া দশদিশি? তুলি 'কল'-তান
ধায় নদী সিন্ধু-পানে?
কিছু নাহি জানি—
বুঝিনা কিছুই হায়! শুধু সত্য মানি
সে দুর্জ্ঞেয় মহালোকে যারা যায় চলে
বুঝি তারা হর্ষে যায়! যারা ধরাতলে
পড়ে রয় মন্দভাগ্য, নিত্য হাহাকার
তাদের সম্বল শুধু!
হা বোন্ আমার!
না বুঝি রহস্য এ কি! না বুঝি বিচার!
যারা হেথা আগে আসে, যাহাদের আর
নাহি কিছু প্রয়োজন, তারা পড়ি রয়
বহিবারে দুঃখ-ডালি—আবর্জ্জনাময়
করিবারে বসুধায়! হায়, নিশিদিন
অদৃষ্টের অভিশাপে সান্ত্বনাবিহীন
দহিতে মরমে শুধু তীব্র তুষানলে
বৃশ্চিক-দংশন-ক্লেশে! প্রফুল্ল কমলে
অকস্মাৎ হরি' লয় করি বৃন্তচ্যুত
নিদারুণ কাল-ঘায়, কোন্ সে অদ্ভুত
খেয়ালীর এ খেয়াল! শুনেছি দেবতা
ন্যায়ময় প্রেমময় দয়ালু সর্ব্বথা—
এ কি তা'রি পরিচয়!

---

* কবি হেমন্তের দুইখানি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য।

† কবি হেমন্তবালার রোগশয্যায় লিখিত অপ্রকাশিত কাব্য।

ক্ষম কৃপাময়!
বুঝেনা—বুঝেনা আজ অশান্ত হৃদয়
কি তব মঙ্গল-বিধি! না পায় খুঁজিয়া
মোদের এ খেলাঘরে যাহা হারাইয়া
যায় কভু একবার! তাই বারংবার
আশের-উচ্ছ্বাস জাগে প্রাণের মাঝার
ভস্ম করি জীবনের সব শান্তি-সুখ
বিশুষ্ক তৃণের সম! ভেঙ্গে পড়ে বুক
ধরণীর ধূলিস্তূপে!
শক্তি দাও নাথ!
অকাতরে সহি যেন নির্ম্মম আঘাত
নিরখিতে পারি ওই চরণ-ছায়ায়
আনন্দে হেরম্ব বসি প্রাণ ভরি গায়
তব অফুরন্ত দেব! মহিমা-সঙ্গীত
সুমধুর সুধাস্রাবী এ বিশ্ব-অতীত!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

বিবিধ।

কলিকাতা ও স্বাস্থ্য।—১৯১৪-১৫ সালে জন্ম-সংখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় অল্প রহিয়াছে। মোট জন্ম-সংখ্যা ১৭,৩০৬ অর্থাৎ হাজার করা ১৯·৪। গত বৎসর ছিল ২০·৫। কর্ত্তৃপক্ষ বলেন যে সম্ভবতঃ সমস্ত জন্মের সংবাদ তাঁহাদিগের গোচর হয় না। মোট মৃত্যু-সংখ্যা ২৫,৪৩১ অর্থাৎ হাজার করা ২৮·২। গত বৎসর ছিল ২৯·২। প্লেগ, কলেরা এবং বসন্তে গত বৎসর ২,৭৩৬ এবং আলোচ্য বর্ষে ৩,৪৬৩ জন মরিয়াছে। অন্যান্য পীড়ায় মৃত্যু-সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। নারী-মৃত্যু অত্যন্ত অধিক; হাজার করা ৩৮·৫। শিশু-মৃত্যু আশ্চর্য্যজনক—হাজার করা গত বৎসর ২৭৪·৮, আলোচ্য বৎসর ২৮২·৭। স্বাস্থ্য-বিষয়ক নানাবিধ পুস্তিকা ধাত্রীগণকে বিতরণ করা হইয়াছে।

খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার অভিযোগের সংখ্যা গত বৎসর ৭৬২, কিন্তু আলোচ্য বর্ষে ১,১১৫ দাঁড়াইয়াছে। আইনের কড়া-কড়িতে এখন অনেকেই ধরা পড়িতেছে। বিশুদ্ধ-দুগ্ধ-সরবরাহের প্রণালী-সম্বন্ধে এখনও আলোচনা, গবেষণা ও তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে।

কলিকাতা চিড়িয়াখানা।—দর্শকগণের নিকট দর্শনী বাবত ৪২,২৬৯/০ টাকা আদায় হইয়াছিল; পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আদায়ের পরিমাণ ১১,৬৪৪৷৷৵০ কম। নানা বাবদে মোট জমা ৯৮,২০২৷৷৵৪ টাকা এবং খরচ ৮৩,৭৩১৷৷৵২ টাকা। ইউরোপের যুদ্ধের হাঙ্গামে এ বৎসর আয় অল্প হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে জন্তুর সংখ্যা ৩৩৪, পক্ষী ১,৮৯৮, এবং সরীসৃপের সংখ্যা ২৪৬। পূর্ব্ব বৎসর যথাক্রমে ৩৭৮, ১৬৫৯, এবং ২২৩ ছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও মাসের মধ্যে ১ দিন দর্শকগণকে দর্শনী না দিয়া চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। এই সুযোগে মোট ৬৫,০৩৩ জন দর্শক পশু প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

তরুণবয়স্কগণের কয়েদ।—আলিপুরে ১৯০৮ সালে এই জেলখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কার্য্য বেশ চলিতেছে। কিন্তু ইহার সুফল পরবর্ত্তী কালে অনেকটা খারাপ হইয়া যায়, কেননা জেল হইতে বাহির হইয়া তাহাদিগের যত্ন লইবার কেহই থাকে না। অন্যান্য দেশে এইরূপ জেলখানার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষ-

বিদ্যালয় থাকে। এই শিল্পবিদ্যালয়ে থাকিয়া কয়েদিগণ শিল্প শিক্ষা করিবার সুবিধা পায়।

কৃষকগণের অবস্থা।—ইউরোপে সহসা যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় পাটের দর অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে যেরূপ পাট উৎপন্ন হইয়াছিল, এরূপ কখনও হয় নাই। কিন্তু দর কমিয়া যাওয়ায় উৎকৃষ্ট পাটই অতি অল্প মূল্যে বিক্রিত হইয়াছিল। যাহাদের পাট তত ভাল হয় নাই, তাহারা পাট বিক্রয় পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। ফলে কৃষকগণের দুর্দ্দশা ও দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল।

১৯১৪-১৫ সালে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে সুপ্রচুর বৃষ্টি না হওয়ায় বাখরগঞ্জ-অঞ্চলে ধান্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। বাখরগঞ্জের ধান্য প্রায় অর্দ্ধ বঙ্গের জীবনস্বরূপ। যাহা হউক এই নানাকারণ-জাত দুঃখ আংশিক মোচন করিবার জন্য সরকার হইতে ১,৩৪,৩৮৫৲ টাকা কৃষকগণকে ঋণ দেওয়া হইয়াছিল।

১৯১৩-১৪ সালে পাটের অবস্থা ভাল ছিল। মজুরগণ যথেষ্ট পারিশ্রমিক পাইয়াছিল। পুরা দমে কাজও চলিয়াছিল। কিন্তু ১৯১৪-১৫ সালে পাট একবারে মাটি হইল। মজুরের মাহিনা কমিল, অথচ মজুরীও জুটিল না। ইহাদের দুরবস্থা অবর্ণনীয়।

বন্য জানোয়ার ও মৃত্যুর হার।—১৯১৩ সালে বঙ্গে সর্ব্বসমেত ২৯৯ জন লোক বন্য-জীব কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯১৪ সালে ৩৩২ জন। এই বৃদ্ধি প্রেসিডেন্সি, ঢাকা এবং রাজসাহী বিভাগেই হইয়াছিল। ১৯১৩ সালে ব্যাঘ্রের আক্রমণে ৮৪ জন, এবং ১৯১৪ সালে ৬০ জন মরিয়াছে। কিন্তু বাঘ ছাড়া অন্য জানোয়ারের কবলে অধিক লোক মরিয়াছে, তন্মধ্যে কুম্ভীর প্রধান। ১৯১৩ সালে ৯৯ জন, কিন্তু ১৯১৪ সালে ১৪৮ জন লোককে কুমিরে খাইয়াছিল।

সর্পাঘাতে ১৯১৩ সালে ৪,৪৯১ জন এবং ১৯১৪ সালে ৪,৩৫৬ জন মরিয়াছিল। কিছু কম বটে। প্রেসিডেন্সি এবং রাজসাহী বিভাগেই কম মরিয়াছিল।

গরু বাছুর ৪,৭৫০টা বন্যজন্তু কর্ত্তৃক এবং ১১৭টা সর্প-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা অনেক কম।

বাঘ মারা হইয়াছে ২০৫টা, সাপ ১০২১৫টা। নানাবিধ বন্য জানোয়ার মারার দরুণ সরকারের ১৭,৪৭৭৵০ টাকা এবং সর্প-হত্যার দরুণ ১৫৭।/১০ খরচ হইয়াছিল।

ধান কাপড়ে ছাপার পাড় প্রস্তুত করিবার প্রণালী।—প্রথমতঃ ধান কাপড়খানাকে জলে কাচিয়া নাড়শূন্য করিয়া লইয়া একবার ইস্তিরী করিয়া লইতে হইবে। ছাপার ছাঁচ কেহ কেহ কাঠের করেন, অথবা টিনের বা দস্তার পাতের উপর যাহারা ষ্টেনসিল প্লেটের কাজ করে, তাহাদিগকে দিয়া লতা-পাতা-ফল-ফুল-বিশিষ্ট এক ইঞ্চি হইতে অর্দ্ধ ইঞ্চি প্রশস্ত প্লেট করাইয়া লইতে হয়। কেহ কেহ পাড়ের উপর গান, কবিতা, নাম ইত্যাদিও দিয়া থাকেন।

তাহার পর একটি মৃত্তিকা-পাত্রে গরম বা ঠাণ্ডা জলে মগাই খয়ের খানিকটা দিয়া গলাইয়া লইতে হইবে। এই খয়ের বা জলের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত, যাহাতে খুব ঘন বা খুব পাতলা না হয়। এখন যদি কাঠের ছাঁচ হয় তাহা হইলে ঐ রঙ্গে ডুবাইয়া একখানা কাঠের তক্তার উপর ২।৩ পুরু কাপড় দিয়া প্যাডের

মত করিয়া তাহার উপর যে কাপড়ের পাড় ছাপিতে হইবে, তাহার পাড়টী টাইট করিয়া সমতল করিয়া বসাইয়া তাহার উপর ছাপ দিতে হইবে। ছাঁচ যদি দস্তার বা টিনের হয়, তাহা হইলে পাড়টীর উপর ছাঁচের প্লেটখানি বসাইয়া তাহার উপর একটী ন্যাকড়ার পুঁটলীকে দ্রবীভূত মগাই খয়েরে ডুবাইয়া ঐ প্লেটের কাটা ফাঁক-গুলিতে বেশ করিয়া মাখাইতে হইবে, যেন সে রং কাপড়ের অপর পৃষ্ঠায় ফুটিয়া উঠে। কাপড়ের সমস্ত পাড়টার ছাপ দেওয়া হইলে আস্তে আস্তে কাপড়খানি তুলিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে, যেন ছাপা ছুবড়াইয়া না যায়।

তাহার পর একটা অন্য পাত্রে বাই-কার্ব্বনেট অফ্ পটাসকে ঘনভাবে গলাইয়া তাহাতে ছাপা শুষ্ক কাপড়ের কেবল পাড়ের অংশটুকু ডুবাইয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ শীতল জলে বারম্বার ধৌত করিয়া লইলে পাড় পাকা হইবে। বাই-কার্ব্বনেট অফ্ পটাসের সলুইশন যত ঘন হইবে পাড়ের রং তত উজ্জ্বল এবং স্থায়ী হইবে।—(কাজের লোক)

স্বদেশী-কলেজ-প্রতিষ্ঠার্থে দান।—কেণ্টের (Kent) অন্তঃপাতী হেভার-(Hevar) নিবাসিনী মিস্ ইথেল এডারেষ্ট ভারবর্ষে একটী স্বদেশী কলেজ স্থাপনের জন্য দুই লক্ষ দশ হাজার (২,১০,০০০) টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার এই ইচ্ছা যে তাঁহার টাকায় ভারতবাসীরা, তাঁহাদের যে বিষয়ে ইচ্ছা, ভারতবাসী ছাত্র-দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ভারতবাসী শিক্ষক নিযুক্ত করিবে। এই সংবাদটি আমাদের নিকট অতিশয় আদরণীয়। কারণ, কোন লোক এখন পর্য্যন্ত এরূপ দান করেন নাই। ভারতে যাহাতে শিক্ষার উন্নতি হয় তজ্জন্য সদয় ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেছেন এবং অনেক লোক অনেক অর্থ-দান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এরূপ দান কেহই করেন নাই। যাঁহারা দান করিয়াছেন তাঁহারা এমন কিছু উল্লেখ করেন নাই যে, তাঁহাদের অর্থে কেবলমাত্র ভারতবাসী শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন। ইহার ফলে এই হয় যে, তাঁহারা যে বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য অর্থদান করিয়াছেন, সেই বিষয়ে যিনি উপযুক্ত তিনি জাতিবিভেদে নিযুক্ত হন। কিন্তু মিস্ এডা-রেষ্টের ইচ্ছা-পত্রে তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন যে তাঁহার অর্থে কেবলমাত্র ভারত-বাসীই নিযুক্ত হইবে। ইনি বিদেশী রমণী হইয়াও যে ভারতের উন্নতির জন্য এরূপ দান করিয়াছেন, তজ্জন্য ভারতবাসীরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। ইনি আজ যে পথ দেখাইলেন, আশা করি যাঁহারা শিক্ষার উন্নতির জন্য ভবিষ্যতে অর্থদান করিবেন, তাঁহারা এই পথ অবলম্বন করিবেন।

শ্যামদেশে ১৫,৯০,৮০০ নারিকেল গাছ রোপন করা হইয়াছে। সমস্ত গাছই খুব তেজীয়ান্ হইয়াছে।

জলে অল্প পরিমাণ দুগ্ধ মিশাইয়া সেই জলে শিশুদিগকে স্নান করাইলে তাহাদের ত্বক্ কোমল ও মসৃণ হয়। যে জলে ধাতব পদার্থ মিশ্রিত আছে, সেই জল ২০ মিনিট কাল ফুটাইয়া তন্মধ্যে দুগ্ধ বা শুটের গুঁড়া মিশাইলে তাহা বেশ স্নানের উপযুক্ত হয়।

চাবি মাঝে মাঝে তৈলে ডুবাইলে তালা ভাল থাকে; কব্জার মধ্যে মধ্যে তৈল দিলে উহার শীঘ্র ক্ষয় হয় না।

অনেক সময় দুগ্ধ পুড়িয়া যায়। কড়ায়

দুধ ঢালিবার পূর্ব্বে যদি কড়ায় কিঞ্চিৎ জল দিয়া ফুটাইয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, তবে দুধ কখনও পুড়িবে না।

অসামান্যা-নারী।—কুমারী গারট্রাড ও' এডারেষ্ট ইংলণ্ডের এক ধনবতী রমণী। তিনি তাঁহার পরমসুন্দর ও সুবৃহৎ বাটী জীবের কল্যাণার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার বাটীতে ভগ্ন-স্বাস্থ্য সাহিত্যিক, চিত্রকর ও গায়কগণ আশ্রয় পাইবেন। তাঁহাদের নিকট হইতে আহারের খরচ-ব্যতীত আর কিছু গ্রহণ করা হইবে না। উদ্যানে বিহঙ্গম-সকল কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে পারিবে। কেহ তাহাদের শান্তিভঙ্গ করিতে পারিবে না। তাঁহার বাটী ও উদ্যান রক্ষার জন্য তিনি এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা রাখিয়াছেন। তিনি নিজের উইলে লিখিয়াছেন,—তাঁহার মৃত্যুর পর ছুরি-দ্বারা তাঁহার হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করিয়া তাঁহার যে নিশ্চিত মৃত্যু হইয়াছে, তাহা অবধারণ করিতে হইবে। তৎপরে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত করা হইবে। সৎকারের সময় ধর্ম্মক্রিয়া করা হইবে না, ভস্মের উপর ফুল দেওয়া হইবে না এবং কেহ শোক-চিহ্ন ধারণ করিতে পারিবে না।

সদালাপ-সংগ্রহ।

বেকুফ কে? (রাজা ও বনবাসী)।—কোন রাজার খেয়াল হইল যে, সর্ব্বাপেক্ষা যে বেকুফ (নির্ব্বোধ) তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন এবং অনেক টাকা দিবেন। যাহাকেই তাঁহার অনুচরেরা জিজ্ঞাসা করে যে, সে ব্যক্তি বেকুফ কিনা, সেই বলে, "আমি কেন বেকুফ হইব? তুমিই বেকুফ।" একদিন রাজা বনের ভিতর দেখিলেন যে, এক ব্যক্তি যে-ডালে বসিয়া আছে তাহাই কাটিতেছে। রাজা বলিলেন, "তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বেকুফ।" সে ব্যক্তি বলিল, "না। তাহা হইলে মহারাজ! তোমাকে ঐ কথা পাল্টাইয়া বলিতাম।" রাজা বলিলেন, "তুমি ডাল কাটা হইলে পড়িয়া যাইবে; এরূপ ডাল-কাটার কোন কারণই নাই।" বনবাসী বলিল যে ঐ ডালটার অর্দ্ধেক কাটা হইলেই সে কাটারিটী ভূমে ফেলিয়া দিবে এবং আর একটা ডাল ধরিয়া পাশের নিজের ডালটা খুব নাড়া দিবে; তাহা হইলেই ঐ শুষ্ক ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং সে একটু ঝুলিয়া পুনর্ব্বার ঐ বৃক্ষাবলম্বনেই নামিয়া আসিবে। তাহাই ঐ ক্ষেত্রে শুষ্ক-কাষ্ঠ-সংগ্রহের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায়। রাজা আবার বলিলেন, "তুমি বড় বেকুফ, তোমাকেই আমি টাকা পুরস্কার দিব।" বনবাসী বলিল, "আমি টাকা লইব না। টাকা ছুঁইয়া আমার সদানন্দ হারাইব—তত বেকুফ আমি নই।" রাজা বলিলেন, "টাকা ছাড়িতেছ, আর বেকুফ নও?" রাজা উহাকে "বড় বেকুফ"-অঙ্কিত একটী পদক দিলেন। বনবাসী ঝুলিতে রাখিয়া দিল।

কয়েক বৎসর পরে রাজার মৃত্যুকালে ঐ বনবাসী আসিয়া রাজাকে বলিল, "মহারাজ! যাহার চিন্তায় জীবন কাটাইলেন, সে ধন-জন সঙ্গে যাইবে কি?" রাজা বলিলেন, "না"।

বনবাসী বলিল, "যদি এ-সব ছাড়িয়া বা নাই ছাড়িয়া শ্রীভগবানের উপরই বেশী মন [illegible] কি?" রাজা [illegible] "হঁ"। বনবাসী বলিল, "মহারাজ! এই পদকটী আপনারই প্রাপ্য বলিয়া ইহা এখন আপনাকে দিব কি?"—রাজার তখন চক্ষু খুলিয়াছিল, তিনি বৃক্ষ-পুরুষের পাদস্পর্শ করিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বলিলেন, "উহা আমারই প্রাপ্য।"

———

কোন নরপতি সাগর-পারে গমন করিবার জন্য অর্ণবযানে উঠিলেন। সঙ্গে যে-সকল ক্রীতদাস ছিল, তন্মধ্যে একজন পূর্ব্বে কখনও সাগর দেখে নাই এবং পোতের সীমাবদ্ধ স্থানে অবস্থিতির বিড়ম্বনা কখনও সহ্য করে নাই। সে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল এবং ভয়ে তাহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। শত প্রবোধবাক্যেও সে প্রকৃতিস্থ হইল না। নরপতি অতিমাত্র দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। আরোহিগণের মধ্যে এক বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলিলেন, "রাজন্! আপনার আদেশ প্রাপ্ত হইলে কোন বিশেষ উপায়ে উহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারি।" নরপতির আদেশক্রমে ভৃত্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইল। কয়েকবার "ডুব খাইবার" পর উহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক উহাকে উত্তোলন করতঃ পোতস্তম্ভে বিলম্বিত করা হইল। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্য পোতবক্ষে অবতারিত হইলে একপ্রান্তে উপবেশন করিল এবং প্রকৃতিস্থ হইল।

নরপতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে জ্ঞান-কুশল! আপনার কৌশলের মর্ম্মোদ্ঘাটনপূর্ব্বক আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।" পণ্ডিত কহিলেন—"জলে ডুবিলে কত কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ভৃত্য তাহা জানিত না এবং পোতে থাকিয়া "আরাম"-প্রাপ্তির মূল্যও বুঝিত না। যে-হেতু কেহ বিপদে না পড়িলে সম্পদের মূল্য বুঝিতে পারে না। যাহার ক্ষুধা বিদূরিত হইয়াছে সে যব-রোটিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, কিন্তু ক্ষুধাতুরের নিকট উহা পরম উপাদেয়। স্বর্গবাসী "আ'রাফে" (স্বর্গসুখ ও নরক-দুঃখ উভয়েই সে-স্থানে বর্ত্তমান)—উপনীত হইলে নরকে উপস্থিত হইলাম বলিয়া "ত্রাহি, ত্রাহি" বলিবে। কিন্তু নারকীর নিকট "আ'রাফ"ই স্বর্গ বলিয়া প্রতিপন্ন।

"সুখের মাত্রা অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া দুঃখিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। বরং অপেক্ষাকৃত দুঃখী জনের সহিত তুলনায় প্রাপ্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশ্ব-বিধাতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সকলের কর্ত্তব্য।" (এডুকেশন গেজেট।)

———

মানুষের স্বাভাবিক মহত্ত্ব।—মানুষ চোর হউক কি বদমায়েস হউক, সে বিধাতৃ-প্রদত্ত মহত্ত্ব হইতে কখনও একেবারে বঞ্চিত হয় না। ইংলণ্ডের যে-সমুদায় বালক দুষ্কর্ম্মের জন্য সংশোধক কারাগারে আবদ্ধ আছে, তাহাদের ১৯ হাজার সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে তিন জন অসাধারণ বীরত্ব-প্রকাশের জন্য ভিক্টোরিয়া ক্রশ পাইয়াছে, ২৫ জন বীরত্বের জন্য মেডেল পাইয়াছে, ২০ জন প্রশংসা-ভাজন হইয়াছে এবং ৮ জন সৈন্যাধ্যক্ষের পদ পাইয়াছে।

ইংলণ্ডের কারাগার হইতে ১২০০ কয়েদী

যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে ভিক্টোরিয়া ক্রশ ও ফ্রান্স-সম্রাট-প্রদত্ত সেণ্ট্ জর্জ্জের ক্রশ পাইয়াছে। একজন অসামান্য-শূরত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহার সৈন্য-দলকে মৃত্যু-গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই মহত্ত্ব আছে, কেবল শিক্ষা ও সঙ্গদোষে তাহারা অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহা যদি স্মরণ রাখি, তবে কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারি না।

শিষ্টাচার প্রহরীর ন্যায় কার্য্য করে। ইহা মানব-চরিত্রের কঠোরতা ঢাকিয়া রাখে এবং অপরের মনে বেদনা দেওয়া অসম্ভব করে। অভদ্রের সঙ্গে যখন ব্যবহার কর, তখনও শিষ্টাচার পরিহার করিও না।

সময়ই জীবন। অপরের প্রাণহত্যা আর সময় নষ্ট করা একই কথা এক এক জন এমন আছেন, সাক্ষাৎকার করিতে গিয়া উঠিতে চান না। কাজ শেষ হইবা-মাত্র তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাওয়া উচিত। নতুবা যাহার সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিতে যাও, তাহার সময় নষ্ট অর্থাৎ প্রাণ নষ্ট করা হয়।

একটা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করিলে আর একটা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদনের শক্তি লাভ করা যায়। একটা পাপ জয় করিলে দশটা পাপ জয়ের শক্তি হয়।

বিবেকের মত চৌকিদার আর কেহ নাই।

প্রশংসা রসনা-উচ্চারিত শব্দ-মাত্র। আত্ম-সম্মান প্রশংসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

পরচর্চ্চা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। ইহাতে মানুষের মন ছোট হইয়া যায়। মানবের কৃত-কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করিতে পার, কিন্তু তাহার দোষ-গুণের আলোচনা করিও না।

নিজের দুঃখ-কষ্টের চিন্তা করিও না। তাহা অপেক্ষা আশা ও আনন্দের চিন্তা করাই ভাল। (সঞ্জীবনী।)

গান।

(ঝিঁঝিট রাগিণী)

কত-দিনে হব পার
দুঃখ-ব্যথা-ভরা
সুখ-শান্তি-হারা
এই অনিত্য সংসার?
মিটেছে আমার
সকল বাসনা,
পূর্ণ হয়েছে
সকল কামনা,
এখন তুমি হে আমার
সকল সাধনা
জেনেছি বুঝেছি সার।

তুমি ছাড়া আর
কেহ মোর নাই
খুঁজিয়া দেখেছি
বিশ্বে সব ঠাঁই,
তাই যে গো আমি
তোমারেই চাই
ওহে প্রাণাধার!

অনিত্য জগৎ
অনিত্য সংসার,
সকলি অনিত্য
অজ্ঞান আঁধার।
জ্ঞানের আলোক
জ্বাল হে আমার
ঘুচায়ে মোহ-আঁধার॥

শ্রী চারুমতি দেবী।

প্রেম ও আশা।

সে তার আঁধার ঘরে পড়ে আছে একা,
শুক্তি-মাঝে মুক্তা-আভরণ,
অতলের তল পেলে হবে তার দেখা
দুর্ভেদের গেলে আবরণ!
নৌন তার মনের বারতা, চির-স্থির আলোকের
খনির মণির দীপ, অনির্ব্বাণ তারকা-লোকের!

এ তার অপার পথে চলিয়াছে উড়ে
নীড়-ভাঙা পাখীর মতন,
আলো-আঁধারের পথে দূর হতে দূরে,
কোথা বাধা, কোথায় বারণ?
উধাও মনের তার বিদায়-বারতা, শুধু গান—
চাতকের তৃষ্ণা-মাঝে চকোরের সুধার আহ্বান!

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী।

আমাদের কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আজ পাঁচ বৎসর শ্বশুরালয়ে আছি; ইহার মধ্যে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছে।

দাদা পত্র লিখেন, মেজদিদি পত্র লিখেন, আমিও তাঁহাদের পত্র লিখি। আজ প্রায় তিন বৎসর হইল, মেজদিদির একটী খোকা হইয়াছে। আশা ছিল না,—এত বয়সে যে তাঁহার সন্তান হইবে, কেহ আশা করে নাই; শুনিলাম এক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ নাকি কি কবচ দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার সেই-মেজদিদির খোকা হইয়াছে,—আর আমি দেখি নাই! বলিয়াছি ত. সবই সম্ভব। খোকার অন্ন-প্রাশনের সময় তিনি আমাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, আমি যাইতে চাহি নাই। আমি কাহারও সহিত আর সাক্ষাৎকার করিব না, একথা স্পষ্ট লিখিয়া থাকি। কি জানি কেন—? জানি বৈকি। এমন কি দাদা-পর্য্যন্ত আমায় আর দেখিতে আসেন নাই।—এই পাঁচ বৎসর। আমি লিখিয়া থাকি যে, আমি

ভাল আছি, খাসা আছি। দাদা ও মেজদিদি আমায় অনেক উপদেশ দিয়া পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। কিন্তু আমি চিরকাল উপদেশের আগে চলিয়া থাকি—"স্রোতের আগে ট্যাপা মাছ" ভাসিয়া থাকি।

বলিয়াছি, আমাকে ইহার মধ্যে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। পাড়াগাঁয়ে সকলের বাড়ীতেই সকলের যাওয়া-আসা থাকে। পাড়ার অনেক নিষ্কর্ম্মা ছেলে দুপুর-বেলা আমাদের বাড়ীতে আসিয়া মাণিকের সঙ্গে তাস খেলা করে। মাণিক আমার জ্যেষ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ছোট-বেলা থেকেই এখানে থাকে, এখানেই একটু লেখাপড়া শিখিয়াছে, এখানেই জমীদার-বাড়ীতে কাজ করে। মাণিকের বয়স প্রায় পঁচিশ, সেদিন বিবাহ হইয়াছে। বেশ দিব্য বৌটি, খাসা কাজ-কর্ম্মে। মাণিকের ভারি ইচ্ছা, আমার সহিত একটু কথা কয়। কিন্তু প্রথম তিন বৎসর ত সে আমার মুখই দেখিতে পায় নাই; তারপর কথা কহিয়াছি বটে, কিন্তু আমার মুখের গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সে বড় হতাশ হইয়াছে। 'দিদি' বলিয়া, দাঁত বাহির করিয়া বাধিত করার সুরে কত কথা বলিতে আসে, কিন্তু আমার গম্ভীর মুখের একটি "হুঁ" ভিন্ন সে আর বড় কিছু পায় না;—তাতেই যেন সে কত খুসী! তোমরা বলিবে, স্ত্রীলোকের সর্ব্বদা সহাস্য-বদন হওয়া উচিত। সত্য বটে, —কিন্তু লোক-বিশেষে আছে।

পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা সকলেই এপাড়া-ওপাড়া, এবাড়ী-ওবাড়ী করিয়া বেড়ায়, ভ্রমরও বেড়ায়। পাড়াগাঁয়ে মেয়েদের মধ্যে কে কখন কোথায় গেল, তার খোঁজ-খবর সকলে বড় রাখে না। দুপুর বেলা খাওয়া হইলেই, ভ্রমর আঁচলে এক গোছা চাবী দোলাইয়া দুলিতে দুলিতে বাহির হয়। ভ্রমরকে আমি এরূপভাবে বেড়াইতে বারণ করিতাম। তাহাতে সে বলিত, "তাতে দোষ কি?"

পাড়ার ছেলেরা বাড়ীতে আসিলে ভ্রমর ছুতো-নাতা করিয়া কেবল তাহাদের সঙ্গে কথা কহিবে, তাহাদের সঙ্গে হাসিবে, তাহারা খেলিতে বসিলে ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া খেলা দেখিবে ও খেলা দেখাইয়া দিবে। মাণিক যেখানে বসিবে, ভ্রমর নিষ্কারণে সেখানে গিয়া গল্প আরম্ভ করিবে, হাসিবে, ও চেঁচামেচী করিবে। পাড়ায় গিয়া সে কি করিয়া বেড়ায়, ভগবান্ জানেন। বাড়ীতে শাসন নাই—বুঝি শাসন করিবার উপযুক্ত লোকও নাই। ঠাকুরঝি কেবল জানেন লোকের সঙ্গে গলাবাজি করিয়া ঝগড়া করিতে। আমি ভ্রমরকে সহস্র-দিন অমন করিয়া পাড়া বেড়াইতে, পুরুষ-মানুষের সংস্রবে যাইতে, পুরুষমানুষের সঙ্গে অনাবশ্যক কথা কহিতে বারণ করিয়াছি,—সে শোনে নাই।

একটি বড় আশ্চর্য্যের বিষয় দেখি!—ঠাকুরঝিকে। তাঁহার বিবাহের অব্যবহিত পরের ছটো ঘরে আছে। এই কি সেই মানুষ? কি আশ্চর্য্যজনক পরিবর্ত্তন! তাহাতে কি সুন্দর, সহাস্য, কমনীয় মূর্ত্তি—আর এখন কি? মনুষ্য পশু নহে। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি জন্তু-ধর্ম্মের চরিতার্থতা-ভিন্ন তাহার মন যেন আরও কিছু চায়।—কি চায়? থাক্। ঠাকুরঝির জীবন আশাহীন। এরূপ অবস্থায় জীবন-ধারণ করিতে হইলে মানুষ আপনিই দমিয়া যায়, কেমনতর কি হইয়া

যায়, এবং যেমনটি হইয়া সে জন্মিয়াছিল, আকৃতি-প্রকৃতিতে তাহার অনেক নিষ্ঠুর পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। ঠাকুরঝির কি তাহাই?

ভ্রমর আমার কথা শুনিত না, কিন্তু তাহার উপর রাগ করিতেও আমি এক-দিনের তরে পারি নাই;—তার উপর যেন কাহারও রাগ হইতেই পারে না। আশ্চর্য্য মেয়ে! মনে হইত, যদি তার কপাল না পুড়িত, তবে তোমরা কি সুখের সংসারই হইত! তার সংসর্গে যে আসিবে তাকেই সে আনন্দময় করিতে পারে।

একদিন হঠাৎ শুনিলাম, আমার দেবর মাণিককে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন। এমনি-ভাবে কয় দিন কাটিল। দেখিলাম, সেই থেকে ভ্রমরও কেমনতর হইয়াছে। ভ্রমরকে বলিলাম,"মা! আজ হতে তুমি আমার কাছে শোবে।"সে রাজি হইল। কিছু দিন পরে একদিন রাত্রে আমি ভ্রমরকে ধরিয়া পড়িলাম। সে কাঁদিয়া ফেলিল—আমায় জড়াইয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। দু-জনে পাশাপাশি শুইয়াছিলাম,—মুখোমুখী হইয়া শুইয়াছিলাম। ভ্রমর কাঁদিল, আমিও কাঁদিলাম। তাকে আমি বড় ভাল-বাসিতাম; তাহার উপর মিথ্যা সন্দেহ করায়, তার কান্না দেখিয়া ও কথা শুনিয়া তার উপর আরও স্নেহ বাড়িল। সমস্ত-রাত্রি দু-জনে জাগিয়া কাটাইলাম। তাহাকে কত বুঝাইলাম, সে সব বুঝিল,—সে বুদ্ধিমতী। পরদিন হইতে ভ্রমর আমার মত হইতে সঙ্কল্প করিল, আমার মত সাজিল, আর প্রতিজ্ঞা করিল—এক দণ্ড আমার কাছছাড়া হইবে না।

সেও আজ দুই বৎসরের কথা। এখন ভ্রমরের গতর কমিয়াছে, হাড় বাহির হইয়াছে, মুখশ্রী ম্লান হইয়াছে, ওষ্ঠাধর শুষ্ক হইয়াছে, চাহনি বিষাদ-পূর্ণ হইয়াছে, এবং কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হইয়াছে। সে এখন নির্জ্জনতা ভালবাসিতে শিখিয়াছে; এখন তাহার হাসিতে লজ্জা হয়, কাঁদিতে সুখ হয়, সুখ দেখিয়া ভয় হয়, বিলাস দেখিলে ঘৃণা হয়, আর পুরুষ-মানুষ দেখিলে শিহরিয়া উঠে।—ভ্রমর এখন ঠিক আমারই মত হইয়াছে।

কিন্তু আমার এ কেমন বৈধব্য? দুধ দিয়া জল খাইলে একাদশীর বাবাও টের পায় না বটে, কিন্তু যে খায় সে টের পায়।—সর্ব্বনাশ সেইখানে। সংসারে প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী কয়-জন? বাহিরে বিধবা সাজিলে যদি ব্রহ্মচারিণী হওয়া যাইত, তবে আমার দেবর-অপেক্ষা ধার্ম্মিক জগতে দুর্লভ। সাবিত্রী সত্যবানকে বিবাহ না করিয়া অন্য-পুরুষকে বিবাহ করিলে কে তাহার কি করিতে পারিত?

যে কয়-দিন মেজদিদির বাড়ীতে ছিলাম —আমার মুণ্ডপাতের যখন সমস্তই স্থির হইয়া গিয়াছিল,—তারই মধ্যে একদিন সেই মনুষ্যটিকে দেখিয়াছিলাম। তিনি দাদাবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া ক্লারিয়নেট্ বাজাইতে-ছিলেন, দাদা তাহার সঙ্গে "মৃণালিনীর" গান গাহিতেছিলেন—"এ জনমের সঙ্গে কি সই, জন্মের সাধ ফুরাইবে—।" তোমরা একটা অঙ্ক কসিয়া দেখ:—তাঁহার রূপ ছিল, আমি তাহা দেখিয়াছিলাম, আমার সঙ্গে তাঁহার বিবাহের সমস্তই স্থির হইয়া গিয়াছিল, আমি ক্ষুদ্র নারী।

তারপরে ত পলাইয়া আসিলাম, আবার বিধবা সাজিলাম, আবার কাঁচিয়া গণ্ডূষ

করিলাম। রাত্রের স্থির স্নিগ্ধ বাতাস আমার গায়ে তেমনি করিয়া লাগিত,—সেই বৈধব্যের পূর্ব্বরাত্রে যেমন লাগিয়াছিল, আর মেজদিদির পুকুরের ধারে বসিয়া সেই যেমন লাগিয়াছিল—তেমনি লাগিত। তার সঙ্গে আর কি ছিল? —বাহিরের বাতাসোদ্বেলিত পত্র-পল্লবের সর্ সর্ শব্দের মধ্যে সেই সেই দিনকার ক্লারিয়নেটের মধুর শব্দ, আর তার সঙ্গে সেই সুরের গায়ে মিশিয়া, সেই গানটির একটু অস্ফুট স্বর আমার কানের কাছে বাজিতে থাকিত। দাদা প্রাণের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গান গাহিয়াছিলেন, জানিতেন না অন্ত কাহারো কানে সেই গানের কথাগুলি কি সুরে বাজিতে পারে। কোকিল ডাকে আপনার প্রাণে; সে জানে না যে কোন্ মানুষের কানে তাহা কোন্ সুরে কিরূপ বাজিতে পারে;—সে জানে না যে পাপীয়সী রোহিণী তাহাতে বারুণীর জলে ডুবিতে পারে। গল্প আছে, এক ধোপা আপন-মনে বলিয়াছিল —"বেলা তো গেল, এখনও বাস্নায় আগুন দেওয়া হইল না?" তাই শুনিয়া লালাবাবু 'বাসনায়' আগুন দিয়া তখনই সংসার ত্যাগ করেন। তাঁর সাধ পূরিল না, এই ভাবিয়াই তিনি আকুল, স্বভাব-মধুর কণ্ঠ ফুকারিয়া সেই আকুল প্রাণের করুণ-গাথা গাহিতেই বিভোর! তিনি জানিতেন না যে পৃথিবীতে আরো কত মানুষ মন লইয়া বাস করে। কিন্তু সে-গানের সুর,সে-গানের কথা, সে-গানের ব্যথা ছাপিয়া উঠিয়াছে সেই কাল ক্লারিয়নেট্—বুঝি শুধু আমারই কানে! হায়,কান ছিল শুনিয়াছিলাম, চোক ছিল দেখিয়াছিলাম, মন ছিল ভাবিয়াছিলাম,—আমি ত দেবতা নহি!

রোজই রাত্রে যখন শয়ন করি, তখনই সেই ক্লারিয়নেটের সুর—গান এখন চাপা পড়িয়া গিয়াছে — কানে আঙুল দিলে যে সেই মধুর স্বর আরো স্পষ্ট শুনিতে পাই! চক্ষু মুদ্রিত করিলে যে সেই মোহনমূর্ত্তি আরো ভাল করিয়া দেখিতে পাই! এখন উপায়! আমি না ব্রহ্মচারিণী? ডুব দিয়া জল খাওয়া আর কাহাকে বলে? তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম —তোমাদের মধ্যে কয়জন ব্রহ্মচারিণী আছেন? অধিক থাকে ত, তাঁহারা দেবতা কিম্বা পশু—মানবী নহেন; মানবীর হৃদয় থাকে —দুর্ব্বল হৃদয় থাকে! আমি কলঙ্কিনী। কিন্তু এখন উপায়—?

গালি পাড়িতে আরম্ভ করিলাম, প্রাণ ভরিয়া গালি দিতে লাগিলাম। "রূপের কথা শুনিয়া মরিতে আসিয়াছিলে? আর মরিবার স্থান পাও নাই? আমার মত রূপসী খুঁজিয়া পাইতে না? তোমার মৃত-পত্নীর চিতায় কেন আরোহণ কর নাই? পরের সর্ব্বনাশ করিবার জন্তই বুঝি ঈশ্বর তোমায় রূপ ও গুণ দিয়াছিলেন! আমার সম্মুখে আসিবার পূর্ব্বে কেন তোমার মৃত্যু হইল না?"—ইত্যাদি-প্রকার গালি বর্ষণ করিয়া নিরপরাধ (!) পরের বাছাকে আপন-মনে আপ্যায়িত করিতে লাগিলাম।

কিন্তু এ গালি বর্ষণ কেবল আমার পুরাতন জ্বরে কুইনাইনের মত, পোড়া হাত জলে ডুবাইয়া ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টার মত, জলন্ত অঙ্গার কাপড় চাপা দিয়া ঢাকিতে যাওয়ার মতই কার্য্য করিল। এখন উপায়? এমনি করিয়া পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব? সকলকে ফাঁকি দিতে পার, কিন্তু আপনাকে কেহ ফাঁকি দিতে পার কি?

কেহ পারে না, আমিও পারিলাম না। দেখিলাম, এ খাঁচের মত গভর থাকিতে, এ ভাদ্রমাসের ভরা গাঙ ভরন্ত থাকিতে, আমার মনের কাছে নিস্তার নাই ;—এমন বাসা পাইলেই মন-বিহঙ্গ নাচিতে চাহিবে। এমন সাজানো বাগানে বসিয়া তপস্বিনী সাজিতে "আমি" ত পারিব না !—এ বাগান থাকিলেই ফুল ফুটিতে চাহিবে, ভ্রমর উড়িতে চাহিবে, কোকিল গাহিতে আসিবে,—প্রকৃতির সঙ্গে কে লড়িবে ? তবে ত এর উপায় করিতে হইল।—আহার কমাইতে আরম্ভ করিলাম,—এক-প্রকার বন্ধই করিলাম ;—চুলের রাশি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া ফেলিলাম, স্বাস্থ্যের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলাম।—অত্যাচারের চরম আরম্ভ করিলাম। একজন বুদ্ধিমান্ লোক ছিল। তাহার ঘরে বোল্‌তার চাক হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহাকে দু'একটি কাম্‌ড়াইয়া ঘর-ভাড়া দিত; ভাড়িবার চেষ্টা করিলে আরও বেশী বেশী আসিয়া তাহাকে কামড়াইত। একদিন হঠাৎ তাহার বুদ্ধি খুলিয়া গেল। সে ঘরে আগুন ধরাইয়া দিয়া বলিতে লাগিল, "দেখি, বোল্‌তা কোথায় যায়"। আমাকে সেইরূপ বুদ্ধিমতী মনে করিতে হইবে কি-না, সেটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে ; তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে, সে বোল্‌তার হাত নিশ্চয়ই এড়াইয়াছিল। আমি ত মরিয়াছিলাম, কিছুইনা-কেহনা হইয়াছিলাম, বেশ ছিলাম। দাদা, মেজদিদি ও দাদাবাবু সকলে মিলিয়া আমার মনে বোল্‌তার চাক বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদেরই সম্মুখে ঘর পুড়াইয়া বোল্‌তা তাড়াইব। অনাথের নাথ, ভগবান ! আমার সহায় হও ;—আমার আর কেহ নাই।

কিছু দিন পর হইতে একটু একটু জ্বর হইতে আরম্ভ করিল। বাঁচিলাম, জ্বরটুকু বেশ লাগিত। অনেক দিন ধরিয়া এমন চলিয়াছে। বেশ আছি ; বাঁশীর সুর এখন আর শ্বাসেন না—কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করে। একটুখানি বসিয়া থাকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতে গেলে চক্ষের সাম্‌নে সপুষ্প সর্ষপ-ক্ষেত্র দেখিতে পাই—মানুষ আর দেখা দেন না।

বাঁচিলাম। এখন যদি পথ দেখিতে পাই। মানুষ ত তুচ্ছ ; ভালবাসার আরো লোক আছে। তাহার সঙ্গে তুচ্ছ দেহের কোনও সম্বন্ধ নাই,—বরং দেহ থাকিলে দুঃখনিই করিতে পারে। তখন যে নারী হৃদয়-সরোবরের সেই শতদলের চতুষ্পার্শ্বে আর আর ক্ষুদ্র কমলগুলি সমবেত হইয়া এক মহা সহস্র-দল পদ্মের সৃষ্টি করে। সেই বিকশিত শ্বেত-সহস্রদল-পদ্মাসনে আমার কে বসিবে ? অভাগিনীর হৃৎ-পদ্মাসনে তুমি বসিবে না, নাথ ? আমি যে বড় দুঃখিনী—আমার দুঃখ বুঝিবে না, নাথ ? আমি যে বড় অনাথা—তুমি বসিবে না নাথ ! সেদিন আমার কবে হবে ? (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গীতি-কুঞ্জ।

(১)

তুমি আছ বিশ্ব ছেয়ে,
তোমায় আমি দেখ্‌তে চেয়ে
খুলে আঁখি চেয়ে থাকি—
যায় না দেখ্‌তে পাওয়া,
আমার এই নয়নে তোমার পানে যায় না
সখা! চাওয়া।

সুরে সুরে গানে গানে
বিশ্ব বাঁধা টানে টানে,
সুরের রাণী বিশ্বখানি
সেই গানেতে ছাওয়া।
আমার এই সুরেতে তোমার ও গান যায়।
সখা! গাওয়া।

কোথায় তুমি—তোমায় পেতে
আকুলহৃদয় ছোটে মেতে,
পড়ে উঠে ভূমে লুটে—
শুধুই আমার ধাওয়া।
সুখ-সাগরে হায়রে আমার দুখের তরী বাওয়া॥

(২)

যখন একলা আমি বসে থাকি
আপ্‌নাতে আপ্‌নারে ঢাকি,
তখন অশ্রু-জলে আঁখির পাতা
আমার ভিজে আসে—
সেই জলেতে দেখি সখা! তোমার ওরূপ
ভাসে।

বিশ্ব-আলো ঘনিয়ে এসে
আমার আঁধার মরম-দেশে
উথ্‌লে উঠে—তখন আমার
বয়ান মধুর হাসে—
সেই হাসিতে দেখি সখা! তোমার ওরূপ
ভাসে।

যখন নিভৃত এই হৃদয়-পুরে
বাজে বীণা নূতন সুরে,
তখন পুরাণ সুর নূতন হয়ে
আসে আমার পাশে—
সেই সুরেতে দেখি সখা! তোমার ওরূপ
ভাসে।

(৩)

তুমি নাও গো আমায়
নাও গো কোলে তুলে।
সন্দেহ হয় মনে—বুঝি
আছ আমায় ভুলে।

পিতার দয়া মাতার স্নেহ,
প্রীতি-প্রেমের মধুর গেহ,
কিছুই ত আর নাইকো আমার,
ফুল ঝরেছে গলার মালার—
ছোটটি নাও খুলে।

আর কেন গো আশা তৃষা,
দিন ফুরালো—এলো নিশা,
হল আঁধার, পথ চলা ভার—
ভাস্‌ছি আমি হায়, অকূলে
একলা বসে কূলে॥

(৪)

আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমার যেন
পায়ের সাড়া পাই!
চক্ষু মেলে দেখ্‌তে গেলে
আর ত তুমি নাই!

তোমার পায়ে নূপুর বাজে,
শুন্‌তে তা পাই বুকের মাঝে,
ওঠে তোমার বাঁশীর গানে
কত মূর্চ্ছনাই।
তোমার মধুর বাঁশীর গানে
জাগায় যে গান আমার প্রাণে,
সে গান কি যায় তোমার কানে
তাই তোমায় শুধাই॥

(৫)

আমি যখন শিশু ছিলাম
খেল্‌তে ধূলা-খেলা
আমার কাছে সখা! তুমি
আস্‌তে দুটি বেলা।
এখন তোমার পাই না খুঁজে,
বলিচি কি হায় না বুঝে,
আমার উপর কিরূপ তোমার
এত কেন হেলা?
তখন গলা ধরে হেসে
কইতে কত ভালবেসে
খাইয়ে দিতাম—খাইয়ে দিতে
হ'ত প্রেমের মেলা।
সেদিন গেল—তাই কি গেলে?
শুধাই তোমায় দেখা পেলে
আর কতদিন থাক্‌বো আমি
আড়ি দিয়ে ঠেলা॥

শ্রী দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

তোমার মন্দ আমার ভাল।

(বৈষম্য)

তোমার মন্দ আমার ভাল দেখ্‌তে ভালবাসি,
এটী আমার মনের কথা কাউকে না প্রকাশি;
আমার হবে গাড়ী-ঘোড়া সাইকেল মটর,
আমি যাব চড়ে সদা রাস্তার উপর;
অবাক্ হয়ে চেয়ে থাক্‌বে তুমি আমার পানে,
আমি তখন বুকটা ফুলিয়ে ব'সে রব যানে;
তোমার হবে খোড়ো ঘর আমার হবে কোটা;
তোমার হবে মেয়ের হাট আমার হবে ব্যাটা;
আমার ছেলে কার্ত্তিক হবে ময়ূর চড়ে যাবে,
তোমার ছেলে কাণা-খোঁড়া, পথে হোঁচট্ খাবে;
ঘরের গিন্নি হবে আমার ঘর কর্‌বে আলো,
তোমার বৌটা শাঁকচুন্নি আল্‌কাতরার কালো;
আমার বাটীর সাম্‌নে হেসে ফুলের বাগান,
হাজার হাজার ফুলে আমার উস্‌কে দেবে প্রাণ;
জাতি যুথি বেলা আর শেফালি টগর,
মল্লিকা মালতী কত গোলাপ সুন্দর;
হাস্‌না-হানা রজনীগন্ধ রাত্রিবেলা হলে,
মন মাতান গন্ধে আমার প্রাণটা দিবে খুলে;
সূর্য্যমুখী সূর্য্যপানে প্রাণটা দিয়ে ঢেলে,
সারা দিন্‌টা চেয়ে রবে সকল ফুলকে ফেলে;
বাগানের মধ্যখানে হবে সরোবর,
পদ্মে পদ্মে মধু খেয়ে ভ্রমিবে ভ্রমর;
দূর হতে উঁকি মেরে দিব্য দিবাকর,
প্রেমাবেশে চুলে পড়্‌বে পদ্মের উপর;
অশোক কিংশুক বক নানা জাতি ফুল,
বাগানের শোভা-বৃদ্ধি করিবে অতুল;
বাগানেতে সেতু হবে ঝিলের উপর,
বড় বড় মাছ তার খেলিবে ভিতর;
পরীর হাতে ফোয়ারা-মুখে উঠ্‌বে ফটিক জল,
রবির আলোয় দেখ্‌তে কেমন হইবে উজ্জ্বল;

রাত্রি হ'লে গ্যাসের আলো জ্বল্‌বে বাগানময় ;
চার্‌দিক্‌টা দেখ্‌তে হবে যেন ইন্দ্রালয় ;
এই ত আমার প্রাণের কথা শুন্‌লে ওহে ভাই,
তোমার বেলা এ-সব হ'লে দুঃখে মরে যাই ;
তোমার বাড়ীর সাম্‌নে হ'লে পচা ডোবা সার,
দেখ্‌তে আমি ভালবাসি—আনন্দ অপার ;
আমার হবে শান্তিপুরে করাশডাঙ্গা ধুতি
চমৎকার,
তোমার বেলা ছেঁড়া টানা মোটা ধুতি সার ;
সোণার চশ্‌মা দেব চোখে, সিল্‌কের কোট্‌ গায়,
দশটাকা-দামের জুতা আমার শোভা পাবে পায় ;
মস্‌ মস্‌ করে চলে যাব চেয়ে থাক্‌বে তুমি,
সংসারটা হবে আমার সুখের স্বর্গভূমি ;
ঝক্‌ ঝক্‌ কর্‌বে সোণার বোতাম আমার সুন্দর
গায়,
সোণার ঘড়ি, সোণার চেন শোভা পাবে তায় ;
চাঁপার কলি আঙুলে আমার হীরার আংটী দিলে
ঝক্‌ ঝক্‌ করে জ্বল্‌তে থাক্‌বে দেখ্‌বে
চক্ষু মেলে।
আমি খাব লুচি পাঁঠা চপ্‌ কট্‌লেট,
কোপ্‌তা কোর্‌মা কালিয়া আর পুডিং
যত বেষ্ট ;
ছানার পায়েস রাবড়ী খাবো দুধ কম্‌লা আর,
চেয়ে চেয়ে রস্‌বে খালি জিবটি তোমার ;
রকম রকম চাট্‌নী খাবো—মজা হবে ভারি,
তোমার ভাগ্যে হ'লে আমি দেখতে কি তাই
পারি ?
আমি খাব দাদ্‌খানি তুমি বুক্‌ড়ি চাল,
এই রকমটা হ'লে ভাল, নাই কোন জঞ্জাল ;
আমি খাব রুই কাত্‌লা সকল মাছের সেরা,
তুমি খাবে চুণা পুঁটি ঘিন্‌ ঘিনে ট্যাংরা ;
বর্দ্ধমানের বড় খাজা মিঠে অতিচুর,
আমার ঘরে শোভা পাবে প্রচুর প্রচুর ;
বাগ্‌বাজারে রসগোল্লা তীন নাগের সন্দেশ,
আমার হবে নিত্য আহার থাক্‌বে না-ক ক্লেশ ;
আমি খাব ফজ্‌লী বোম্বাই ল্যাংড়া—
আমের রাজা,
তুমি খাবে দিশী টোকো, নাইকো যাতে মজা ;
তোমার বেলা বন্দোবস্ত বিধির লিপি হবে,
বাসি মুড়ী চালভাজা খেয়ে জান্‌টা তোমার যাবে,
আমি খাব আঙুর পেস্তা আক্‌রোট খোবানী,
তুমি খাবে দিশী খেজুর অন্য নাহি জানি ;
কিস্‌মিস্‌ মনেক্কা আদি ঘড়ায় খেজুর ;
আপেল ল্যাসপাতি খাব প্রচুর প্রচুর,
বেদানার রসে পুষ্ট হব, মুখটা হবে লাল,
উঁচু হয়ে ফুলে উঠ্‌বে দুই ধারের গাল ;
আমি খাব ক্ষীর সর সুন্দর মাখন,
তোমার ভাগ্যে টোকো ঘোল মিল্‌বেনা কখন ;
আমার গেটে রবে দরোয়ান্‌ ভিতরে ঝি চাকর,
তুমি মর্‌বে খেটে খেটে, হয়ে যাবে ফাঁফর ;
আমি হব পাড়ার মোড়ল আমায় ডাক্‌বে সবে,
কোন কথা না কেউ কখন তোমায় জিজ্ঞাসিবে ;
কারো বাড়ী বস্তি হ'লে আমি হব যজ্ঞেশ্বর,
তোমার কথাটি শুন্‌বে না কেউ লবে না
খবর ;
তুমি রবে কোণে পড়ে, আমার হবে বাহার,
এই রকমটা হলে ভাল রীতি দুনিয়ার ;
সকল কাযে আমার নিমন্ত্রণ সবার আগে হবে,
কেউ কখন আমার আগে তোমার মুখ না চাবে ;
বড় বড় লম্বা লম্বা কথা আমি কব,
মুখ বুঝিয়ে রবে তুমি দেখে খুসী হব ;
ঘাঁড় বেঁকিয়ে চুরুট মুখে ধোঁয়া ছেড়ে দেব,
তোমার মুখটা ঢেকে ফেলে মটর চড়ে যাব ;
ঘড়া ঘড়া মধ্যম-মারা'ণ সঙ্গে নিয়ে যাব,

ধনীর পায়ে ধরে পড়ে কলে তা লাগাব ; কেমন করে সমান হতে তুমি চাহ তাই ?
এইত বুঝলে ব্যবসা আমার তোমার সাহস নাই, শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

পূজার কথা।*

(১)

উপক্রমণিকা।

পুরাকালে আমাদের দেশে সুরথ-নামে এক রাজা ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম আমাদিগের দেশে দুর্গা-পূজার প্রচলন করিয়া যান।

আজ কত কত বৎসর হইল, এই বাৎসরিক আনন্দ-সমাগমে আমাদের দেশ পূত ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে! কত দিন হইতে প্রতিবৎসর এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রতি-হিন্দুর ঘরে ঘরে ঢুকিয়া ঢুকিয়া কি অপূর্ব্ব আনন্দময় উৎসবের হিল্লোলে আমাদের সারা বৎসরের ব্যথা-বেদনাগুলি অলক্ষ্যে মুছিয়া দিতেছে! কতকাল হইতে আজ এই অনুরস্ত মাতৃস্নেহ-সুধাপানে ভারতবাসী পরিতৃপ্ত! কিন্তু সকলের মূলে ও প্রথমে সেই কীর্ত্তিমান্ মহাপুরুষের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি!— সুরথরাজার দুর্গোৎসব।

দেবতার ভাষায় অপূর্ব্ব ছন্দে এই কাহিনী-খানি রচিত। পণ্ডিতেরা ভাবে ও ছন্দে উভয়েই বিমুগ্ধ হইয়া যান, ভাষা-অনভিজ্ঞগণ, দুর্ব্বোধ্য হইলেও ইহার অপূর্ব্ব ছন্দো-রাগে আপনা বিস্মৃত হয়—ভাব না বুঝিলেও ভাষার সুরে তাহাদের কর্ণকুহরে কে যে নপ্রাণোন্মাদ-কারী দেবতার আশীর্ব্বাদ অকাতরে ঢালিয়া দেয়। আমরা এই পুণ্য কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে উদ্যত হইলাম।

(২)

বলিয়াছি, পুরাকালে এই সুরথরাজা আমাদের দেশে রাজত্ব করিতেন। তিনি কোন্ রাজ্যের রাজা ছিলেন, তাহা আজকাল ঠিকভাবে জানিবার আমাদের উপায় নাই। কিন্তু তিনি যে একজন নিতান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ও পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাহা শোনা যায় বটে। চিরকাল নিরাপদে ও নির্ব্বিবাদে চলিয়া রাজত্বের শেষভাগে তিনি এক মহা শঙ্কটময় অবস্থায় পতিত হইলেন।

কোলাকার এক ম্লেচ্ছ রাজা হঠাৎ এক দিন আসিয়া তাঁহার সুখের রাজাখানি অধিকার করিয়া বসিল এবং তাহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। আজন্ম রাজভোগে পালিত সুরথ-রাজা হঠাৎ রাজ্যচ্যুত হইয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন এবং কোথায় আশ্রয় লইবেন তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

বিধর্ম্মী, অনাচারী রাজার হস্তে পড়িয়া রাজ্যের সকল পবিত্রতা দূর হইল। অনাচারে দেশ উত্যক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কেবল এক স্থানে ইহার প্রভাব ঢুকিতে পারিল না। মহারাজ সুরথ সেই স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সে এক মুনির আশ্রম।

---

* মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী অবলম্বনে এই পৌরাণিক কথা লিখিত।

সদা-পুণ্যকার্য্যরত, তপঃপ্রভাবশীল মুনি-ঋষিদের আশ্রমে সেকালে নিতান্ত পরাক্রান্ত নৃপতিরও অধিকার ছিল না। তপঃপ্রভাবে তাহারা নিতান্ত শক্তিমান্ শত্রুর হস্ত হইতেও নিজদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেন। মহামুনি মেধসের আশ্রমও এইরূপ তপঃ-সুদৃঢ় ছিল। এই সঙ্কট-সময়ে মহারাজ সুরথ সেই আশ্রমে যাইয়া মুনির শরণাগত হইলেন।

মহামুনি মেধস সমস্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে অতি যত্নে আশ্রমে স্থান দিলেন।

বড়ই সুন্দর সে আশ্রম। জন-কোলাহল সেখানে কাহারও শান্তিভঙ্গ করে না, অথচ শ্রুতি-মধুর পাখিরা ও ভ্রমরের গুঞ্জন নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতার অস্বচ্ছন্দতা দূর করিয়া দিতেছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে শিশির-মাখা শ্যামল বিটপিশ্রেণী কেমন মধুর হাসিয়া উঠে! সন্ধ্যার সিন্দূররাগে গোধূলি-কণিকা-গুলি আবীরের মত কেমন চারিদিকে ছড়াইয়া যায়। জ্যোৎস্নার আলোকে শান্ত রজনীর লতাপাতাগুলি যখন দ্রব হেম-কান্তিতে অভিষিক্ত হইয়া স্বর্গের অপ্সরার মত পবিত্র হাসি হাসিতে থাকে, তখন কাহারও মনে আর এ সন্দেহ আসে না যে, এই পবিত্র আশ্রম স্বর্গেরই একটী মনোরম প্রদেশ কিনা।

কিন্তু এত সত্ত্বেও সুরথ-রাজার মনে এহেন স্থানে আসিয়াও শান্তি নাই। রাজ্য-চিন্তা ও প্রজার চিন্তা তাঁহার নয়ন হইতে আশ্রমের এমন মোহটুকুও আজ সরাইয়া রাখিয়াছে। রাজা কেবলই ভাবিতেছেন, রাজ্যের কথা; হায়, তাঁহার এত সাধের পুণ্যরাজ্যখানি আজ কোন্ অভিশাপে ম্লেচ্ছের অধিকার-মগ্ন। রাজা কেবলি ভাবিতেছেন, প্রজাদের কথা; হায়, কি অভিসম্পাতে আজ তাঁহার এমন সব প্রজা বিধর্ম্মীর হাতে পড়িয়া অনাচার-প্রপীড়িত!

মুনি রাজার মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্তু কিছু কহিতেছেন না, শুধু মনে মনে একটু একটু হাসিতেছেন,—কি ভ্রম!

এইরূপ করিয়া দিন যায়, এমন সময়ে সেই আশ্রমে আর একটী অতিথির আগমন হইল। তাহার নাম সমাধি।

আশ্রমের উপকণ্ঠে সদ্য-আগত সমাধির সঙ্গে প্রথমেই রাজার সাক্ষাৎকার হয়। রাজা কহিলেন, "তুমি আবার কে?"

সমাধি রাজাকে চিনিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন-পূর্ব্বক নিবেদন করিল, "মহারাজ, আমার নাম সমাধি। আমি বৈশ্যের ছেলে, পুত্র-কলত্রের জ্বালায় বাড়ী ছাড়িয়া বনে আসিয়াছি, এইখানে থাকিব।"

রাজা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এ আবার কি ঘটনা! স্ত্রী-পুত্রের জ্বালায় তুমি গৃহত্যাগ করিয়াছ নাকি?"

সমাধি কহিল, "ত্যাগ করিয়াছি কি মহারাজ? তাহারা আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। অর্থই আমার অনর্থের কারণ হইয়াছে।"

রাজা বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন সমাধি বুঝাইয়া কহিল, "মহারাজ, আপনি রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছেন, আর কি রাজ্য আছে? সব অনাচারে ছারখার গিয়াছে। ম্লেচ্ছের সংস্রবে হিন্দু ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব ভুলিয়া গিয়াছে। দেখুন না, আমি আজীবন-কাল এত কষ্ট করিয়া, এত পরিশ্রম করিয়া পরিবার

প্রতিপালন করিলাম, অর্থ উপার্জ্জন করিলাম, এখন এই অর্থের লোভে আমাকেই কিনা তাহারা তাড়াইয়া দেয়।" রাজা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন; বলিলেন, "তবে আর কি? এস, তোমারও যে দশা, আমারও সেই দশা। চল উভয়ে এখন তবে একত্র হইয়া এই শান্তিময় স্থানে বাস করি। এমন সংসারের আর কোন মায়া রাখিয়া দরকার নাই।"

সমাধিও এই কথায় স্বীকৃত হইল। তখন উভয়ে মুনির নিকট যাইয়া অনুমতি লইয়া সেইখানে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন।

দিন যাইতে লাগিল, কিন্তু কৈ? শান্তির দর্শন ত পাওয়া যায় না। রাজা পূর্ব্বের মত রাজ্যের চিন্তা করিয়াই অস্থির, সমাধি তাহার সেই অকৃতজ্ঞ পুত্র-কলত্রের জন্যই পাগল!—কি করিয়া পুনঃ তাহাদিগের দর্শন পাইবেন, কেবল সেই কথাই ভাবিতেছেন।

রাজা একদিন সমাধিকে কহিলেন, "একি আশ্চর্য্য ভাই! সব বুঝিতে পারি, তবু মনটা পরিষ্কার করিতে পারি না। একি প্রহেলিকা?"

সমাধি কহিল, "আমিও তাই ভাবিতেছি। যে-স্ত্রীপুত্র অর্থকে আমার অপেক্ষা বড় দেখিল, তাদের জন্যই আবার মন কাঁদিতেছে!"

রাজা কহিলেন, "কতদিন আর এভাবে কাটাইব? চল, একবার মুনির কাছে যাই। দেখি, তিনি কি বলেন।"

সমাধি সায় দিয়া কহিল, "সেই ভাল।"

তখন উভয়ে মুনির কাছে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মুনি তাহাদিগকে বসিতে বলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মঙ্গল ত? কি খবর?"

রাজা ও সমাধি তখন বিনীতভাবে তাহাদের সমস্যার কথা কহিলেন—"একি প্রহেলিকা? সকলই বুঝিতে পারি, তবু মন প্রবোধ মানে না কেন? সংসার অনিত্য, স্ত্রী-পুত্র অনিত্য, সার মাত্র ভগবানের চিন্তা, কিন্তু তথাপি এই সব অনিত্য সামগ্রীর দিকেই মন এত ঝুঁকিয়া পড়ে কেন?"

মুনি কহিলেন, "এ-সব মহামায়ার খেলা। আগে মহামায়াকে বোঝ, তারপর এ সব বুঝিতে পারিবে।"

রাজা কহিলেন, "মহামায়া কে? তাঁহার স্বরূপ কি? তাঁহার লীলাখেলাই বা কি? এ সব আমাদিগকে বুঝাইয়া বলুন। আমরা ত কখনও তাঁহার কথা শুনি নাই।"

ঋষি মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "শুনিবে কি? তাঁহাকে চিনিতে পারিলে যে, সকল অন্ধকারই দূর হয়। তিনিই হচ্ছেন জগতের আদি, তিনিই হচ্ছেন জগতের জীবন, তিনিই সকল জন্মাইতেছেন, তিনিই বিদ্যারূপে জ্ঞানদান করিতেছেন, আবার তিনিই অবিদ্যারূপে মোহ, মায়া ও মমতায় ফেলিয়া জীবগণকে সংসারাসক্ত করিতেছেন। এই মোহজাল অতিক্রম করিতে হইলে, উপাসনা-দ্বারা তাঁহারই যে তুষ্টি-সাধন করিতে হয়।"

রাজা কহিলেন, "বলেন কি? তবে কি তিনি ও ভগবান্ এক?"

ঋষি কহিলেন, "তা বৈ কি। তিনি যে তাঁহারই শক্তি। শারীরিক ও মানসিক শক্তির সঙ্গে আমাদের যেমন সম্পর্ক, মায়ের

সঙ্গেও ভগবানের তেমনি সম্পর্ক। শক্তি আছে বলিয়াই, আমরা যেমন নানা কাজকর্ম করি, ভগবান্‌ও তেমনি অনন্তশক্তি মায়ের সাহায্যেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার ইচ্ছাতেই সকল হইতেছে। তিনি যখন যোগ-নিদ্রারূপে ভগবানের চক্ষুর উপর বসিতেছেন, তখনই ভগবান্ নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন, সৃষ্টি প্রলয়ে ডুবিয়া যাইতেছে। আবার যখন তাঁহাকে উদ্বোধন করাই আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে, তখন তিনিই আবার তাঁহার চক্ষু হইতে সে মোহ টানিয়া লইতেছেন, আবার সৃষ্টি ফুটিয়া উঠিতেছে। এক-কথায় তাঁহার লীলা-খেলাতেই জগৎ চলিতেছে। জগতের ক্রীড়াকাণ্ড তাঁহারই লীলা-খেলার প্রতিবিম্ব-মাত্র!"

রাজা ও সমাধি স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। কথাশেষে তাঁহারা কহিলেন,"প্রভু, এ অপূর্ব্ব ভারতী অমৃত-সমান। আমরা এই মহাদেবীর লীলা-খেলার কিছু আভাস পাইতে ইচ্ছুক হইয়াছি। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের নিকট কিছু কিছু সে কাহিনী ব্যক্ত করুন। তিনি কখন্ কি-ভাবে জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, সেই কথা বলুন।"

মেধস কহিলেন, "নরবর, আমি সে কথা আজ তোমাদিগের নিকট অবশ্যই বর্ণনা করিব; কেননা উহা তোমাদের নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। তোমরা বিবেক-সম্পন্ন হইয়াও যে মোহ ও মমতা এখন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারিতেছ না, এবং তাহার বিনাশের উপায় যে এই বর্ণনার মধ্যেই নিবিষ্ট রহিয়াছে, একটু চিন্তা করিলেই সে কথা বুঝিতে পারিবে। প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভব যে মহামায়ার কৃপা ছাড়া হয় না, এবং সেই জ্ঞান লাভ করিতেহইলে যে তাঁহার উপাসনা চাই, তাহাই আজ তোমাদিগকে এই বর্ণনা-দ্বারা বুঝাইব। সুতরাং অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।"

এই বলিয়া ঋষি মহামায়ার লীলা-কাহিনী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা নিজ ভাষায় সে কাহিনী পর সংখ্যায় বর্ণনা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায়

প্রাবৃটে উৎসব-দিনে।

প্রাবৃট্-অরুণ বিজলি-আভায়
উদিল পূরব-গগনে।
নিবিড় নীরদ ত্যজিয়া আকাশ
ছুটিল নগেন্দ্র-ভবনে।

হাসিল অবনী, গাহিল বিহগ,
বহিল পবন সঘনে।
লতায় পাতায় কুসুম সুরভি
ফুটিল জীবনে জীবনে।

বরষা সুরসা, শ্যামলা ধরণী,
তটিনী সলীলা যৌবনে
উদ্দাম তরঙ্গে ছুটিছে অধীরা,
ধৌত করি ধরা-পুলিনে॥

আষাঢ়ে শিখিনী প্রফুল্ল-অন্তরে,
নাচিছে পেখম বিথারি।
সুখময়ী ধরা স্নিগ্ধ-হৃদয়া
শান্ত-শীতলা পিয়ারী!

এ হেন সুন্দর শ্যামল ছায়ায়,
হে শিশু কি বলে ডাকিব তোমারে
জীবন-আনন্দ নয়নাভিরাম
কল্যাণ-আলোক বাছারে॥

রঞ্জন করেছ মা-বাপের হৃদি
"রঞ্জিত" নামেতে প্রচারি
ক্ষুদ্র শিশু হতে "মহান্ মানব,"
করুন তোমারে শ্রীহরি॥

দেবতা প্রসাদ সু-অন্ন আত্মিকে
যতনে দিতেছ বাছনি।
দীর্ঘ আয়ু বল তুষ্টি পুষ্টি সহ
চিরদিন হও সুমনি॥

অন্ন-ব্রহ্ম তোরে দিবেন আশীষ
বৃদ্ধি শুদ্ধি হোক্ জীবনে।
শতশত বার চুমি তোর মুখ
ঐহিক আরাম সাধনে॥

শ্রীমনোভবা-রচয়িত্রী।

কবিত্ব-ধ্যানে।

যুদ্ধক্ষেত্রে সমস্ত দিন যুঝিয়া, ত্রিশ জন শত্রুকে হত ও এগার জন শত্রুকে আহত করিয়া, সন্ধ্যার পর সৈনিক তাঁবুতে বসিয়া কবিতা লিখিতেছিল; তাহার মন তখন তন্ময়, দৃষ্টি অবিচল এবং হস্ত লেখনী ধরিয়া সতর্কভাবে অপেক্ষা করিতেছিল।

সৈনিকের বন্ধু তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়া হাস্যোজ্জ্বল-মুখে বলিলেন, "আজ তোমার কৃতিত্বের কথা শুনে ভারি খুসী হয়েছি;—এস আলিঙ্গন দাও—।"

তিনি সবলে তাহাকে বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিলেন, কিন্তু সৈনিক তাহার বক্ষের মধ্যেই ছিন্নমূল নবতরুর মত নিঃশব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল! বন্ধু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—এ কি!

তাহার হাতে লেখা কাগজে কবিতার শেষ চরণ পড়িলেন:—

"মিলন-পরশে মধুর আবেশে
ডুবিব হরষে—

শেষের মিলটুকু আর নাই!—বুঝি কোন্ খানে ডুবিতে হইবে তাহাই খুঁজিতে—সেই স্থান টুকুই মিলাইতে—কবি গভীর সংযমে সমাহিত-চিত্তে ধ্যান-সাগরে ডুবিয়াছিল। অকস্মাৎ বাহ্য স্পর্শের আবেগ-পীড়নে কবির ধ্যানস্থ অন্তর-সংজ্ঞা উগ্র চমকে বেদনাহত ও বিকল হইয়া পড়িয়াছে,—কবি তাই মূর্চ্ছিত!

একদিনে যে একচল্লিশ জন শত্রুকে দুর্দ্ধর্ষ কঠোরতায় হতাহত করিতে পারে, সে এক মুহূর্ত্তে একজন মিত্রের প্রেমালিঙ্গন-স্পর্শে চেতনা হারাইয়া কুসুমকোমলা লতার ন্যায় লুটাইয়া পড়ে—কবিতা-সুন্দরীর অপার্থিব স্নিগ্ধ স্বাদু তন্ময়-রস-পানে!

---

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীমঙ্গলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আন্টনি বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

ইহাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬৩৬ সংখ্যা।	শ্রাবণ, ১৩২৩। আগষ্ট, ১৯১৬।	১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

শীলা।

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বৈকালে মিসেস্ ব্যানার্জির বাড়ী লোকে পরিপূর্ণ। তিনি সে-দিন তাঁহার পরিচিত বন্ধুদের "চা"তে নিমন্ত্রণ করেছেন। শীলা সারাদিন তাঁহার গৃহকর্ম্মের সাহায্য করিয়া এখন আসিয়া ড্রইংরুমে বসিয়াছে। প্রভাত-চন্দ্র, সুব্রত ও বেলা অনেকক্ষণ আসিয়াছেন। বেলা শীলাকে নিজের কাছে ডাকিয়া লইয়া নানাপ্রকার কথায় ব্যস্ত রাখিয়াছেন, মাঝে মাঝে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি আসিয়া নূতন অভ্যাগত-দিগের সহিত শীলার পরিচয় করাইয়া দিতেছেন, এমন সময় মিসেস্ লরি আসিলেন। তিনি সকলকার সঙ্গে কথাবার্ত্তা করিয়া শীলাকে লইয়া গল্প করিতে লাগিলেন। বেলা দেখিল মুস্কিল—বেচারী সুব্রত একপাশে দাঁড়াইয়া আছেন। তখন তিনি শীলাকে বলিলেন, "এইবার তুমি গান গাও"। শীলা হাসিয়া বলিল, "আমি বুঝি রোজ গান গাব? তা' হবে না। আজ আপনি করুন।"

বেলা। তা কি করে হয়? এত লোকের সাম্‌নে কি আমি গান কর্ব্বার উপযুক্ত! আমি তোমাকে আমার গান শোনাব, সে জন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না। কালইত আবার আমাদের বাড়ী আস্‌ছ। তোমায় 'তুমি' বলিলাম—কিছু মনে কোরো না ভাই। তোমায় দেখ্‌লে আমার নিজের ছোট বোন্ বলে মনে হয়। তুমি যদি

আমার ছোট বোন হ'তে, তা'হলে বেশ ভাল হত না?

শীলা। এখন তাই মনে করুন, তা হলেই বেশ হবে।

বেলা। আমার ত তাই ইচ্ছা—তুমি আমার ছোট বোন্ হও।

শীলা দ্বারের দিকে চাহিয়াছিল, দেখিল—সুপ্রকাশ প্রবেশ করিলেন। এবেলা তাঁহার পরিচ্ছদ অন্য-প্রকার; যদিও মহামূল্য নয়, কিন্তু বেশ পরিষ্কার। তাঁহাকে দেখিয়া তাহার মুখমণ্ডলে মুহূর্ত্তের জন্য রক্তিমাভা খেলিয়া গেল। শেষ কথার উত্তর না পাওয়াতে বেলা ফিরিয়া এই অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া শীলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কে? নূতন দেখ্‌ছি"?

শীলা। ইনি 'মিঃ সুপ্রকাশ রায়'।

বেলা চমকিত হইয়া বলিল, "সুপ্রকাশ রায়;—তোমার সঙ্গে আলাপ আছে বুঝি। এখানে আলাপ হয়েছে, না পূর্ব্বের পরিচয়?"

শীলা। এখানে এসেই হয়েছে। মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সহিত ত বেশ আলাপ আছে।

সুপ্রকাশ গৃহে প্রবেশ করিলেন দেখিয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জি আনন্দের সহিত বলিলেন, "এই যে সুপ্রকাশ; এসো, তোমার সঙ্গে সকলকার আলাপ করে দি।" সুপ্রকাশ তাঁহার দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিলেন,—যেন কি কথা তাঁহাকে জানাইলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার উত্তর দিলেন, "আচ্ছা, সকলকার সঙ্গে না পরিচিত হও, দু'-এক জনের সঙ্গেত হবে; এসো, প্রভাতের সঙ্গে আলাপ কর"।

সুপ্রকাশের সঙ্গে প্রভাতচন্দ্রের আলাপ হইয়া গেল। তাঁহারা দুজনে এ-দিক ও-দিকের কথাবার্ত্তায় মগ্ন হইলেন। সুপ্রকাশের সুন্দর শ্রীসম্পন্ন মুখের ভাব সকলেরই চক্ষে ভাল লাগিয়াছিল। সে ঘরে তাঁহার মত শ্রীসম্পন্ন কেহই ছিলেন না। মুখে কেমন একটা উদার ভাব অঙ্কিত যে, সকলের চক্ষেই তাহা ভাল লাগিতেছিল।

আলাপাদির পর বেলা সুব্রতকে বলিলেন, "যাও না, নিজে গিয়ে শীলাকে পিয়ানোর কাছে নিয়ে যাও, গান গাইতে বল।" তাহা শুনিয়া সুব্রত ধীরে-ধীরে শীলার কাছে গিয়া বলিলেন, "আপ্‌নি অনুগ্রহ করে একটি গান গাইবেন আসুন"। শীলা কি করিবে বুঝিতে পারিতেছিল না। বেলা ইতাবসরে মিসেস্ ব্যানার্জ্জির নিকট গিয়া গান-গাওয়ার কথা বলিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি শীলার কাছে আসিয়া বলিলেন, "যাও মা, গান কর, সকলেই তোমার গান শুন্‌তে চান।" শীলা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিল এবং আবার তাহার দৃষ্টির সহিত সুপ্রকাশের দৃষ্টি মিলিল; ইহাতে তাহার অন্তরে যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল। সুব্রত গিয়া বাজনা খুলিয়া দিলে শীলা বাজাইবার জন্য বসিয়া বলিলেন, "আপ্‌নি গান করেন না?"

সুব্রত। না, আমি গান-বাজনা করি না। ও সখ আমার নাই, আর পারলেও আপ্‌নার সমকক্ষ কে হ'বে?

শীলা। ও-কথা বল্‌বেন না; এত লোক আছেন, এঁরা কি কেহই বাজাতে পারেন না?

সুব্রত। বৌদিদিত এই নূতন শিখ্‌ছেন। তা যে লজ্জা—আমাদের সামনেই গান করেন

না, তা এত লোকের সাম্‌নে কি গাইবেন? এইবার আপ্‌নি গান করুন।

শীলা অন্যমনস্কভাবে বাজনায় হাত দিলে, সে-হস্তের স্পর্শে বাজনার বক্ষ যেন কাঁপিয়া উঠিল। তারপর সে নিজের মনে কিয়ৎক্ষণ বাজাইয়া গেল ও শেষে গান ধরিল—

"নদীর কূলে আপন মনে
বসিয়াছিনু একা,
কখন্ সন্ধ্যা নেমে এল,
যায় না পথ দেখা।
আঁধার হল বিজন পথ,
ফিরতে হ'বে ঘরে,
পথ জানি নে, কি হবে তাই
ভাসি নয়ন-নীরে।
কোথায় আলো? আঁধার কালো
দূর করিয়া দাও,
আঁধারে একা, পথ দেখায়ে
সাথে করে লও।"

সুপ্রকাশ মন্ত্রমুগ্ধের মত নিকটে বসিয়াই এই সঙ্গীত শুনিতেছিলেন,—সঙ্গীত-সুধা তাঁহার অন্তর পূর্ণ করিতেছিল। গান শেষ হইবার পর সকলেই বলিলেন, 'আবার একটি গান করুন।'

সুব্রত বলিলেন, "কি সুন্দর আপ্‌নার কণ্ঠ! আপ্‌নার গান শুন্‌লে জীবন ধন্য হয়।"

শীলা ফিরিয়া চাহিল—দুইটি আনন্দোজ্জ্বল চক্ষুর দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হইল। সুপ্রকাশ তাহার গান শুনিয়াছেন, প্রীত হইয়াছেন, ইহা জানিয়া লজ্জায় তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সুব্রত এ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। তাঁহার হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সকলে শীলাকে পুনরায় গাহিতে বলায় শীলা বলিল, "না আমি আর গাহিব না; আর কি কেহ গান জানেন না?"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি হাসিয়া বলিলেন, "সুপ্রকাশ, তুমি ত বেশ গাইতে পার; তুমি গাও না।"

সুপ্রকাশ বিনা বাক্যব্যয়ে বাজনার কাছে গেলেন, কাজেই সুব্রতকে সরিয়া যাইতে হইল। শীলা উঠিয়া পার্শ্বের আসনে বসিল।

সুপ্রকাশ বাজনায় হাত দিলেন। বাজনা যখন বাজিয়া উঠিল তখন সকলেই চমকিত হইলেন এবং বুঝিলেন, যিনি এ-প্রকার বাজাইতে পারেন, তাঁহার অসাধারণ শক্তি আছে। বাজনার সহিত গানও আরম্ভ হইল। গানে সকলের হৃদয় আন্দোলিত হইল, সকলের হৃদয়ে যেন সেই সুর কম্পিত হইতে লাগিল—

"কেগো আমায় ভুলাও তুমি
বল অমন করে?
মন যে আমার মানে না-ক,
থাকে নাক ঘরে!
কিসের আশে কাহার লাগি
হতে চায় সর্ব্বত্যাগী,
কোন্ বাঁশীর ধ্বনি শুনি
আকুল অন্তরে!
ছুটতে চায় কাহার পানে,
কে তাহারে এমন টানে?
কোন্ যন্ত্রী প্রাণের তন্ত্রী
বাজায় এমন করে?—
আকুল প্রাণে পাগল হয়ে
ছুটে তারি তরে॥"

সুপ্রকাশ গানটী কয়েকবার গাহিয়া শেষ করিলেন। গান শেষ করিয়াই প্রথমে শীলার

দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল; শীলা সে নয়নের দৃষ্টিতে নূতন ভাষা প্রকাশিত দেখিল। শীলা কণ্ঠস্বরেই বুঝিয়াছিল যে প্রথম যে-দিন সে আসে, সে-দিন গবাক্ষ হইতে ইঁহারই কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিল।

"ঘরে বড় গরম বোধ হতেছে না?" শীলা বলিল, "কৈ—না।"

সুব্রত। এই জানালার ধারে আসুন না, বেশ খোলা আছে।

শীলা উঠিয়া দাঁড়াইল। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি সুপ্রকাশকে বলিলেন,"তোমার গলা যে আরও মিষ্টি হয়েছে"।

বেলা প্রভাতচন্দ্রকে বলিল, "যে রকম গলা, বোধ হয় থিয়েটারের দলের লোক হবে। বাজনারও ভঙ্গি দেখ্‌লে ত?"

প্রভাতচন্দ্র। কে জানে, কোথাকার কে? মাসীমাও সবাইকে ডেকে জড় কর্ব্বেন; ওঁর উঁচু নীচু বাচ্‌-বিচার নেই।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি আর একজনের সঙ্গে সুপ্রকাশের পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহার নাম—মিঃ মল্লিক; তিনি কলিকাতায় প্র্যাক্‌টিস করেন। সম্প্রতি তাঁহার স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য কটকে বায়ু-পরিবর্ত্তন করিতে আসিয়াছেন। তিনি সুপ্রকাশকে বলিলেন, "আপনি মিঃ রায়ের কাজ-কর্ম্ম দ্যাখেন? মিঃ রায়ের ত মস্ত জমিদারী, সম্প্রতি খরচও ঢের। তাঁর ত সে কেস্‌টার ঢের খরচ হয়ে গেছে, তাঁর নামেও বদ্‌নাম বেরিয়েছে।" সুপ্রকাশ একবার মিসেস্ ব্যানার্জ্জির দিকে চাহিলে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি মুখ ফিরাইয়া লইলেন। সুপ্রকাশ বলিলেন, "আমার ও-সব সংবাদে-কাজ কি ম'শায়? আমি বেতন-ভোগী কর্ম্মচারী, আমার কাজ নিয়ে থাক্‌লেই হল।"

মিঃ মল্লিক। এখানে কি কাজ দেখ্‌ছেন? এখানেও কি জমিদারী আছে? লোকটি দেখ্‌ছি ধনকুবের। যে দিকে যাও, সেই দিকেই জমিদারী। অমন মক্কেল যোগাড় হলে আর ভাবনা নাই। আপনার কি কাজ?

সুপ্রকাশ। জমিদারীও দেখ্‌ছি, আর তাঁর এখানকার বাড়ীটাও মেরামত করাচ্ছি।

মিঃ মল্লিক। কেন, কল্‌কাতার বাড়ী?

সুপ্রকাশ। সে ত আছে। কটকের জল-বাতাস ভাল, আর তাঁর এ-দিকেই বেশী জমিদারী, তাই এখানকার বাড়ী মেরামত হচ্ছে।

মিঃ মল্লিক। এখন তিনি কোথায় আছেন?

সুপ্রকাশ। তা'ত জানিনা। তাঁর এটর্ণী ঘোষের কাছে চিঠি দিলে উত্তর আসে।

মিঃ মল্লিক হাসিয়া বলিলেন, "তিনি বুঝি এখনো লজ্জায় অজ্ঞাত-বাস কচ্ছেন; —অদ্ভুত লোক!"

সুপ্রকাশ অন্য-দিকে চলিয়া গেলেন।

শীলা বাতায়ন-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল; সুব্রতও গভীর-মনোযোগ-সহকারে সব শুনিয়াছিলেন। সুপ্রকাশ চলিয়া যাইবার পর তিনি শীলাকে বলিলেন, "মিস্ মিত্র, আপ্‌নাকে একটি অনুরোধ কচ্ছি। আপ্‌নি ভাল করে না জেনে, পরিচয় না পেয়ে ঐ অপরিচিত ব্যক্তির সহিত বেশী ঘনিষ্ঠতা কর্‌বেন না। এতে আপ্‌নার সুনামের হানি হবে।"

শীলা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বলিল, "কোন্ অপরিচিত ব্যক্তির কথা বল্‌ছেন?"

সুব্রত। কেন?—সুপ্রকাশ রায়। তাঁর সহিত আপ্‌নার মেলা-মেশা ভাল নয়।

শীলা গম্ভীর-ভাবে বলিল, "কি ভাল, কি মন্দ সেটা কি বুঝ্‌বার আমার নিজের ক্ষমতা নেই? আপ্‌নার এ বিষয়ে কিছু না বল্লেই ভাল হ'ত।"

সুব্রত। আমার বল্‌বার আবশ্যকতা আছে বলেই বল্লাম্। আশা করি, আমার কথা রাখ্‌বেন। ভবিষ্যতে সুপ্রকাশ রায়ের সহিত মিশ্‌বেন না।

শীলা "আপ্‌নার সুপরামর্শের জন্য ধন্যবাদ।"—এই বলিয়া অবজ্ঞার ভাবে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। সুব্রত বেলার নিকট গিয়া বলিলেন—"বৌদি! কখন বাড়ী যাবে? আমার আর ভাল লাগ্‌ছে না।"

বেলা। চল না এইবার যাই। মাসী-মাকে বলে আসি। শীলা কোথায় গেল? ব্যাপার কি?

সুব্রত বিরক্তভাবে বলিল—"ও ধারে কোথায় আছেন আমি জানিনা। তুমি দাদাকে ডাক; আমি বাড়ী যেতে চাই, আমার শরীর ভাল লাগ্‌ছে না।"

বেলা দেখিলেন সুবিধার কথা নহে। তিনি উঠিয়া গিয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জির নিকট বিদায় লইয়া আসিলেন ও প্রভাতচন্দ্রকে ডাকিয়া আনিলেন। তখন গৃহের ভিড় কমিয়া আসিয়াছে। অনেকেই গৃহে ফিরিয়াছেন, কেহ কেহ ফিরিতেছেন। তাঁহারাও বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

সকলের শেষে শীলা যখন বাটী ফিরিতে ব্যস্ত হইল তখন মিসেস্ ব্যানার্জ্জি সুপ্রকাশকে বলিলেন, "গাড়ী আন্‌তে বলে দাও। এখন তুমি যেওনা। একটু থাক, পরে যেও।" সুপ্রকাশ উঠিয়া গাড়ী আনিতে বলিতে গিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখিলেন যে সে গৃহে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি নাই, শুধু শীলা রহিয়াছে। তাঁহার অন্তর মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চল হইল, মুহূর্ত্তের জন্য যেন অন্তরের ভাষা অধর-প্রান্তে আসিয়া মিলাইয়া গেল। তারপরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "আপনি একলা! মিসেস্ ব্যানার্জ্জি কোথায় গেছেন?"

শীলা। অমির জন্য কিছু লজেন্স আন্‌তে গেছেন।

সুপ্রকাশ। আজ্‌কার দিন কি সুখেই কাট্‌ল। এদিনের কথা চিরকাল স্মরণ থাক্‌বে। আবার আপ্‌নার সঙ্গে কবে দেখা হবে কে জানে?

উভয়েই কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর রহিলেন। তারপর সুপ্রকাশ পুনরায় বলিলেন, "খুব সম্ভব আমি শীঘ্রই চলে যাব; যা'ইহোক, যদি আর দেখা না হয় তবু আজ্‌কার দিনের কথা কখনও ভুল্‌ব না।" এই সময় মিসেস্ ব্যানার্জ্জি কাগজে করিয়া কতকগুলি লজেন্স লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সস্নেহে শীলাকে গাড়ী-পর্য্যন্ত তুলিতে গেলেন। সুপ্রকাশ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মনের ভিতর যেন সমুদ্রের তুফান ছুটিতেছিল। যে জীবনে কোন আগ্রহ বা কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না, যে জীবন শূন্য মরুর ন্যায় ছিল, আজ সেই জীবনে এত আকাঙ্ক্ষা, এত সাধ কেন? তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে, এ আকাঙ্ক্ষার শেষ কি হবে! শীলার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন সে তাঁহার হৃদয়ের ভাষা বুঝিয়াছে। যদি সে বুঝিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কি তাঁহার অপরাধ-পূর্ণ জীবনকে লইবে? কে জানে? ভাগ্যনির্ণয়ের আর সময় নাই। স্রোতের মুখে তৃণের মত তাঁর মনের সকল বাধা ভাসিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজ কুমারী দেবী।

পৈশিক ব্যায়াম।

শরীরের পৈশিক ক্রিয়া যে নিয়ম-দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে, পৈশিক ব্যায়ামও তাহার অনুকূল হওয়া চাই। ইচ্ছাশক্তি-দ্বারা পরিচালিত না হইলে ব্যায়াম মানবের কোনও-প্রকারে ফলপ্রদ হইতে পারে না। ব্যায়াম-মাত্রই মানবের শক্তি ও বয়সের অনুযায়ী হওয়া চাই। ব্যায়াম করিতে হইলে এমন কতকগুলি ক্রিয়া নির্ব্বাচিত করা উচিত যদ্দ্বারা পেশীগুলি সম্যক্ সঞ্চালিত হইতে পারে।

পেশীমণ্ডলের সঙ্কোচন-শক্তির উপর মনের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। মস্তিষ্কে যে মুহূর্ত্তে ইচ্ছা প্রতিভাত হয়, অমনি তাহা তড়িৎ-গতিতে স্নায়ু-নিচয়ের মধ্যদিয়া পেশীমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ পেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া ক্রিয়াশীল হয়। কোন কোন পেশীতে তন্তুর ও কোন কোন পেশীতে স্নায়ুর বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ এই—যেখানে যেরূপ আবশ্যক সেখানে সেরূপটী দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে-স্থানে তন্তুর ভাগ কম সে-স্থানে স্নায়ুর বাহুল্যতা-নিবন্ধন সে অভাব পূর্ণ হইয়াছে। তন্তুবাহুল্যে পেশীর ওজন-বৃদ্ধি এবং স্নায়ুবাহুল্যে শক্তি-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ আমরা পক্ষীতে বিশেষরূপে দেখিতে পাই। যদি মাংস-তন্তুর বৃদ্ধি হওয়াতে অধিক শক্তির সমাবেশ হইত, তবে গুরুত্বের বৃদ্ধি-নিবন্ধন পক্ষিগণ অনায়াসে আকাশে উড্ডীয়মান হইতে পারিত না। কারণ, গুরুত্ব ও বলের পরিমাণ সমান হওয়াতেই আকাশ-মার্গে গতির অসুবিধা হইত। বৃহদাকার মৎস্যগণ অনায়াসে জলে ভাসে। তাহাদিগের গুরুত্ব জলে অনায়াস-সঞ্চরণে অসুবিধা ঘটাইতে পারে না। কারণ, মৎস্যের বল স্নায়ু-সন্নিবেশের উপর নির্ভর করে না কিন্তু পেশীর আয়তনের উপর নির্ভর করে।

ইচ্ছা-দ্বারা পরিচালিত হইলে পেশীমণ্ডল অত্যন্ত পরিশ্রমেও অল্প ক্লান্তি অনুভব করে। মানসিক উত্তেজনা না থাকিলে মানব শীঘ্রই শ্রান্ত হইয়া পড়ে। শিকারী-মাত্রকেই দেখিবে যে, তাহারা কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া শিকারের অনুসরণ করিলেও শীঘ্র ক্লান্ত হয় না; কিন্তু তাহার ভৃত্য অতি সহজেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে, শিকারীর মনে উত্তেজনা আছে বলিয়াই সে ক্লান্ত হয় না, কিন্তু উত্তেজনার অভাবে ভৃত্য শীঘ্রই শ্রান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই শিকারীই কয়েক ঘণ্টা শিকারের অনুধাবন করার পর যদি শিকারকে আয়ত্ত করিতে না পারে, তবে হতাশ হইয়া ক্লান্তি ও দৌর্ব্বল্যের বশীভূত হইয়া পড়ে। এরূপ ক্লান্ত অবস্থায়ও যদি সে পুনরায় শিকারের দেখা পায়, তবে তাহার শরীরে নব বল ও উৎসাহের আবির্ভাব হয়; তখন সে ভীম-বিক্রমে শিকারের অনুসরণ করে। রুসিয়া হইতে ফরাসী সৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তনকালে ঠিক অনুরূপ ঘটনাটী ঘটিয়াছিল। শত্রু নিকটে না থাকিলে ফরাসী সৈন্যগণ স্ব-স্ব অস্ত্র-বহনেও অসমর্থ হইত; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শত্রুর তোপধ্বনি তাহাদিগের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইত অমনি তাহারা যেন নব-বলে বলীয়ান্ হইয়া অধিক শক্তির সহিত

অস্ত্র-চালনা করিত। শত্রু পলায়ন করিলে পুনরায় তাহারা দৌর্ব্বল্য-কর্ত্তৃক অভিভূত হইত। এই জন্যই রোগ-পরিমুক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যোন্নতি-কল্পে অশ্বারোহণ-কালে যদি চিত্তরঞ্জক গল্প বা মনোহর বার্ত্তালাপ প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার মনে শক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে এবং তাহার দুর্ব্বল শরীর সেইরূপ অশ্বারোহণে লাভবান হয়।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ব্যায়াম করিতে হইলে যেমনই স্নায়বিক উত্তেজনার আবশ্যক তেমনই মানসিক উত্তেজনারও প্রয়োজন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এ বিষয়টী লোকে ভালরূপ বুঝে না এবং উক্ত-নিয়মানুযায়ী কার্য্য করে না। পেশীগুলি মনের আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। ব্যায়ামকে ফলপ্রদ করিবার জন্য মনের স্বাস্থ্য ও উত্তেজনার বিশেষ আবশ্যক। পৈশিক ক্রিয়া যদি মানসিক উত্তেজনা-দ্বারা সম্পাদিত হয় তবে কে না আনন্দ অনুভব করে? যুবকের স্বাধীন ব্যায়াম এবং বন্দীর বিমর্ষময় ও অপরিবর্ত্তনশীল ব্যায়ামের কি পার্থক্য নাই? বালকের স্ফূর্ত্তির কুর্দ্দন ও বন্দীর বিমর্ষপূর্ণ কার্য্যের তুলনা কর, বুঝিতে পারিবে যে, পার্থক্য কত। তখন দেখিবে যে, কয়েদী নড়িতেছে চড়িতেছে বটে, কিন্তু ব্যায়ামের জন্য নহে। বলা বাহুল্য যে ব্যায়ামের মধ্যে কোনটী স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর, কোনটী চর্ম্মের সুষুপ্ত-শক্তিকে জাগরিত করে, কোনটী রক্তের আলা অপসৃত করে, কোনটী শরীর বলবান্ করে, এবং কোনটী শোণিতকে পরিষ্কার ও সৌন্দর্য্যের আভাকে পরিস্ফুট করে। ব্যায়ামের হিতকর মন্ত্র মনে নিহিত আছে; তাহা ব্যতীত ব্যায়াম ব্যায়ামই নহে। সে মন্ত্র—মানসিক উত্তেজনা।

ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই মনের সাহায্য-ব্যতিরেকে ব্যায়াম করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের কোন ফলোদয় হয় না। উদ্দেশ্যহীন ব্যায়াম নিষ্ফল। কিন্তু যদি ছাত্রদিগের মস্তিষ্কে উদ্ভিদ্বিদ্যা বা কোন ভূতত্ত্ব-বিষয়ক উদ্দেশ্য প্রবেশ করে, তবে তাহাদিগের উত্তেজনাহীন ভ্রমণ লম্বা লম্বা পাদ-বিক্ষেপে পরিণত হইবে এবং তাহার চক্ষু ও গণ্ডদেশের বর্ণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মানসিক উত্তেজনার উদ্রেকে মন ও পেশী ঐকাতানে কার্য্য করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধান করে।

ইহাতে কেহ যেন না বুঝেন যে, ব্যায়ামের জন্য কেবলমাত্র ভ্রমণ হিতকর নহে। রোগ-দ্বারা প্রতিষিদ্ধ না হইলে সকলেরই উন্মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম করা উচিত। যদি তাহা মানসিক উত্তেজনা-দ্বারা পরিচালিত হইয়া করা যায় তবে আরও উত্তম, নতুবা ভ্রমণ এরূপ ক্ষিপ্র হওয়া চাই যেন ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে থাকে এবং রক্ত-সঞ্চরণ উত্তমরূপে হয়। ব্যায়াম করিতে হইলে পরিচ্ছদ ঢিলা হওয়া উচিত, যেন তদ্দ্বারা হস্ত-পদের ক্রিয়ার কোনরূপ প্রতিবন্ধক না হয় এবং বক্ষের অবাধ বিস্তৃতি সাধিত হয়।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী,

নরহি—লক্ষ্ণৌ।

দ্রৌপদীর প্রতি ভানুমতী।

বরষা বিগতে যথা বিকশিত কাশ
হেরি কৃষ্ণা-মুখ চারু, উৎফুল্ল-আননা
হর্ষ-কৃতজ্ঞতা-ভরে গদ-গদ ভাষ,
কহে কুরুরাণী,—বাজে বসন্তের বীণা!—

"অসীম বাসনবারি, না হেরি নিস্তার,
ডুবিল অতলে বুঝি অসহায় তরী,
নাহিক নাবিক, কেহ না জানে সাঁতার—
উদ্ধারিলা নিজ-গুণে ধর্ম্ম-অধিকারী।

"সদাকাল ধর্ম্মরাজ সদয়-হৃদয়,
নাহিক তিলেক রোষ অরাতি-উপর;
সুমেরুর সম স্থির, চির-হাস্যময়,
শত ঝঞ্ঝাবাত, তবু অটল নির্ভর।

"যে দিন সকল ছাড়ি ধর্ম্ম নরমণি
প্রবেশিলা বনবাসে বাকল-বসনে,
স্মরি সে মলিন মুখ ক'ওনা ভগিনি!
কাঁদিয়াছি শোকাতুরা-শ্বশ্রূদেবী-সনে।

"বড় সাধ ছিল মনে শুনিতে আবার
ও মুখের সুধামাখা, স্নেহময়-বাণী;
কিন্তু তাহে নিহিত যে কঠোর পাষাণ!—
সহে বা রমণী-প্রাণে পতি-অপমান;—
পতি-নিন্দা শুনে সতী ত্যজেছিল প্রাণ।

"ধন্য ও কঠিন হিয়া, দেখিয়াছে দাঁড়াইয়া
কৌরব-সভায় ধর্ম্ম আনত-বয়ান,
নত পার্থ ধনুর্দ্ধর, ক্রোড়ে শুষ্ক বৃকোদর
নতশির ফণি যথা মন্ত্রের প্রভাবে;—
নাহিক ক্ষমতা বল দেখাতে কৌরবে।

কোমল কুসুমে বিধি গঠিল রমণী-হৃদি!—
সে অবধি পিপাসিত নয়ন আমার
হেরিতে আনন্দদায়ী বদন তোমার।

পবিত্র কানন-ভূমি পবিত্র-পরশে
অধিক পবিত্র হয়ে উঠেছে উজলি।
কি কাজ মুকুতা-মণি-মরকত-বাসে,
ভক্তি-ডোরে বাঁধা যাঁর নিজে বনমালী?

প্রেমময়ী অন্নপূর্ণা গৃহলক্ষ্মী যাঁর—
কানন অমরাবতী; কি দুঃখ তাঁহার?
নিবাস করেছ বুঝি তোমরা এ বনে
এ বিপদে উদ্ধারিতে আমা সবাকায়
কি আনন্দ আজি দেবি! উথলে পরাণে
হৃদিভাব প্রকাশিতে না পারি ভাষায়।
তোমারি করুণা-বশে বাঁচে কুলমান,
স্বামী মম অপরাধী—ক্ষমা কর দান॥

শ্রীইন্দিরা দেবী।

ভানুমতীর প্রতি দ্রৌপদী।

শুনি ভানুমতী-বাণী সুচারু-হাসিনী,
আনত কুরঙ্গ-নেত্র আত্ম-প্রশংসায়,
কহিলা মধুর ভাষে মধুর-ভাষিণী—
মোহন বাঁশরী-ধ্বনি শারদ নিশায়!—

"কুরুরাজ-প্রিয়তমে! কি-হেতু মিনতি?
চির-স্নেহময়ী তুমি, তাহা কি জানি না আমি?
পর-দুঃখে সদা দেবি, তব দুঃখমতি।

"যে-দিন প্রথম দেখা তোমায় আমায়
কত যত্নে নৃপবালা, নিজ-হাতে গাঁথি মালা,
'বনদেবী' বলে হেসে সাজালে আমায়!

"ছিল সাধ পুনঃ তোমা' হেরিতে ভগিনি!
চিরদিন রমাপতি সদয় দাসীর প্রতি—
মিলালেন বন-মাঝে কুরু কুলেন্দ্রাণী।

"দিবানিশি মাতুলের পাপ-মন্ত্রণায়*
আত্মগর্ব্বে দুর্য্যোধন হারায়েছে জ্ঞান,
কার (ও) উপদেশ-বাণী শুনিতে না-চায়;—
কমলে কণ্টক দেবি! বিধির বিধান।"

স্মরিতে সে-সব কথা উত্তেজিত মন,
আরক্ত আনন-ছবি। আপনা সম্বরি দেবী
কহিলা রাণীরে পুনঃ সস্মিত-আনন—

"পুরাতন কথা এবে কথনে কি কাজ?—
আমার অতিথি আজি কুরু অধিরাজ!
যথাবিধি অতিথিরে, যে জন না পূজা করে
চিরদিন বাস তার নিরয়ের মাঝে।
গৃহীর পরম ধর্ম্ম অতিথি-সেবন,
কর দেবি, আজি মোর আতিথ্য গ্রহণ।"

শ্রী ইন্দিরা দেবী।

নির্য্যাত।

(গল্প)

ষোল বছর আগেকার কথা। আমি তখন জাহানাবাদ পুলিসের সব্-ইন্‌স্‌পেক্টার। কোনও সরকারী কাজে আমায় পুরী যাইতে হয়। জীবনে এই আমার প্রথম সমুদ্র-দর্শন, তাই কাজ শেষ হইয়া গেলেও গড়িমাসি করিয়া ফিরিবার দিন পিছাইতে ছিলাম। হাতেও তখন বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় কাজ ছিল না।

তখন বোধ হয় গ্রীষ্মকাল। পুরীতে চির-বসন্ত বিরাজমান, সমুদ্রের বাতাসে গ্রীষ্ম-তাপ অনুভূত হয় না। সে দিন,—যেদিন কর্ম্মস্থলে ফিরিব তাহার পূর্ব্বদিন—বৈকালে সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে সমুদ্রের একটা নির্জ্জন অংশে কখন গিয়া পড়িয়াছিলাম! সাগর-বক্ষে তরঙ্গের পর তরঙ্গের উচ্ছ্বাস, বেলাভূমি-প্রহত সেই চঞ্চল উদ্দাম নৃত্য তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলাম। সূর্য্য ডুবিয়া কখন যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল, জানিতেও পারি নাই। সমুদ্রের পানে চাহিয়া বুঝি কোন্ অকূল-সমুদ্রের কথা মনে পড়িয়াছিল!—সেও যে এমনি সীমাহারা সন্ধিহারা, বুঝি এমনি অতল-স্পর্শ, তাহা তলাইয়া দেখিতে সাহস হয় নাই কেমন করিয়া সে অকূল সাগরে পাড়ী দেওয়া যায়। তাহারই একটা সহজ কৌশল ভাবিয়া দেখিতেছি, এমন সময় পিছন হইতে কোমল নারীকণ্ঠে বলিতে শুনিলাম—"কি সুন্দর!"

বিস্ময়-বোধের সঙ্গে-সঙ্গে ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। আমারই পার্শ্বে হাত-কয়েক দূরে এক কিশোরী বা বালিকা তাহার প্রশস্তমান-দৃষ্টি সমুদ্রের উপর ন্যস্ত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে যে স্তুতিবাণী উচ্চারণ করিয়াছিল তাহা হৃদয়োত্থিত অকৃত্রিম আনন্দের অভিব্যক্তি।

আমি অবাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম। জীবনে এমন ছবি এমন করিয়া আর কখনও দেখি নাই। এমন নির্জ্জন সন্ধ্যায় সম্পূর্ণ-অপরিচিত পুরুষের পার্শ্বে একা দাঁড়াইতে সে ভয় পায় নাই, সঙ্কোচ বা কুণ্ঠাও তাহার ছিল না অনেকক্ষণ নীরবেই কাটিয়া গেল। একসময় মুগ্ধদৃষ্টি সাগরবক্ষ হইতে না ফিরাইয়াই সে যেন স্বপ্নাভিভূতের ন্যায় কহিল, "কি চমৎকার! এমন আর কিছু দেখেছেন্ কি ?"

আমি কহিলাম, "না"। কিন্তু কাহার উদ্দেশ্যে সে স্বীকৃতি, তাহা নিজেও তখন বলিতে পারিতাম না কারণ, আমার মুগ্ধদৃষ্টি তাহারই সরল মুখের উপর বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা থাকিলেও ফিরাইতে পারিলাম না। তারপর অনেকক্ষণ আর কোন কথাই হইল না। সে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল, আমি তাহাকেই দেখিতেছিলাম তাহাকে যুবতী বলা যায় না, বালিকাও সে নয়;—বাল্য ও যৌবনের মধ্যগত সন্ধিস্থলে সে দাঁড়াইয়াছিল। তরুণ-লাবণ্যে তাহার কুসুম-পেলব-তনুলতা সমুদ্রের মতই সৌন্দর্য্যের পূর্ণ-মাধুর্য্যে শোভমানা। আধুনিক ফ্যাসনে সে সাড়ী ও জ্যাকেট-পরিহিতা। চরণ-কমলে জরি-জড়িত কট্‌কি জুতা। খাটো চুলের গোছা সম্মুখ-ভাগে ফিকা নীল-রংঙ্গের ফিতার বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পশ্চাতে কাঁধ ছাড়াইয়া স্তবকে স্তবকে পিঠে নামিয়াছে।

অন্ধকার কাটিয়া আকাশে চাঁদ উঠিল। সমুদ্রজলে চাঁদের ছায়া তরঙ্গে তরঙ্গে শত শত মুকুর-বিম্বিত মণিখণ্ডের মত নাচিতে লাগিল। আমি কহিলাম, "রাত হয়ে গেল—তুমি একা বেড়াতে এসেচ ?" সে চোক না ফিরাইয়াই কহিল, "বাবার সঙ্গে আমি ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছি;—দেখুন, সমুদ্র যেন হাত বাড়িয়ে আমাদের কোলে নিতে ডাকচেন্। নবদ্বীপ-চাঁদ যে-দিন ডাক শুনে ঐ নীল জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন সে-দিনও বোধ হয় জলে অমনি চাঁদ উঠেছিল!" আমি নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, "হবে"। মেয়েটির মস্তিষ্কের প্রকৃতাবস্থার বিষয়ে মনে সন্দেহ আসিয়াছিল। পাছে উপমেয়-ব্যক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বসে, সে ভয়ও না হইল তেমন নয়। আলাপ করিয়া তাহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার ইচ্ছায় কহিলাম, "তোমায় ত একদিনও এখানে দেখিনি, বাড়ী বুঝি এখানে নয় ?" সে মাথা নাড়িয়া সায় দিল—আমার অনুমান সত্য। কথা থামাইবার ইচ্ছা ছিল না, তাই তাহাকে বিমনা দেখিয়াও থামিলাম না, কহিলাম- "এখানে বুঝি বেড়াতে এসেচ ?" সে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাথা নাড়িয়া স্বীকারোক্তি জানাইল হাল না ছাড়িয়া কহিলাম, "কোথায় থাক তোমরা ?" সে কহিল, "মেদিনীপুরে; বাবার পেন্‌সন হয়ে গ্যাছে কিনা, তাই আমরা আর সেখানে ফির্‌ব না; এবার দেশে যাব। কালই আমরা চলে যাব।" আমি কহিলাম, "আমিও কাল দেশে ফির্‌ব।"

এতক্ষণের পর সে আমার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "ওঃ, আপনারও এখানে বাড়ী নয়! আমি মনে করেছিলুম আপনি বুঝি এখানকার লোক। যারা বারমাস এখানে থাকে তারা বোধ হয়, খুব সুখী; কেমন রোজ সমুদ্র দেখে!" আমি বাধা দিয়া হাসিয়া কহিলাম, "আমার ত বিশ্বাস যে, তারা মোটেই তা দেখে না। মানুষ

নিজের অবস্থায় তুষ্ট হতে জানে না। যারা রোজ দেখতে পায় তাদের দেখতে ভালও লাগে না।" সে বিস্মিত দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "তাদের তবে কি ভাল লাগে? খুব সম্ভব, বন-জঙ্গল আর পানাভরা পুকুর;—পাহাড়-টাহাড়ও হতে পারে!" সে মুখ টিপিয়া সরল হাসি হাসিয়া কহিল, "না, আপনি ঠাট্টা কচ্চেন। সমুদ্র বুঝি কারো আবার ভাল লাগে না—? আপনি বুঝি পাড়াগাঁয়ে থাকেন?" আমি হাসিয়া কহিলাম, "বাড়ী তাই বটে; থাকি অনেক জায়গায়—আপাততঃ জাহানাবাদে পুলিসে কাজ করি।" স্ত্রীংয়ে হাত পড়িলে যেমন সেটা অকস্মাৎ লাফাইয়া উঠে, তেমনি করিয়া সভয়-সঙ্কোচে সহসা সে আমার কাছ থেকে হাত-কয়েক দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "অ্যাঁ পুলিস—আপনি পুলিস।"

এম্‌নি স্বরে সে কথাগুলি উচ্চারণ করিল যে, ভয় পাইয়াছে অথবা ঘৃণা করিতেছে তাহা ঠিক বোঝা গেল না। আমি কহিলাম, "আমি পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টার—এটা বোধ হয় আমার অপরাধ নয়।" সে সম্পূর্ণ অনাসক্ত-ভাবে কহিল, "পুলিসরা লোক ভাল নয়। আপনি পুলিস জান্‌লে আমি কথাও কইতাম না।" তাহার কথা-কহা বা না-কহায় আমার যে কিছুই আসিয়া যায় না, সে কথা মনে আসা ত দূরের কথা, তাহার উপরে রাগও হইল না। অথচ বেশ জানি, এ কথা সে না হইয়া অপর কেহ যদি বলিত, তাহা হইলে এখনি সে ধৃষ্টতার উচিত মত শিক্ষা পাইত। জাত-সাপের দৃষ্টিতে শুনিয়াছি, পাখী নাকি তাহার উড়িবার শক্তি হারাইয়া ফেলে। এই মায়াবিনী মেয়েটির দৃষ্টিতে তেমনি কোন অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক শক্তি ছিল কিনা জানি না; আমি কিন্তু আমার পদমর্য্যাদা ভুলিয়া নিজের কৈফিয়ৎ-স্বরূপ কহিলাম, "পুলিস হলেই লোক মন্দ হবে—এ কি কথা? পুলিস লাইনেও ত ভাল ভাল লোক আছেন বই কি। অবশ্য কর্ত্তব্য-পালন করতে অনেক সময় অনেক নিষ্ঠুর ও সাধারণের অপ্রিয় কাজ করতে হয় বই কি। তা বলে, সবাই কিছু অন্যায় কাজ করে না।"

সে উদাসীন-ভাবে কহিল, "কে জানে!" তারপর আগের নীতি অনুসারেই বোধ হয় দুর্জ্জন-সঙ্গ-পরিহার-মানসে সে স্থানত্যাগের উপক্রম করিল। একটুখানি অগ্রসর হইয়া কহিলাম, "কাল আমি চলে যাব, তোমার সঙ্গে হয়ত আর কখনও দেখা হবেনা।" মানুষের গলার স্বর তার হাজারটা কথার চেয়েও বুঝি, তাকে মানুষের কাছে বেশী স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারে! তাই আমার কণ্ঠস্বরে হয় ত এমন কোন ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছিল যাহা তাহার গতিকে ফিরাইল। পালে বাতাস লাগিলে যেমন করিয়া বিপরীতমুখী নৌকাখানা ঘুরিয়া দাঁড়ায়, তেমনি করিয়াই সে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল। একটুখানি কাছে আসিয়া অত্যন্ত কোমল-কণ্ঠে কহিল, "আপনাকে খুব ভাল লোক মনে হচ্ছে। পুলিসের কাজ ছেড়ে দেবেন জানেন, ও ছাইয়ের চাকরী ছেড়ে দেবেন। আপনার নাম কি বল্লেন না ত?" আমি কহিলাম, "কাজ ছেড়ে দেব কিনা সে তখন ভেবে দেখ্‌ব। আমার নাম—চন্দ্রনাথ।" "চন্দ্রনাথ—! আমার দাদার নামও ছিল—চন্দ্রনাথ। দাদা নেই—এখন কেবল বাবা আর আমি। আপনাকে আমি দাদা বল্‌ব—

দাদার আর আপনার নাম এক কিনা। আমার নাম 'মাধবী', বাবা বলেন 'মাধি'। আপনাকে আমি ভুলে যাবনা, ঐ কাজটা—ঐ পুলিসের কাজ, ও ছেড়ে দেবেন, বুঝলেন ?" উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম। দূরে কেহ মাধীর নাম করিয়া ডাকিতেছিল; সে স্মিতমুখে কহিল, "ঐ যে বাবা আমায় ডাকচেন; ঠিক খুঁজে খুঁজে এসেচেন দেখুন।" —এই বলিতে বলিতে সে এক রকম ছুটিয়াই চলিয়া গেল। একটা বিদায়-সম্ভাষণও জানাইলনা। যেমন অতর্কিত তাহার আবির্ভাব তেমনি অতর্কিত তাহার অন্তর্ধান—চমৎকার মেয়েটি! অবাক হইয়া আমি তাহার গতিশীল মূর্ত্তিখানিই দেখিতেছিলাম।

বালু ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিয়া একবার সে ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু দূরত্বের ব্যবধানে ও অন্ধকারে তাহার মুখ দেখিতে পাওয়া গেলনা—নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইলাম। সমুদ্রের সৌন্দর্য্য চোখে পড়িলনা, জ্যোৎস্না-যামিনীর সমস্ত রমণীয়তা সেই মেয়েটির সহিত যেন সেই মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়াছিল। রূপ কি? রূপ প্রকৃতির বক্ষে, না মানুষের মনে? ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী ধরণীর অফুরন্ত রূপের ভাণ্ডার আমার চোখে আজ খালি হইয়া গিয়াছিল। চোখের দেখায়—শুধু মুহূর্ত্তের দর্শনে ভালবাসা জন্মায় কি-না জানিনা; আমি কিন্তু সেই ক্ষণিকের দেখায় তাহাকে ভাল-বাসিয়াছিলাম। ভাল-বাসার স্থিতি কোথায় বলিতে পার? আমি ত সন্ধান করিয়াও তাহা আবিষ্কার করিতে পারি নাই। তবু মনের উপর তাহার অসীম শক্তির অমোঘ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাই ইচ্ছা না থাকিলেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমি স্বীকার করি তাহার স্থিতি যেখানেই হউক, সে আছে। যুগ-যুগ ধরিয়া ছিল, আর থাকিবেও। তাহার অসীম শক্তির পায়ে শক্তিধর পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টরও আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। কথাটা উপচাদা, তবু আশ্চর্য্য সত্য।

আমার ভালবাসার ইতিহাস শুনিয়া তোমরা ভয় পাইও না। হাসি-তামাসার ইঙ্গিতেরও প্রয়োজন নাই, শুধু অবহিত হইয়া শুনিয়া যাও। অনেক-দিন হইতেই এ-সব দুর্ব্বল মনোবৃত্তিগুলিকে বিদায় দিয়া প্রবল উৎসাহে কার্য্যস্রোতে সাঁতার দিয়া চলিতেছিলাম—কাজ শুধু কাজ। মনে করিয়াছিলাম —সংসারের সহিত দেনা-পাওনা চুকাইয়া বসিয়া আছি, এখন ডাক পড়িলেই চলিয়া যাইব। পিছন ফিরিয়া তাকাইবার যখন প্রয়োজন নাই, তখন "কা চিন্তা মরণে?" প্রয়োজন হইলে রণে যাইতেও অসম্মত নই। ৪৬ সের কোটায় পা দিয়া ভাবিয়াছিলাম নিজেকে জয় করিয়া ফেলিয়াছি। হায় মানুষের অন্ধ অদূরদর্শিতা!

সলিলোত্থিতা চঞ্চলা দেবীটির মত যে চঞ্চলা বালিকা মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার চোখে তাহার শারীরিক ছায়া আঁকিয়া দিয়া আবার লোক-সমুদ্রের অতল তলে মিলাইয়া গেল, তাহার চিন্তা আমি ভুলিতে পারিলাম না। তোমরা আমার ভাবুকতার কৈফিয়ৎ কাটিও না; কারণ, আমার বয়সের হিসাব আমি পূর্ব্বেই দিয়াছি। সংসার আমায় এমন কিছু দেয় নাই, যাহার লোভে আবার নূতন করিয়া তাহার সহিত দেনা-পাওনার হিসাব খুলি—সে-সব কিছু না। সে আমায় তাহাকে ভালবাসিবার যে পবিত্র সম্বন্ধটুকু দিয়া গেল, কেবল

সেইটুকুই আমি প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই টুকুই আমার দুর্ব্বলতা।

পাঁচ বছরে অনেক দেশ ঘুরিলাম, অনেক চেনা ও অচেনা লোকের সহিত দেখাও হইল, কিন্তু সেই মুখখানা কোথাও দেখিলাম না। রাস্তা-ঘাটে বাঙ্গালী-ঘরের যুবতী কন্যার দেখা পাওয়া কিছু সুলভ নয়; তবু যখন যেখানে গিয়াছি, একটা অলীক আশার বাণী কাণের কাছে গুঞ্জন করিয়া বলিয়া গিয়াছে, 'হয় ত দেখা পাইবে।' নির্ব্বোধ আমি সে দেখার উপায় যে নিজেই নষ্ট করিয়াছি; সে কে? কোথায় বাড়ী? কাহার কন্যা?—কোন খবরও লই নাই। কোন এক পেনসন-প্রাপ্তের (তাহার কার্য্যের ঠিকানা নাই) কন্যা—এই ঠিকানাই কিছু অনুসন্ধানের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। ইহাতে কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া ত যায়ই না, বরং খুঁজিতে গেলে লোকে উচ্চ-প্রাচীরাবরোধে কোনও বিশিষ্ট-নামধেয়-স্থানে বাস করিবার পরামর্শই দিয়া থাকে। পুলিস লাইনে এত দিন সুনাম অর্জ্জন করিয়া কেমন করিয়া যে এমন বেকুব বনিয়া গেলাম তাহা এখনও ভাবিয়া পাই না। তবু আমার মন বলিত যে তাহার সহিত আবার দেখা হইবে। মনের কথা আমি চিরদিন মানিয়া আসিয়াছি—মন আমার প্রায়ই ভুল বলে না—তাই উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহার আশায় স্থান-কাল ভুলিয়া কোনও বিশেষ-বয়সের সুন্দরী মেয়ে চোখে পড়িলেই একবার চাহিয়া দেখি। ইহাতে লক্ষিতাদের কাছে কখনও "মিন্সের রকম দেখ, হাঁ করে চেয়ে আছে", "বুড় বয়সে সখ কম নয়"—এমনই মধুর আপ্যায়নে অপরের মধ্যবর্ত্তিতার অন্তরালে থাকিয়া আপ্যায়িতও হই। তবু আশা ছাড়িতে পারি না—যদি সত্যই সে কোন দিন কাছে আসে, আর আসিয়া আমারই অনবধানে ফিরিয়া যায়।

একদিন সংবাদ পাইলাম—এক খুনি আসামী পাতুয়ার কাছে এক জঙ্গলময় পোড়ো বাড়ীতে লুকাইয়া আছে। লোকটা বদমায়েসীতে একেবারে পাকা ওস্তাদ। শেয়াল-কুকুরের মত পুলিস তাহাকে তাড়াইয়া বেড়াইতেছে, তবু ধরিতে পারে নাই। গোয়েন্দার কাছে ঠিকানা পাইয়া ওয়ারেণ্ট লইয়া বাহির হইলাম। সাবধানতার জন্য জন-কয়েক কনেষ্টবলকেও সঙ্গে লইলাম। সঙ্গের লোকেদের সাঙ্কেতিক শব্দের অপেক্ষায় থাকিবার জন্য দূরে গোপনে রাখিয়া আসামীর উদ্দেশে একাই চলিলাম। গুলিভরা আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে আছে—ভয় কিসের?

অপরিচ্ছন্ন জঙ্গলাকীর্ণ একখানা একতালা বাড়ী;—তাহারও আধখানা ভাঙ্গা। ইটের স্তূপ জমা করা পড়িয়া আছে—স্তূপের উপরে আগাছা জন্মিয়া স্থানটিকে হিংস্র-জীবের আবাস করিয়া তুলিয়াছে। বাহিরে দরজায় বার-কতক ধাক্কা দিতে, জীর্ণ দরজা ভাঙ্গিবার ভয়েই বোধ হয়, ভিতরের সাড়া পাওয়া গেল। কে একজন দরজা খুলিয়াই অপর অংশে সরিয়া গেল। ভিতরটা একেবারে অন্ধকার, স্যাঁতানে—একটা দুর্গন্ধও নাকে আসিতেছিল। বিনা আহ্বানেই ভিতরে ঢুকিলাম। যে দোর খুলিয়াছিল সে স্ত্রীলোক। পুলিসের ইউনিফরম আমার পরণে, সুতরাং পরিচয়-লাভের প্রয়োজন তাহার ছিল না। সহসা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া সে যেন হতজ্ঞানের মত মাটিতে বসিয়া

পড়িল। আমিও মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহার পানে চাহিয়া তেমনি বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলাম—একি, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি! যদিও এক্ষণে লাবণ্যবতীর সে মধুময় লাবণ্যের কণামাত্র তাহার অস্থিসার দেহে বর্ত্তমান নাই, তবু মুহূর্ত্তের দেখাতেও সেই অন্ধকার-প্রায় কক্ষে আমার চিনিতে বাধিল না। সে মুখ কি ভুলিবার, না সে কখনও ভোলা যায়? সেই পাঁচ বছর পূর্ব্বে দৃষ্টা সমুদ্র-তীরের সুন্দরী কিশোরী এখন যুবতী। তাহার কৈশোরের তরুণ-লাবণ্য যৌবনের পূর্ণতায় পূর্ণ হইয়া ত উঠেই নাই, বরং দুঃখ-কষ্ট বা দুশ্চিন্তা তাহার নির্ম্মল-ললাটে রেখা আঁকিয়া, চোখের কোলে কালী মাড়িয়া, নিটোল গণ্ড ঝরাইয়া, পুরন্ত গলার হাড় বাহির করিয়া, রুক্ষ চুলে, ময়লা কাপড়ে দুরবস্থার জলন্ত ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে।—এই আমার আদরিণী মাধবী! বিস্ময়ে আমার রুদ্ধ-প্রায়-কণ্ঠ হইতে বাহির হইল—"তুমি—মাধবী"? সেও চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ভাল করিয়া চাহিতেই চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি!—ও ঠাকুর, তবে তুমি আমার ডাক শুনেচ। ওগো আমি যে রাত-দিন আপনার কথাই ভেবেছি।" তাহার চোখ দিয়া জলের ধারা ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। আমিও আত্মবিস্মৃত-ভাবে তাহার পানে চাহিয়া তাহার ক্রন্দন দেখিতেছিলাম;—একটা সান্ত্বনার ভাষাও আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না। আমার সর্ব্ব-শরীরে কম্পন আসিয়াছিল, ঘামে জামা-কাপড় ভিজিয়া গিয়াছিল। কে জানে সে কি ভাবিবে—?

খোলা দরজাটা যে বন্ধ করা প্রয়োজন সে কথাও ভুলিয়া গিয়াছিলাম। যখন স্মরণ হইল তখন চেষ্টা করিয়া আত্মসম্বরণ করিলাম এবং দরজা বন্ধ করিয়া সংযত-ভাবে কহিলাম, "আমার ভুল হয়েচে, ভারী ভুল করেচি। আমি একটা মিথ্যে খবর পেয়ে একজন খুনী আসামীর খোঁজে এসেছিলুম এখানে। কি আশ্চর্য্য! খবর যারা দেয় তাদের যদি এতটুকু দায়িত্ব-জ্ঞানও থাক ত—! কি ভয়ানক অবস্থায় আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হ'ল—ওঃ!" মাধবী বলিল, "ওগো,তিনি যে আমার স্বামী; আমি এখন কি করব? আমায় দয়া করুন আপনি—।"

হা ঈশ্বর! মাধবী খুনি আসামীর স্ত্রী—একথা তাহার নিজের মুখেই আমায় শুনিতে হইল!

পায়ের নীচে মাটি সরিয়া যাইতেছিল, আমার মাথায় বজ্রাঘাত হইল না কেন? সে হাতে-হাতে ধরিয়া মিনতি-ভরা চোখে আমারই উত্তর চাহিয়া আছে—সে চোখে সংশয়ের ছায়া! সে পুনরায় বলিল, "আপনি হয়ত মনে করবেন্ যে দায়ে পড়ে আমি বাড়িয়ে বল্‌ছি। তা' নয়। সত্যি সত্যি, আপনার কথা আমি বরাবর ভাবি। এই যে লুকিয়ে লুকিয়ে জন্তু-জানোয়ারের মত বেড়াচ্চি, এর মধ্যে কতবার মনে হয়েচে—'যদি আপনার শরণ নিতে পারতুম!"

হায় ভাগ্য! পুলিস-বিদ্বেষিণী মাধবী আজ তাহারই শরণ-প্রার্থিনী! আজ এ বিজয়-গর্ব্বে আনন্দ পাইলাম, না তীব্র ব্যথায় মন যেন ভরিয়া উঠিতেছিল? পুলিস লাইনে প্রবেশ করিয়া এতদিনের যোগ্যতা উপার্জ্জনেও মনের দুর্ব্বল অংশটাকে যে এখনও বাদ দিতে পারি নাই, তাহা আজই প্রথম অনুভব করিলাম। মুখে একটা কথাও বাহির হইল না,

শুধু বিহ্বলের মত তাহার মুখের দিকে বাক্যশ্চোভে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

সেও বুঝি, আমার মনের ভাষা মুখেই পাঠ করিয়াছিল, তাই নত-মুখে রুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল, "বিশ্বাস করুন—তিনি ইচ্ছে করে খুন করেন নি। জুয়ায় হেরে, মদ খেয়ে মত্তাবস্থায় করে ফেলে—এখন খুবই সাজা পাচ্ছেন।"

হায় মা বসুন্ধরা! তুমি দ্বিধা হইলে না কেন? মাধবী মন্তপ, জুয়াড়ী, খুনীর স্ত্রী!

কপালে হাত ঠেকাইয়া আমার অব্যক্ত-প্রশ্নের উত্তরে নতমুখে সে কেবল কহিল, "আমার নিয়তি!"

নিয়তি—সত্যই নিয়তি। ইচ্ছা করিতেছিল যে হৃদয়হীনা নিয়তিটাকে একবার যদি চোখে দেখিতে পাই, গলা টিপিয়া চিরদিনের জন্য অসীম-শক্তির অপব্যবহার করিয়া তাহার খেলার সাধ মিটাইয়া দেই। ক্ষোভে, রোষে ও যন্ত্রণায় আমার যেন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল। মুখে যথাসাধ্য গাম্ভীর্য্য আনিয়া কহিলাম, "তোমার স্বামী কোথায়?" মাধবী সিঁড়ি দেখাইয়া, অসঙ্কোচে কহিল, "উপরে।"

হায় বিশ্বাসিনি নারি! এ বিশ্বাস কাহাকে উপহার দিতেছিস্? আমি যে পুলিস অফিসর, দয়া-মায়া বা মমতার অবসর আমার কোথায়?

অন্তরে বাহিরে কাঁপিয়া মুখে কহিলাম, "আমার সাধ্যমতচেষ্টা করব যাতে তার সাজা কম হয়। প্রথমেই যদি ধরা দিত! পালিয়ে অপরাধ বাড়িয়ে ফেলেচে। যা' হোক, আমার দ্বারা যা' সম্ভব তা আমি করব।" সে সহসা আর্ত্তভাবে কাঁদিয়া আমার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল ও বলিতে লাগিল, "দয়া কর, ওঁকে দয়া কর। ওগো এ সময় ওঁকে দয়া কর।"

দয়া করিব কাহাকে? অপরাধীকে? আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ববিবেক সবলে মাথা নাড়িয়া কহিল, "অসম্ভব।" কিন্তু তবু দয়া করিতেই হইবে। মাধবীর চোখের জল—সে যে তখনও আমার পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতেছিল—সে চোখের জল সহ্য করা আমার পক্ষে অত্যধিক অসম্ভব। দয়া আমায় করিতেই হইবে। হউক সে খুনি, তবু সে মাধবীর স্বামী। চিন্তা করিবার সময় নাই—সামর্থ্যও ছিল না। স্খলিত-কণ্ঠে কোন মতে কহিলাম, "পারত এখান থেকে চলে যেও;—আমি আর কি বল্‌ব? তোমায় সাহায্য কর্‌বার শক্তি আমার নেই। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন?"

সে আমার পা ছাড়িয়া দিয়াছিল। অশ্রুরুদ্ধ-স্বরে কহিল, "ভগবান আপনার কাজে অসন্তুষ্ট হবেন না। দেখে যান, তিনি মৃত্যু-শয্যায় না হলে এ অনুরোধ আমিও কর্‌তুম না।" কিন্তু আমি তাহার অনুরোধ রাখিতে সাহস করিলাম না। যদি সত্যই সে মৃত্যুশয্যা-শায়ী হয়—সেখানকার বিচারালয়ে তাহার বিচার হইবে; কিন্তু যদি মিথ্যা হয়—? কাজ নাই—না দেখাই ভাল। ভবিষ্যতে কখনও যদি প্রয়োজন হয়, আমায় খবর দিবার জন্য নাম ও ঠিকানা তাহাকে জানাইয়া, পিছনে ফিরিয়া না তাকাইয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলাম। সে আমায় প্রণাম করিল কিন্তু আশীর্ব্বাদ করিতে পারিলাম না। কি আশীর্ব্বাদ করিব—? সঙ্গীদের কাছে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলাম—'খবর ভুল।'

পুলিস্-লাইনে প্রবেশ করিয়া স্বেচ্ছায় আর কখনও এমন করিয়া কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করি নাই। মানবের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি—দয়া, কিন্তু ইহাকে কি দয়া বলে? ইহা

অপেক্ষা কত সামান্য অপরাধে অপরাধী দয়া-ইকেও ত কখন দয়া করি নাই ; আমার কার্য্য আমার তাহা নিষেধ করিয়াছে। দয়া করিবার অধিকার আমাকে কে দিয়াছিল? এ ত দয়া নয়—এ স্বার্থ! মাধবীর স্বামী, তাই মহাপরাধে অপরাধী হইয়াও সে আমার দয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে ; এ আমার জ্ঞানকৃত অপরাধ। যুক্তি বুঝাইতে চাহিল যে—সে মুমূর্ষু ; এ জগতের বিচারালয়ের অপেক্ষা উচ্চ বিচারালয়ের নিকট আগত, তাই তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ায় কর্ত্তব্যের হানি হয় নাই। মন কিন্তু ত এ সিদ্ধান্তে সায় দিল না। সত্যই সে মরণ-পথের যাত্রী কিনা, তাহার ত চাক্ষুষ প্রমাণ লই নাই এবং লইতে কেন যে সাহস করি নাই, সে পাপ ত আমার মনের অগোচর নয়। ভাবিয়া দেখিলাম, ইহার পর সরকারী কার্য্যে থাকা আমার আর উচিত নয়। আইন-বদ্ধ আইনজ্ঞ আমি ; দয়া বা ক্ষমার বিচার করা আমার হাতে নয়—অধিকারও নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতাকে দয়ার নামে অস্বীকার করা চলেনা। সে যদি মাধবীর স্বামী না হইয়া বিশ্বের অপর যে কেহ হইত, যত মুমূর্ষুই সে হউক, তাহাকে এমন করিয়া ছাড়িয়া আসিতাম কি?—কখনই নয়।

মনের সহিত বিচারে কর্ত্তব্য নির্ণীত হইয়া গেল ; দুই চারি দিন ইতস্ততঃ করিয়া কার্য্যে ইস্তফা দিবার দরখাস্ত দিলাম। আগাছা একবার জন্মিতে দিলে তাহার শিকড় মারিয়া ফেলা সহজ নয়। একটা মিথ্যা ঢাকিবার জন্য অনেক মিথ্যা-আশ্রয়ের প্রয়োজন। কর্ত্তৃপক্ষ আমার কাজে তুষ্ট ছিলেন। অনেক কষ্টেই তাঁহাদের স্নেহ-দৃষ্টি ও ভবিষ্যতে উন্নতির আশা ছাড়াইয়া পেনসন গ্রহণ করিবার সময়ের পূর্ব্বেই ঘরে আসিয়া বসিলাম। ইচ্ছা হইতেছিল, কিছুদিন কোথাও বেড়াইয়া আসি ; কিন্তু তাহাও ঘটিল না। মন বলিত যদি সে কোন দিন সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আমার কাছেই আসে ও আসিয়া ফিরিয়া যায়! তাহাকে বাড়ীর ঠিকানা দিয়াছিলাম, তাই বাড়ী ছাড়িয়া কয়দিনের জন্যও কোথাও যাইতে পারি নাই। সুখহীন, শান্তিহীন, একান্ত অনাবশ্যক গৃহবাস যতই অসহ্য হইয়া উঠিতে ছিল, ততই দৃঢ়বলে তাহাকেই আঁকড়িয়া ধরিতে চাহিতেছিলাম। এ লোহার বাঁধন কাটিয়া কোথায়, কেমন করিয়াই বা যাইব?

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এমনি অসহ্য উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ভিতর দিয়া কাটিয়া চলিল। প্রতীক্ষিত কার্য্যহীন মন্থর দিনগুলা ক্রমেই দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া পড়িতেছিল। জানিনা জীবনের এ দীর্ঘ-প্রতীক্ষার অবসানের আশা কোথায়? কার্য্যানুরোধে কোথাও যদি দুই দিনের জন্যও যাইতে হয়, অমনি ভয় হয় পাছে সে আসিয়া ফিরিয়া যায়! ছটি বৎসর এমনি করিয়া সংবাদ-পত্রে কেবল সেই খুনী আসামীর খবর লইয়াছি, উৎকণ্ঠায় বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছে, পাছে তাহার ধরা-পড়ার খবর প্রকাশ হইয়া পড়ে। ঈশ্বর দয়া করিয়াছেন—সে ধরা পড়ে নাই। চিরদিনের ব্যবহার প্রথম কয়েকটি নিরপরাধের নির্য্যাতন হইয়া ক্রমে তাহার কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আঃ! মাধবী এইবার নিরাপদ।

সেদিন—যেদিনের কথা বলিব—সকালের দিকে মেঘ জমিয়া ভারী এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝড়।

বসন্তকালের ঝড়ে গাছের পাতা, কাঁচা আম, কচি নোড় বাগানে স্তূপাকৃতি হইয়া পড়িয়াছিল। বৈকালে ঝড়বৃষ্টি থামিয়া আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া গেলে মনে করিলাম যে রাস্তায় একটু বেড়াইয়া আসি। সবে-মাত্র বাহিরে যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছি, এমন সময় আমার পুরাণ চাকর 'ভোলা' এক ধামা কাঁচা আম কুড়াইয়া বাড়ী ঢুকিয়া খবর দিল,—"বাগানে গাছতলায় একটা ভিখারিণী মেয়ে পড়ে রয়েচে, বাঁচবেনা—শ্বাস হয়েছে। এত বদ্‌ যে মরতে হয় রাস্তায় গে মর্‌, তা মাগী শুন্‌বে না; নড়েও না চড়েও না?" ইহা শুনিয়া আমি ধমক্ দিয়া কহিলাম, "আচ্ছা লোক ত তুমি! মানুষ মর্‌চে, তাকে দেখা চুলোয় যাক্—রাস্তায় গে মরতে পাঠান!" ভোলা পুরাণ চাকর, সে ধমকে দমিল না, কহিল, "এই সাঁজ সন্দের কে আবার ভিকিরীর মড়া ছুঁয়ে গতি কর্‌তে যায়। তার উপর পুলিস এসে আবার হুজ্জুৎ করুক খুনের দায় চাপিয়ে;—ভিকিরী বটে, রূপ্‌ত আর গরীবের থাক্‌তেও মানা নেই।" সহসা বেত্রাহতের মত চমকিয়া উঠিলাম—কে এ ভিখারিণী রে! আমার গৃহদ্বারে আজ দুর্য্যোগ-নিশীথে মরিতে আসিয়াছে! চকিতে একটা অস্ফুট সম্ভাবনা মনে জাগিল; তাড়াতাড়ি আম-বাগানের উদ্দেশে চলিলাম।

বাগানে গাছের ছায়ায় সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। গাছতলায় আপাদ-মস্তক কাপড়ে মুড়ি দিয়া কে একজন পড়িয়া রহিয়াছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের মৃদু-শব্দে বুঝিলাম—তখনও প্রাণ আছে। আচম্বিতে চোখে জল ভরিয়া আসিল, করুণায় মন যেন গলিয়া গেল। আহা! কে রে গৃহহারা এমন করিয়া আজ পথের ধূলায় মরণকে বরণ করিয়া লইতে আসিয়াছিস্? ডাকিয়া কহিলাম, "ওগো বাছা, তোমার কি হয়েছে বল। তোমায় আমি ডাক্তার দেখিয়ে আরাম করে তুল্‌ব।" ডাক ব্যর্থ হয় নাই। সে মুখের কাপড় সরাইয়া তাহার মরণ-ছায়াচ্ছন্ন কালো চোখের তারা আমার চোখের উপর স্থির করিল। হরি! হরি! সন্দেহ সত্য হইয়া গেল। সেই বটে, ওগো সেই—আমার বড় আদরের, বড় ভালবাসার ধন—সেই মাধবী সে।

সে আমায় চিনিতে পারিল। তার স্তিমিত চোখে আনন্দের রশ্মি, শীর্ণ অধরে তৃপ্তির হাসি। তার মনের ভাষা তাকে আমার কাছে প্রকাশ করিয়া দিল। ক্ষীণস্বরে সে কহিল, "এসেচেন? আপনার জন্যে প্রাণ আমার বেরুতে পার্‌ছিল না।" মাটিতে বসিয়া তাহার কাদা-মাখা মাথাটা কোলে তুলিয়া লইলাম ও কর্ত্তিত রুক্ষ চুলের ভিতর হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলাম, "এতদিন কেন আস নি বোন্? আমি যে তোমার জন্যেই পথ চেয়ে বসেছিলুম—।" তাহার গণ্ড বহিয়া দুইটি জলের ফোঁটা আমার কোলের উপর গড়াইয়া পড়িল, মুখের বিষাদ-মলিন হাসিটুকু আরো ম্লান হইয়া গেল। সে কহিল, "তা জানি, আপ্‌নার ভালবাসা আমায় আজ আশ্রয় দিতে টেনে এনেচে। এতদিন নিজেকে বেঁধে রেখে আজ তাই আর পার্‌লুম না।" চোখের জল ধরিয়া রাখা দায় হইয়া পড়িল। কেন সে এত বিলম্ব করিল? আসিল যদি, তবে সময় দিল না কেন? মনকে চেষ্টা করিয়া বাঁধিয়া কহিলাম, "এত দেরী কেন কল্লে মাধবি?—জানিনা কি?"

বিধবা তাহার ভূষণহীন হাতখানি মুক্ত করিয়া কহিল, "আমার মাপ্ কর্বেন্—আমার বাপ্ নেই, স্বামী নেই, ভাই নেই। আপ্নি আমার দাদা—আমি জানি আমার জন্যে কত ক্ষতি সয়েচেন।" বাধা দিয়া কহিলাম, "সে কথা ছেড়ে দাও,মাধবি! এখন সংসারে আমরা দুটি ভাই-বোন্। চল, তোমায় নিয়ে আমি কাশী যাই। সেখানে আবার নূতন করে আমরা সংসার পাত্‌ব।

সে হাসিল—অন্ধকারে যেন বিদ্যুৎ খেলিল। কি বিশ্বাসভরা মধুর সে হাসিটুকু! মাধবী কহিল,"কাশীনাথের ডাক্ শুনেই আমি এসেচি ভাই! এই যে আমার কাশী। এখানকার অভয় আশ্রয়েই জুড়িয়ে যাব;—আর আমার যা বলা হয়নি, তাও তোমার কাছে বলে যাব। তোমায় আমি ঠকাইনি ভাই! সেই রাত্তেই তিনি চলে গেছেন—।" একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাধবী চুপ করিল। তাহার ওষ্ঠাধরের মৃদু মৃদু কম্পনও থামিয়া গেল—বক্ষের স্পন্দনও বন্ধ হইল—! বুকে কাণ রাখিয়া শুনিবার চেষ্টা করিলাম—সব স্থির হইয়া গিয়াছে! নাকে হাত দিলাম, শীতল নিঃশ্বাস নাই। আঃ! মাধবী শান্তি পাইল। জ্বালা যন্ত্রণার সংসারে এইবার সে যথার্থই জুড়াইয়াছে। যে কথা সে বলিতে আসিয়াছিল, সে কথাও সে বলিয়াছে। সে যে আমায় মিথ্যা কথায় ভুলায় নাই শুধু এইটুকু আমার নিকট প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতা তাহাকে মরণেও শান্তি দিতে পারিতেছিল না। আমার মনের দ্বন্দ্ব কি তাড়িত-বার্ত্তায় তাহার মনেও পৌঁছাইয়া দিয়াছিল? ওরে অভাগিনি, সত্যই বুঝি তোকে সন্দেহ করিয়াছিলাম! মনের কাছেও ছলনা করিয়াছি, তাই বুঝি তুই এমন করিয়া সুধ-শুদ্ধ ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলি!

আত্মীয়-হীন, গৃহ-হীন, খুনী আসামীর স্ত্রী মাধবীর মরণ-সুপ্ত মাথাটা তখনও আমার কোলের উপর। আমার অবারিত অশ্রুজলে তাহার জীর্ণদেহ ভাসাইতে আজ আর কোন দিকের কর্ত্তব্যে বাধিবে না। জীবনে যাহার এতটুকু দিতে পারি নাই—মরণে সে তাহার পাওনা পুরা আদায় করিয়া লইয়াছে।

শ্রী ইন্দিরা দেবী।

মা।

যৌবন-জোয়ার লাগি
সুষমা উঠিছে জাগি
সর্ব্ব-দেহ ভরি;
সুন্দরী ষোড়শী বালা—
পারিজাত-পুষ্পমালা
কণ্ঠ আলো করি।

কৈশোর গিয়াছে সবে,
যৌবন-প্রভাত এবে
রূপে উথলিত;
হাসি-খেলা সখী সনে,
আনন্দের সম্মিলনে
অবারিত চিত।

পতির সোহাগ তার
অপার্থিব অলঙ্কার,—
রাজ-রাজেশ্বরী !
সংসারে কিছু না জানে
পতি-প্রেম-সুধা-পানে
সকলি বিস্মরি।
প্রণয়-কৌতুক তার
নানা ছন্দঃ কবিতার
উঠে ঝঙ্কারিয়া ;
তরুণী প্রেয়সী বধূ
স্বামীর জীবন-মধু,
দুঁহু এক হিয়া
স্বর্গ হতে সমাচার—
মাতৃত্বের অধিকার ;
সহসা আসিয়া
খেলা-ধূলা লয় হরি,
বসায় জননী করি
নারীত্ব আনিয়া !
কিশোরী, যুবতী আর
রহে না-ক, বিশ্বে মার
সিংহাসন পড়ি ;
পুত্রকোলে বসি সুখে,
স্তন্য দিয়া শিশু-মুখে
পায় যেন সবি।

শরীর, শরীর নয়,
শুধু মন সর্ব্বময় ;
লাজ-ভয়-মান
মাতৃগর্ব্বে পদে দলি
বিজয়িনী যায় চলি
সাধিয়া কল্যাণ।
স্নেহ মায়া ভালবাসা
পূরায়ে জীবের আশা
জগৎ বাচায় ;
এক দিনে যুগান্তর
পৃথ্বী পায় রূপান্তর
সন্তান-মায়ায় !
তরুণী আকৃতি মার
হৃদে প্রেম প্রাচীনার—
জননী ধরায়,
আত্ম-পর-ভেদা-ভেদ
অন্তরে রাখেনা বেদ
আপনা বিলায় !
দেবতার প্রতিচ্ছায়া
জননীরূপিণী মায়া
পার্থিব ঈশ্বরী
জীব রাজা ক্রোড়ে করি
আছে মাতৃ-রূপ ধরি
ভবেশ শঙ্করী।

শ্রী প্রসন্নময়ী দেবী।

সন্তান-পালন।

সন্তান-পালন মাতার কর্ত্তব্যের একটি প্রধান অঙ্গ ; কিন্তু এ বিষয়টী অতি অল্প-সংখ্যক রমণীগণই বুঝিয়া থাকেন। এই জন্য এই-সম্বন্ধে দুই একটি উপদেশ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যাহা পালন করিলে সন্তানের হিতও অনিবার্য্য, তদতিরিক্ত মাতার স্বাস্থ্যও উত্তম থাকিবে।

যে-সকল রমণী স্বীয় সুখের পাছে অন্তরায় হয় এই আশঙ্কায় আপন শিশু-সন্তানকে স্তন্যদান হইতে বিরত থাকে, তাহারা স্বীয় জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্যের প্রতি অনবধানতা প্রকাশ করিয়া থাকে। পিকবধূগণ কাকের বাসায় অণ্ড প্রদান করিয়া পলাইয়া যায়। অণ্ড ফুটিলে বায়স পিক-শিশুকে স্বীয়-সন্তান-বোধে প্রতিপালন করে। আপনার শরীর-জাত সন্তানকে স্বয়ং প্রতিপালন না করিয়া যে রমণী পিকবৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক ধাত্রী নিযুক্ত করে, তাহার জীবনে ধিক্। সে মাতৃ-নামের অযোগ্যা।

মাতার যদি স্বয়ং সন্তান-পালনে কোনরূপ বাধা থাকে, অর্থাৎ মাতা যদি রুগ্না হয় তবে তাঁহার পক্ষে ধাত্রী নিযুক্ত করাই শ্রেয়ঃ। ঈশ্বর সন্তান-পালনের জন্য যখন রমণীগণকে স্তন দিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে, সন্তান জাত হইলে রমণী স্বয়ং স্তন্যপান করাইয়া সন্তানের লালনপালন করিবে। যখন অত্যন্ত হিংস্র পশুও স্তন্যদানে স্বীয় সন্তানের লালনপালন করে তখন তদপেক্ষা অধিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানব তাহা করিবে না কেন? যদি রমণী সন্তান-পালনের ভার লয়েন, তবে যেন তিনি এই বিষয়টিকে স্বীয় সুবিধার অধীন না করেন। তাঁহার আমোদ-প্রমোদে বাধা না পড়িলেই তিনি সন্তানকে স্তন্য দান করিবেন, নতুবা নহে—এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সন্তানকে স্তন্যদান করা অপেক্ষা ধাত্রী নিযুক্ত করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

এমন অনেক রমণী আছেন যাঁহারা সন্তানকে স্বীয়-স্তন্যদানে প্রতিপালন করিবার বাসনা সত্ত্বেও শারীরিক-অসুস্থতা-নিবন্ধন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন-না। কিরূপ অবস্থায় রমণীর স্বয়ং সন্তান পালন নিষিদ্ধ তাহার আলোচনা পরে করা যাইবে। রমণীর স্বয়ং সন্তান পালন করা কেন উচিত তাহা বলিতেছি। প্রথমতঃ, মাতৃদুগ্ধ সন্তানের পুষ্টির জন্য বিশেষ উপযোগী; এবং দ্বিতীয়তঃ, শিশুর মৃত্যুসংখ্যার আধিক্য-নিবন্ধন ধাত্রী-রক্ষণাপেক্ষা স্বয়ং স্তন্য প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শরীরের পুষ্টির জন্য তৈলাক্ত পদার্থ, শ্বেতসার, শর্করা প্রভৃতি বস্তু পৃথক্‌রূপে মানবের আহারে প্রয়োজন হইয়া থাকে; কিন্তু এক মাতৃস্তন্যে সে-সকল পদার্থ বিদ্যমান থাকাতে তাহা যেমন সন্তানের পক্ষে উপযোগী, তেমন অন্য কিছুই নহে। ভূয়োদর্শন-দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, সহরে যে শিশুগণ জন্ম হইতেই মাতৃস্তন্য-ব্যতিরেকে প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহাদিগের মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৬৩টী এবং যে-সকল সন্তান স্বীয়-মাতৃস্তন্যে প্রতিপালিত হইয়াছে: তাহাদিগের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা ৩৫টী মাত্র। অতএব শিশুগণের মৃত্যুসংখ্যার উপর দৃষ্টিপাত করিলে এমন কোন্ রমণী আছেন যিনি সন্তানকে স্বীয়-স্তন্যদান হইতে বিরতা থাকিবেন্।

যাঁহারা পূর্ব্বে সন্তান প্রসব করিয়াছেন্ তাঁহাদিগের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, গর্ভের অন্তিম অবস্থায় তাঁহাদিগের স্তন বিলক্ষণ স্ফীত ও দুগ্ধভারে অবনত হইয়া থাকে। প্রথম-প্রসূতা রমণীর দুই বা তিন দিন গত না হইলে স্তনে দুগ্ধ দেখা দেয় না। দুগ্ধ দেখা দিলে রমণীর শারীরিক অবস্থার কিছু বিপর্য্যয় ঘটে। শৈত্য, জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ

প্রকাশ পায়; কিন্তু তাহা শীঘ্রই অন্তর্হিত হয়। স্তন বৃহৎ হয় ও নীলবর্ণের শিরা-নিচয় স্তনের উপর দৃষ্ট হয় এবং প্রসূতি বেদনানুভব করিয়া থাকেন্। এই লক্ষণগুলি সন্তান স্তন্য পান করিলেই অন্তর্হিত হয়।

সর্ব্বপ্রথম যে-দুগ্ধ ক্ষরিত হয় তাহা দেখিতে কতকটা আবিল কিন্তু পরে তাহা পরিষ্কার হইয়া যায়। প্রথম দুগ্ধ বালকের জুলাপের কার্য্য করে। যাঁহারা পূর্ব্বে অপত্য-হীন ছিলেন এবং যাঁহাদিগের গর্ভের অন্তিম অবস্থায় দুগ্ধ ক্ষরিত হয় নাই, তাঁহারা পুনঃ-পুনঃ সন্তানের মুখে স্তন দিবেন না। কারণ, স্তন টানিলে যদি বালক দুগ্ধ না পায় তবে সে আর স্তন মুখে করিতে চাহিবে না। ইহাতে এরূপ বুঝা উচিত নহে যে, সন্তানকে প্রথম বা দ্বিতীয় দিন আদৌ স্তন্য দিবেন না। সন্তানকে স্তন দিলে শীঘ্র দুগ্ধ-স্রাব হয়।

যাঁহাদিগের পূর্ব্বে কোন সন্তান জন্মে নাই এবং যাঁহাদিগের দুগ্ধ ক্ষরিত হয় নাই, তাঁহারা নবজাত বালকের মুখে ছয় ঘণ্টা অন্তর একবার স্তন দিবেন। সন্তানের কুক্ষিবৃত্তির জন্য তাহাকে গাধীর দুগ্ধ অথবা গাভীর দুগ্ধ উষ্ণ-জলে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে চিনি-সংযোগ-করণান্তর ঈষৎ মিষ্ট করিয়া পান করাইবে।

গাভীর দুগ্ধ হইলে তাহাতে উষ্ণ-জলের পরিমাণ সমান হওয়া চাই দুই ঘণ্টা অন্তর দুগ্ধ খাওয়ান উচিত। দুগ্ধের পরিমাণ জানিতে হইলে একটা আচুষণ-বোতলে দুগ্ধ ভরিয়া সন্তানকে পান করিতে দিলেই বালকের আহারের পরিমাণ বুঝিতে পারা যাইবে। বালক আবশ্যকাতিরিক্ত দুগ্ধ পান করিবে না। এই সময় ঝিনুকে করিয়া দুগ্ধ খাওয়াইলে দুগ্ধের আন্দাজ পাওয়া যায় না; সুতরাং, অতি-ভোজন-নিবন্ধন সন্তানের রোগ জন্মিতে পারে।

স্তনে দুগ্ধ আসিলে কৃত্রিম আহার পরিত্যাগ করিয়া বালককে স্তন-দুগ্ধ পান করিতে দিবে। স্তনদুগ্ধ পান করাইতে হইলেও একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করা কর্ত্তব্য। শৃঙ্খলা না থাকিলে কু-অভ্যাস-জনিত পাকাশয়ের পীড়া সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। সন্তান রোদন করিলেই যে স্তন-দুগ্ধ দিতে হইবে, তাহা নহে। সন্তান কাঁদিলেই যদি স্তন্য দেওয়া হয় তবে অতিভোজন-প্রসূত বালকের বমন ও উদরা-ময় সঙ্ঘটিত হইতে পারে।

শিশুর আহারের শৃঙ্খলা না থাকিলে মাতা ও বালক উভয়কেই ভুগিতে হয়। শিশুর জন্মের প্রথম দিন হইতে একমাস-কাল পর্য্যন্ত দিনে দুই ঘণ্টা ও রাত্রে ৪ ঘণ্টা অন্তর একবার দুগ্ধ পান করাইবে। প্রথম হইতেই এই নিয়ম স্থাপন করা উচিত; কারণ, মাতার বিশ্রামেরও বিশেষ আবশ্যক। বিশৃঙ্খলা-নিবন্ধন যদি রাত্রে মাতার নিদ্রার ব্যাঘাত হয় তবে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ, দুগ্ধের অপকর্ষতা এবং বালকের পুষ্টির ব্যতিক্রম ঘটিবে।

সন্তান নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেই স্তন্যপান করান প্রশস্ত। স্তন্যপান করিলেই সন্তান নিদ্রা যায় এবং তখন মাতাকে কোন কষ্ট ভুগিতে হয় না। স্তন্যপান-সময়ে সন্তানকে নিদ্রা যাইতে দিবে না। ইহা করিলে এমন কু-অভ্যাস হইয়া যাইবে যে, স্তন বিনা সন্তানের নিদ্রাই আসিবে না। সুতরাং এরূপ কুঅভ্যাস হইতে দিবে না।

সন্তানের জন্মের প্রথম মাস হইতে দণ্ড-

নির্গমন কাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত-নিয়মে তাহাকে স্তন্য দান করিবে। দিনে ২॥ বা ৩ ঘণ্টা এবং রাত্রে ৩ বা ৪ ঘণ্টা অন্তর একবারের অধিক স্তন্য প্রদান করিবে না। বালক যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, আহারের সময়ও তদনুসারে বৃদ্ধি করিয়া দিবে। এই নিয়মে কার্য্য করিলে বালক ৪।৫ ঘণ্টা কাল গাঢ় নিদ্রা যাইবে এবং মাতাও তাহার স্বাস্থ্যের আবশ্যকানুযায়ী নিদ্রার সময় পাইবেন। কিন্তু যদি এরূপটী না হইয়া রাত্রিকালে মাতার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, তবে তাঁহার স্বাস্থ্য-হানি অবশ্যম্ভাবী।

প্রথম-দন্ত-নির্গমের সময় পর্য্যন্ত বালককে মাতৃদুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোন দুগ্ধ দিবে না। প্রথম দন্ত নির্গত হলেই বুঝিতে হইবে যে, সন্তানের কঠিন আহারের আবশ্যক হইয়াছে; স্বভাব তাহাকে কঠিন দ্রব্যাদি আহার করিবার জন্য দন্ত দিয়াছে। সুতরাং, একটু এ্যারারুট, কি দাউল, কি সামান্য ভাত বালকের মুখে দিতে আরম্ভ করিবে। যখন দেখিবে যে বালক পরিপাক করিতে পারিতেছে, তখন যে দ্রব্য হজম করিতেছে তাহাকে সেই দ্রব্য খাইতে দিবে। হঠাৎ আহারের পরিবর্ত্তন করিবে না; পরীক্ষা-দ্বারা যখন নির্ণীত হইবে যে অমুক-বস্তু বালক পরিপাক করিতেছে, তখন সেই বস্তু তাহাকে দিবে।

দুগ্ধ ছাড়ান।—বালক ৯।১০ মাসের হইলে তাহাকে আর স্তনদুগ্ধ দিবে না। অনেক মহিলা ১৫, এমন কি ১৮ মাস পর্য্যন্ত স্বীয় বালককে স্তন্য পান করান। তাঁহাদিগের ধারণা এই যে, যত অধিক সময় পর্য্যন্ত স্তন্য-দান করিবে তত অধিক সময় পর্য্যন্ত রমণী গর্ভধারণ করিবে না। বলা বাহুল্য, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। বালককে স্তন্য পান করান গর্ভধারণের পরিপন্থী হইতে পারে না। রমণী গর্ভবতী হইলে তাহার স্তনদুগ্ধ বিকৃত হয় এবং সেরূপ স্থলে রমণী যদি স্তনদুগ্ধ স্বীয় সন্তানকে পান করান, তবে সেই বিকৃত স্তন্যের ফলে বালক পীড়িত হইবে।

স্তনদুগ্ধ ছাড়াইবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। অবস্থার বিপর্য্যয়ে নিয়মেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, মাতা ও বালক সুস্থ থাকিলে ৯ বা ১০ মাস হইতে বালকের দুগ্ধ-ছাড়ান আরম্ভ হওয়া উচিত। বালক যদি দুর্ব্বল হয়, অথবা সে যদি যক্ষ্মারোগ-গ্রস্থ পিতা-মাতা হইতে জন্মিয়া থাকে, এবং সেই বালক যদি সুস্থ-ধাত্রী-দ্বারা প্রতিপালিত হয়, তবে তাহার দুগ্ধ ছাড়ান ১১-১২ মাস হইতে আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। মাতার শারীরিক অবস্থার অবনতি হইলে একেবারে দুগ্ধ ছাড়াইয়া দিবে। দন্ত নির্গত হইলেই কৃত্রিম উপায়ে বালকের পরিপোষণ আরম্ভ হওয়া উচিত এবং সেই সঙ্গে স্তনদুগ্ধও ক্রমশঃ ছাড়াইতে হইবে।

এরূপ অবস্থায় এক-কালে বালককে কি পরিমাণে আহার দিতে হইবে তাহা ধার্য্য করা অসম্ভব। কারণ, বালকমাত্রেরই পরিপাক-শক্তি বিভিন্ন। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, এক-কালে তিন আউন্স তরল খাদ্য দিতে পারা যায়; কিন্তু তদতিরিক্ত কখনও দিবে না। অতিমাত্রায় আহার দিলে বালক পরিপাক করিতে পারে না; সুতরাং তাহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়া থাকে।

স্তন্য-দান ঃ—গর্ভাবস্থায় কসা জামা পরিধান করিলে রমণীগণের চুচুক বসিয়া যায়; সুতরাং প্রসূত সন্তান মুখে স্তন ধরিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় অতিশয় সাবধানতার সহিত বালকের মুখে স্তন দিবে, নতুবা বালক সজোরে মুখ বসাইলে বায়ু-রোধ হইয়া তাহার শ্বাস বন্ধ হইতে পারে।

স্তন্য দিতে হইলে পার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন করতঃ একহস্তের উপর স্বীয় মস্তক রাখিয়া স্তন্য দেওয়াই মাতার পক্ষে প্রশস্ত। শয্যার উপর উপবেশন-পূর্ব্বক স্তন্য দিবার কোন আবশ্যকতা নাই। উপবিষ্ট-অবস্থায় স্তন্যদান করিলে প্রসূতির পৃষ্ঠ-বেদনানুভূতি হইতে পারে। শয্যার বাহিরে স্তন্য দিতে হইলে সোজাভাবে উপবেশন করিয়া স্তন্য দেওয়াই বিধি। তখন শয়ন করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই।

সন্তানকে স্তন্য দিবার পূর্ব্বে ঈষদুষ্ণ-জল-দ্বারা স্তনকে ধৌত করা উচিত। তদনন্তর তাহা মুছিয়া ফেলিয়া সন্তানকে স্তন দিবে। শিশুর স্তন্য-পানান্তে পুনরায় অনুরূপ ক্রিয়ার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত ঈষদুষ্ণ-জল ও সাবান দ্বারা স্তনকে প্রত্যহ দুই বা তিন বার ধৌত করিবে।

প্রসূতির মানসিক অবস্থা দুগ্ধ-ক্ষরণের উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, মাতার ক্রোধ বা বিষাদের পর সন্তানকে স্তন্য দান করাতে বালক সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হইয়াছে। অতএব প্রসূতিগণ স্মরণ রাখিবেন যেন সন্তানের স্তন্যপান-কালে তাঁহাদিগের মন প্রফুল্ল থাকে।

কাহারা স্তন্য পান করাইবার অনুপযোগী :—সন্তানকে স্তন্য-দান করিবার বাসনা সত্ত্বেও কখন কখন বালকের এবং নিজের হিতের জন্য মাতাকে স্তন্য-দান হইতে বিরতা হইতে হয়। চিকিৎসক নিষেধ করিলেও যদি মাতা বলপূর্ব্বক সন্তানকে স্তন্য দান করেন, তবে তিনি সন্তানের মধ্যে রোগের বীজ উপ্ত করিবেন। যাহারা যক্ষ্মারোগাক্রান্তা তাহারা সন্তানকে স্তন্য দান করিবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এরূপ ক্ষেত্রে ধাত্রী নিযুক্ত করা মাতার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ধাত্রী রাখিলে সন্তানও হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয় এবং সে জন্মকালে পিতামাতা হইতে যে দোষ প্রাপ্ত হয়, তাহা সবল-ধাত্রীর অধিকৃত দুগ্ধ-পানে নিরাকৃত হইয়া থাকে।

যে-সকল রমণী শৈরিক-বিকারগ্রস্ত এবং অল্পতেই উত্তেজিত হইয়া উঠে, এবম্ভূত-রমণী সন্তানকে স্তন্য দিবার অনুপযোগী। অনেক পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মাতার মানসিক অবস্থা দুগ্ধ-ক্ষরণের উপর প্রবল আধিপত্য করিয়া থাকে, এবং যাহা মাতার উপর অশান্তি আনয়ন করে তাহা তাঁহার দুগ্ধকেও বিকৃত করিয়া থাকে।

কোন কোন রমণী রুগ্না না হইলেও তাহাদিগের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত কোমল। এবম্বিধ-রমণী সন্তানকে স্তন্য দান করিতে পারে বটে, কিন্তু যদি তাহাতে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্তন্যদান পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কখন কখন এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, স্তন্য পান করাইতে করাইতে সহসা কোন দিন মাতার স্তন্যক্ষরণ রোধ হইয়া যায়। এরূপ-স্থলে দুই বা তিন দিন সন্তানকে স্তন না দিলেই, স্তনে দুগ্ধ পূর্ব্ববৎ প্রত্যাগমন করে। কোন বিপদ সঙ্ঘটিত

হইলে হঠাৎ এইরূপ অস্বাভাবিকরূপে দুগ্ধ-ক্ষরণ লোপ হইয়া যায়।

স্তন্য-দান-কালে স্বাস্থ্যের জন্য মাতার কর্ত্তব্য—স্তন্যদান-কালে মাতার স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে তবে সন্তানের স্বাস্থ্যও ভাল থাকিবে। সুতরাং মাতার স্বাস্থ্য যাহাতে বিকৃত না হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে উচিত। মাতার স্বাস্থ্য-বিকৃতিতে বালকের স্বাস্থ্য-বিকৃতি অনিবার্য্য এবং বালকের স্বাস্থ্য খারাপ হইতে দেখিলে মাতার স্বাস্থ্য আরও অবনতি প্রাপ্ত হইবে। অতএব নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয়ের উপর মাতার দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

আহার।—সন্তান-পোষণকারিণী মাতার আহার পুষ্টিকর অথচ সহজ-পাচ্য হওয়া চাই। খাদ্যের পরিমাণ-বৃদ্ধির আবশ্যকতা নাই। মস্লাদি উত্তেজক পদার্থ সম্পূর্ণ-নিষিদ্ধ। সুখকর কার্য্যে ব্যাপৃতি এবং নিয়মিত ব্যায়াম যেরূপ মানসিক অবসাদ দূর করিতে সমর্থ, সুরাদি উত্তেজক পদার্থ সেরূপ নহে। অত্যন্ত মসলা-সংযুক্ত খাদ্য পরিহার করিবে, কারণ তাহা দুষ্পাচ্য। ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিও যে, যে-খাদ্য মাতা আহার করিবে বালকের উপরও তাহা আধিপত্য বিস্তার করিবে। খাদ্যের গুণে যদি মাতার কোষ্ঠ-কাঠিন্য বা উদরাময় হয়, তবে সন্তানের উক্ত রোগ হওয়া অবশ্যম্ভাবী! এ সমস্ত জ্ঞান মাতার থাকা উচিত।

ব্যায়াম :—স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য মাতার ব্যায়াম বিশেষ আবশ্যক। পদ-চারণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যায়াম। কিন্তু সকল হিন্দু-রমণীর ভাগ্যে ইহা ঘটিয়া উঠিতে পারে না। গৃহ-ধর্ম্ম যদি আমোদের সহিত কৃত হয়, তাহাতেও উত্তম ব্যায়াম হইতে পারে।

স্নান :—মাতা প্রত্যহ স্নান করিবেন। স্নানে স্বাস্থ্য-বর্দ্ধক-শক্তি আছে। এই স্নান প্রত্যূষে হওয়াই উচিত। প্রচণ্ড শীতে ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহারে দোষ নাই।

পরিচ্ছদ :—প্রসূতির পরিচ্ছদ ঢিলা হওয়া উচিত। আঁটা পোষাক সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য। যে পরিচ্ছদ-দ্বারা অঙ্গ-চালনার অসুবিধা ঘটে তাহা কখনও সুখকর হইতে পারে না।

কার্য্য—সন্তান-পালিকার কার্য্যাদি লঘু হওয়া উচিত। যে-কার্য্য দ্বারা ক্লান্তি না হয় তাহাই প্রশস্ত। এবম্বিধ লঘু কার্য্য-দ্বারা শরীর ও মন সবল হইয়া থাকে।

স্তনদুগ্ধ শুষ্ক করিবার উপায়।—সন্তানকে অবিচ্ছেদে প্রায় নয় মাস পর্য্যন্ত স্তন্য দান করার পর যদি সন্তানকে স্তনদুগ্ধ ছাড়াইতে হয়, তবে রমণী স্তনে কিঞ্চিন্মাত্র বেদনা অনুভব করে না। যদি সন্তানকে স্তন্য ছাড়ানর পর রমণী বেদনানুভব করে এবং স্তন দুগ্ধভারে স্ফীত হয়, তবে স্তন হইতে কিয়ৎ-পরিমাণে দুগ্ধ গালিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। অতিমাত্রায় দুগ্ধ বাহির করা যুক্তি-যুক্ত নহে। কারণ, স্তন হইতে পুনরায় দুগ্ধ-ক্ষরণ হইয়া পুনরায় বেদনানুভূতি হওয়া সম্ভব। যে পরিমাণে দুগ্ধ বাহির করিলে বেদনার উপশম হয়, সেই পরিমাণে দুগ্ধ বাহির করা কর্ত্তব্য। কখন কখন মৃতবৎসা রমণীর স্তন দুগ্ধ-ভারে ফুলিয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় জুলাপ লওয়া কর্ত্তব্য। Epsom Salt উত্তম বিরেচক। তৈল উষ্ণ করিয়া স্তনে মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য। Eau-de-cologne এবং জল মিশ্রিত করিয়া স্তনে মর্দ্দন করিলে হিতকর ফল দর্শে। এতদ্দেশীয় রমণীগণ স্তনে মুসুর ডাল বাটিয়া প্রলেপ দেন—তাহাতেও দুগ্ধ শুষ্ক হইয়া যায়।

শ্রী হেমন্ত কুমারী দেবী।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(৫)

কক্ষের দ্বার-সম্মুখে আসিয়া নমিতা আবার দাঁড়াইল ও ইতস্ততঃ করিতে লাগিল—এখনও 'ডিউটি' পড়িতে খানিকটা সময় বাকী আছে, এমন সময় আপনা হইতে গিয়া রোগীকে কোন কিছু সাহায্য করিবার জন্য মিসেস্ দত্তের কাছে কি বলা যায়?

প্রত্যেকেই তাহার কর্ত্তব্য-পালনে যথা-রীতি বাধা, ইহা ত নীতি-সঙ্গত যুক্তি; কিন্তু এই বাধ্যতার মধ্যে তাচ্ছীল্য বা অনিচ্ছা-মূলক ঝড়ের ঝাপ্টা আসিয়া পড়িলেই শাস্তিভঙ্গের উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠে। তাই নমিতা অন্তরের মধ্যে একটা বিদ্রোহিতার ঈষদুন্মেষ অনুভব করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল;—না না, কক্ষস্থ ঐ ক্লিষ্টের করুণ কাতরোক্তি তাহার বুকের মাঝে ঘা দিয়া বিপ্লবের সুরঝঙ্কার উৎপাদন করিতে চাহিতেছে। না, এখন উহার সান্নিধ্যে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সমীচীন নহে; হয় ত অন্যের পক্ষেও তাহা নিরবচ্ছিন্ন-আরাম-দায়ক ব্যাপার হইবে না, থাক্।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নমিতা ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিল। দ্বিতলের বারান্দার প্রান্তে দুইখানা চেয়ার পাতা ছিল, একখানা চেয়ার লইয়া সে 'রেলিং' এর গা ঘেঁসিয়া বাগানের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল ও উদাস-নয়নে বাগানের দিকে চাহিয়া নীরবে নানা-কথা ভাবিতে লাগিল।

সন্ধ্যার স্নিগ্ধ শ্যামচ্ছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছিল, বাগানে হরেক রকমের গাছের সবুজ পাতার হরেক রঙের ফিকা গাঢ়ত্ব, তখন সন্ধ্যার কোমল ম্লানালোকে সমস্ত বর্ণ-পার্থক্য ঘুচাইয়া, গভীর সৌহৃদ্যে এক ঘোলা-শ্যামলতার স্মিত-মনোহর-বেশে হাসিতেছিল! আকাশের তিন দিকে অমুজ্জ্বল নীলিমার বুকে দুই-একখানা ভাঙ্গা কাল মেঘ মৃদু-গতিতে উড়িয়া যাইতেছিল। পশ্চিমাকাশে কে যেন দীপশিখার উজ্জ্বলো সিঁদুরের রক্তিমা ছড়াইয়া অপূর্ব্ব বর্ণ-বৈচিত্র্যের সুন্দর শিল্প রচনা করিয়াছিল; পশ্চিমের শ্রেণীবদ্ধ বড় আমগাছগুলির পাতার ফাঁক হইতে সে বর্ণ-সুষমা বড় চমৎকার দেখাইতেছিল! নমিতা সেই দিকে চাহিয়া মৃদুভাবে একটি নিঃশ্বাস ফেলিল। ধন্য শিল্পি! একই সময়ে একই আকাশের বুকে, কত বর্ণ-বৈচিত্র্য কি সুন্দর নির্ব্বিরোধিতায় ফুটিয়াছে!—

কিন্তু নমিতা ভাবিতেছে কি? ক্ষমা-দ্বারা বিরোধকে জয় করিয়া চলিতে হইবে। হাঁ, সে তাহাই করিবে। এই সাধনাই সে জীবনের জন্য বরণ করিয়া লইয়াছে; কিন্তু বিরোধের প্রাবল্যের সহিত সম্মুখ-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এখনও তাহার ক্ষমা যোগ্য-শক্তি লাভ করে নাই। তা না করুক, কিন্তু সে হতাশ হয় নাই। ইচ্ছাশক্তির অসাধ্য কাজ কি হৃদয়ের মধ্যে থাকিতে পারে?—না।

পায়ে পায়ে আঘাত খাইয়া সে ত প্রতি-মুহূর্ত্তেই সমস্ত সত্য-মিথ্যাকে তীব্রভাবে অনুভব করিতেছে! সে ত সব বুঝিতেছে! এই একটা ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়া দেখা যাক্ না,—

মিস্ স্মিথ্ তাহাকে একটু বেশী স্নেহ করেন্ বলিয়া মিসেস্ দত্ত মহোদয়া অকারণে তাহার উপর অপ্রসন্ন। হায় রে সংসার! এখানে অযাচিত স্নেহও জ্বালাজনক ঈর্ষার উদ্দীপক! বড় দুঃখে নমিতার হাসি পাইল, ব্যথিতভাবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে কপালের ঘাম মুছিল।

তা হউক, ইহার জন্য নমিতা ক্লিষ্ট নয়; ক্লিষ্ট হয় সে অন্য-কারণে। এই প্রচ্ছন্ন বিড়ম্বনাটুকু মাঝখানে আড়াল পড়াতে কার্য্যক্ষেত্রে তাহাকে সময় সময় বড় বিব্রত হইতে হয়। দত্তজায়ার নিকট কোন সাহায্য গ্রহণ করিতে বা স্বেচ্ছায় সমাদরে তাঁহার কর্ত্তব্যের কোন অংশ নিজের ঘাড়ে টানিয়া সানন্দে বহন করিতে নমিতার ভয় হয়। বরং বিদেশিনী হইলেও হাঁসপাতালে মিস্ চার্ম্মিয়াণের সঙ্গে আন্তরিক সরলতার এরূপ আনন্দের আদান-প্রদানে তাহার দ্বিধা বোধ হইত না। আহা! দত্তজায়া যদি একটুখানি—। সে কথা যাক্, সে বিচার-বাবস্থার অধিকার তাহার নাই। সে অকপট-প্রাণে শুধু নিজের কর্ত্তব্যটুকু পালন করিয়া যাইবে, তারপর যাহা হয় হইবে, আর যাহা হয় হউক। কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে সে দত্তজায়াকে চিরদিন নিজের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত সম্মান করিতে বাধ্য।

"অহো বাপ্, ওঃ—"—এই আকস্মিক ত্রস্ত আর্ত্তস্বর দূরে ধ্বনিত হইল; নমিতা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রেলিং এর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্বর-লক্ষ্যে চাহিয়া দেখিল, নীচে বারেন্দার প্রান্তে কল-ঘরের পাশে পথের উপর যন্ত্রপাতি-সমেত গুরুভার 'ষ্টেরেলাইজ যন্ত্র'-ঘাড়ে বৃদ্ধ সর্দ্দার-কুলি ছট্টু যন্ত্রণাব্যঞ্জক-মুখে সুজভাবে দাঁড়াইয়া ঐ কাতরতা-সূচক ধ্বনি করিতেছে! বোধ হয়, তাহার পায়ে কিছু লাগিয়াছে। মাথার ভারি বাক্সটা সে নামাইতেও পারিতেছে না, অথচ পায়ের কোন কিছু সাহায্য-ব্যবস্থার উপায়ও নাই। নিকটে কেহই ছিল না, সুতরাং নমিতা ব্যস্তভাবে চারিদিক চাহিয়া ভাবিতে লাগিল —"তাই ত কেউ যে নাই—।"

ঠিক এই সময়ে দ্রুতপদে কলঘরের ভিতর হইতে দুইজন লোক বাহির হইয়া আসিল। সন্ধ্যার ছায়ায় তাহাদিগের মুখ অস্পষ্ট হইয়া আসিলেও নমিতা কণ্ঠস্বরে বুঝিল যে, অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি—সেই কম্পাউণ্ডার তেওয়ারী। নমিতার উদ্বেগ মুহূর্ত্ত-মধ্যে অন্তর্হিত হইল। তাহার মনে হইল যেন বৃদ্ধ ছট্টুর জন্য আর কাহাকেও কিছু ভাবিতে হইবে না, তাহার সব যন্ত্রণার উপশম হইয়া গিয়াছে।

আশ্বস্তভাবে সে চেয়ারে আবার বসিয়া পড়িল এবং রঙ্গমঞ্চের অভিনয়-দর্শনোৎসুক দর্শকের মত নির্ভাবনা-প্রসন্ন-মুখে ও সস্মিত নয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার পর সে দেখিল—সুরসুন্দর আসিয়া একটিও কথা না বলিয়া বৃদ্ধের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল ও সযত্নে তাহার পায়ে হাত দিয়া কি যেন কিছু একটা টানিয়া তুলিল। তাহার বোধ হইল যেন সেটা কাঁটা। বৃদ্ধ ছট্টু আরাম পাইয়া বলিল, "আঃ! জীতা রও, বাপ্"।

মাথা হইতে তাড়াতাড়ি ষ্টেরেলাইজ বক্স নামাইয়া বৃদ্ধ তেওয়ারীকে প্রণাম করিল, তেওয়ারী যে ব্রাহ্মণ। তেওয়ারী একটু বিব্রত হইয়া তাড়াতাড়ি বৃদ্ধের হাত ধরিয়া তুলিল, ও বৃদ্ধের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কুণ্ঠাটুকু সংশোধন করিবার জন্য কোমলকণ্ঠে কি কতক-গুলা কথা

বলিল। তাহার একটা কথা নমিতার কাণে গেল—…"হাম্ তোমরা লেড়্কাক মাফিক্ ছট্টু! চলা যাও বাবা।" ছট্টু গেল কি না সুরসুন্দর দাঁড়াইয়া তাহা দেখিল না; তাড়াতাড়ি অদ্ধধৌত গ্যালিপট হাতে লইয়া কলঘরে ধুইতে গেল। সুরসুন্দরের সঙ্গীটি এতক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়াছিল। সুরসুন্দর বিনা-বাক্যে আসিয়া কাজটি সমাধা করিয়া বিনাড়ম্বরে সরিয়া যায় দেখিয়া সে সপরিহাসে বলিল, "হো তেওয়ারী জী, বুঢ়্ঢাকো কোঢ়ি (কুষ্ঠগ্রস্থ) বানাও গে?"

কণ্ঠস্বরে নমিতা বুঝিল, এ ব্যক্তি তাহাদের হাঁসপাতালের—সেই ছেলেমানুষের মত রঙ্গ-কৌতুক-প্রিয় সরলহৃদয় কম্পাউণ্ডার—সমুদ্রপ্রসাদ সিংহ। সমুদ্রের কথার উত্তরে শুনিতে পাওয়া গেল, কল-ঘরের ভিতর হইতে সুরসুন্দর রহস্য-স্মিত-কণ্ঠে কি যেন উত্তর দিতেছে। কথাগুলি বুঝা গেল না, কিন্তু তাহার সেই কথায় সমুদ্রপ্রসাদ যেন নব্যোদ্যমে যো পাইয়া বসিল ও দ্রুত-উচ্চারিত ভাষায় উৎসাহিত-কণ্ঠে সুরসুন্দরকে প্রচ্ছন্ন-কৌতুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া সুরসুন্দর যে কণ্টকোৎপাটন-অছিলায় তাহার পায়ে হাত দিয়াছে সে শুধু নিরীহ বেচারীর পা-দুইটিতে বুড়া বয়সে গলিত কুষ্ঠ ধরাইবার জন্য। অতএব সত্বরই সুরসুন্দরের শান্তিবিধানে মনোযোগ দেওয়া ছট্টুর পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য, নচেৎ তাহার দুঃখ-ভোগ অনিবার্য্য।

সমুদ্রপ্রসাদকে হাঁসপাতালের সকলেই ভাল রকম চিনিত; সুতরাং বৃদ্ধ ছট্টু তাহার সহৃদয়তাপূর্ণ সুযুক্তির উত্তরে শুধু একটু হাসিয়া কম্পিত ওষ্ঠে কৃতজ্ঞ-স্বরে সুরসুন্দরের জন্য ভগবানের দয়া ভিক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। সমুদ্রও কপট হতাশা-প্রকাশে আপন-মনে কাল-ধর্ম্মের বিকৃতি-সম্বন্ধে নানা মন্তব্য আলোচনা করিতে করিতে কলঘরে ঢুকিল।

ঘটনাটা ছোট—অতি ছোট। অন্য সময় হইলে নমিতা এ ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া দূরে থাক্, হয় ত, দৃক্‌পাতও করিত না। কিন্তু আজ সে তাহা পারিল না, গভীর আনন্দে স্তব্ধভাবে বসিয়া বিস্ময়োজ্জ্বল-নয়নে সে সমস্ত দৃশ্য দেখিয়া লইল। ব্যাপারটা লইয়া কোন কিছুর সহিত তুলনায় সমালোচনা করিতে, বা ইহার কোন অংশের বিচার বিশ্লেষণ করিতে তাহার সাহস হইল না। সে শুধু নিভৃত প্রীতি-স্পন্দিত হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দন-তরঙ্গের মধ্যে একটি নিবিড় শ্রদ্ধাস্পর্শ বারম্বার অনুভব করিয়া তৃপ্ত হইল। আহা,—কে বলে রে এ রোগি-নিবাসে শুধু মৃত্যু-দূতের আগমন-পদ-শব্দই অহোরাত্র অস্বস্তিকর ভীষণতায় ধ্বনিত হইতেছে? না—না, এখনও এখানে হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ সমবেদনার সন্ধিযোগ বাঁচাইয়া রাখিতে, জীবনের দূতও—আছে! দুঃখের বিষয়টা যতই বেশী হউক, কিন্তু সুখের বিষয়টা যে যৎকিঞ্চিৎ আছে, ইহাই অপরিসীম সৌভাগ্য!

পথে আসিবার সময়, অল্পক্ষণ পূর্ব্বে দৃষ্ট ঘটনাগুলি একে একে নমিতার মনে পড়িয়া গেল। অনেকগুলি অচিন্তাপূর্ব্ব কৌতূহল তাহার মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিয়া জাগিয়া উঠিল। সে কয়েক-মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে

বসিয়া রহিল ও তাহারপর সহসা মনে পড়িয়া গেল যে, তাহার ডিউটির নির্দ্দিষ্ট সময়ের আর বেশী দেরী নাই। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল এবং সিঁড়ির পাশে, যে ঘরখানায় ঢুকিতে গিয়া তখন ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই কক্ষেই গিয়া প্রথমে ঢুকিল।

নমিতা দেখিল, আজ কয়দিন হইতে সেখানে যে দুইজন রোগী ছিল, তাহার উপর এখন আর একজন নূতন বাড়িয়াছে। সেই নূতন রোগীর শয্যাপার্শ্বেই খোলা জানালার কাছে চেয়ারে বসিয়া দত্তজায়া গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে কি-একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছেন,—পড়েন নাই।

দত্তজায়ার বয়স অন্যূন চৌত্রিশ পয়ত্রিশ বৎসর। তাঁহার আকার কিছু খর্ব্ব এবং স্থূল; রংটা আধময়লা, মুখ-চোখ মন্দ নয়। কপাল অত্যন্ত নীচু এবং চক্ষু-দুইটি কিছু ছোট বলিয়া মুখশ্রী তেমন বুদ্ধিমত্তা ও সরলতার পরিচায়ক নহে। দৃষ্টি-ভঙ্গিতে একটা অকারণ-ক্রূরতার জ্বালা অহরহঃ যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। তাঁহার চেহারা দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তি-সম্ভ্রম করিতে পারুক আর না পারুক —তাঁহার দৃষ্টি দেখিয়া অনেকে যে ভয়ে সঙ্কুচিত হইতে বাধ্য হয়, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

নমিতা ঘরে ঢুকিলে তিনি বই হইতে চোখ তুলিয়া একবার চাহিলেন, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না। এরূপ স্থলে পরিচিত-সম্ভাষণে সংক্ষিপ্ত শির-কম্পনে ঊর্দ্ধে উঠিতে তিনি সচরাচর বড় একটা ইচ্ছুক হইতেন না। নমিতা তাহা জানিত, তাই সেও কোন কথা না কহিয়া, মাথা নোয়াইয়া দৃষ্টি ফিরাইল ও পুরাতন রোগীদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া নূতন রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

দত্তজায়ার নিকট অনতিকালপূর্ব্বে তিরস্কৃত হইয়াই হউক, অথবা যে কোন কারণেই হউক, সেই শয্যাশায়ী রোগীটি তখন মুদ্রিত-নয়নে যথাসাধ্য আত্ম-সম্বরণের চেষ্টায় মৃদু মৃদু কাতরোক্তি করিতেছিল। পাশে খোলা জানালার ভিতর দিয়া সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোক রোগীর মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। নমিতা তাহার মুখপানে চাহিয়া সহসা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"একি মকবুলের মা, তোমার এমন অসুখ করেছে?—কই কেউ তো এ কথা বলে নি?—" নমিতা শয্যার উপর বসিয়া পড়িয়া তাহার ললাটে হস্তার্পণ করিল এবং কোমল-স্বরে পুনশ্চ বলিল, "তোমার কি অসুখ করেছে, মকবুলের মা?

রোগযন্ত্রণাচ্ছন্ন বৃদ্ধা মুসলমান রমণীর প্রাণে সে সুকোমল সহানুভূতির স্পর্শ বুঝি, বড় বেশী জোরে আঘাত করিল, তাই বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল। দত্তজায়া ব্যাপার দেখিয়া ঈষৎ বিচলিত হইলেন ও ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি তুলিয়া অস্ফুট-স্বরে নমিতাকে প্রশ্ন করিলেন, "একে চেন কি?"—প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার দৃষ্টি-কোণে একটু কৌতূহল-মিশ্রিত ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

নমিতা সেটুকু লক্ষ্য করিল। কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া সে পরিষ্কার-কণ্ঠে উত্তর দিল "হ্যাঁ চিনি—?"

"কি রকম?—"

মনের অনিচ্ছা দমন করিয়া নমিতা কহিল, "এই মকবুলের মা আমাদের বাড়ীতে

গামছা-টামছা মাঝে মাঝে বিক্রী করিতে যায়, সেই সূত্রে চিনেছি। বড় গরীব এরা—।"

"ওঃ"। নিষ্করুণ তাচ্ছীল্যে ভ্রূভঙ্গী করিয়া দত্তজায়া চক্ষু ফিরাইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাপার হরপ তখন দেখা যাইতেছিল কি-না —তিনিই জানেন; কিন্তু তথাপি তিনি বই খানার উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

রোরুদ্যমানা বৃদ্ধাকে সংক্ষেপে সান্ত্বনা দিয়া নমিতা একে একে প্রশ্ন করিয়া শুনিল যে, তাহার আজ সাতদিন সর্দ্দি, কাশী ও জ্বর হইয়াছে। বৃদ্ধার অল্পবয়স্কা বিধবা পুত্রবধূদ্বয় যথাসাধ্য যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু চিকিৎসার খরচ যোগাইয়া ওঠা তাহাদের সাধ্যাতীত; তাই বৃদ্ধা স্বেচ্ছায় সাধারণ চিকিৎসালয়ে চলিয়া আসিয়াছে।

ভৃত্যগণ কক্ষে আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। নমিতা বসিয়া বৃদ্ধার সহিত কথা কহিতেছে, এমন সময় সিঁড়িতে ভারি জুতার মশ্ মশ্ শব্দ হইল। নমিতা কথা বন্ধ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, দত্তজায়াও বইখানা মুড়িয়া চেয়ারের পাশে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দ্বারের কাছাকাছি আসিয়া টুপি খুলিয়া ডাক্তারবাবু কক্ষে ঢুকিলেন, এবং চকল-চকিত-নয়নে গৃহস্থ প্রাণীগুলির উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া, স্বভাবসিদ্ধ দ্রুত-উচ্চারিত স্বরে বলিলেন, "ডাক্তার-সাহেব পার্টিতে গেছেন, আজ আর আসবেন না। সত্যবাবুকে ও ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দিয়ে এলুম। আপনাদের এখানে আজ একজন নতুন লোক এসেছে?

"এই যে এই 'বেডে'—" দত্তজায়া অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে বৃদ্ধার বিছানা দেখাইয়া দিলেন।

ডাক্তারবাবু পকেট হইতে ষ্টেথোস্ কোপ্ (Stetho-scope) বাহির করিতে করিতে রোগীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভোগাবে দেখ্‌ছি?"

তিনি বসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন ও রোগসম্বন্ধীয় আবশ্যক প্রশ্নাদি করিয়া শুশ্রূষা-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপদেশ দিয়া তাহার নিকট হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। সহসা দত্তজায়ার সেই বইখানার উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল; কশ্ করিয়া সেটা চেয়ারের উপর হইতে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "একি কোন নভেল্ নাকি? আপ্‌নি পড়্‌ছিলেন? না, এ যে কর্ম্মযোগ। স্বামী বিবেকানন্দ! এ বই মিস্ মিত্রের বুঝি?"

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নমিতার দিকে চাহিলে নমিতা মাথা নাড়িল; দত্তজায়া গম্ভীর-মুখে বলিলেন, "না, ওটা আমিই আপ্‌নার ভায়ের কাছে চেয়ে নিয়েছি। আমি ভেবেছিলুম্ ওটা ইংরাজি নভেল, তাই পড়্‌বার জন্যে।"

"নির্ম্মলের কাছ্ থেকে? হুঁ"—এই কথা বলিয়া অবজ্ঞাভরে চুম্‌কুড়ি দিয়া ডাক্তারবাবু পুনরায় বলিলেন, "ওর ঐ সব বুজরুকিই তো আছে; বি, এ, পাশ কর্‌তে চল্লো, কিন্তু বুদ্ধি যদি এক বিন্দু—হুঁ! আচ্ছা, বিবেকানন্দের লেখা আপ্‌নার কেমন লাগে?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দত্তজায়া বলিলেন,"এমন কিছু glorious (বলবার) ব্যাপার তো দেখ্‌লুম্ না। সবটা অবিশ্যি পড়িনি। আমার ভাল লাগ্‌ল না।"

ব্যঙ্গ-ভরে হাসিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, "এ লোক্‌টার নাম শুন্‌লে আমার তো হাসি

পায়। কল্‌কাতায় যখন সতীশ-দা'র সঙ্গে ইনি কলেজে পড়্‌তেন্, তখন আরে বাপ্, কি স্ফূর্ত্তিবাজ লোকই ছিলেন,—এখন স্বামী বিবেকানন্দ!—হুঁ, ইনি সেই দত্ত!"—ডাক্তার বাবু বইখানা বাম হাতে ধরিয়া ডান হাতে তাহার মাঝখান হইতে পাতাগুলা খস্ খস করিয়া উল্টাইয়া যাইতে লাগিলেন। ছাপার চরণের বাহার ও কাগজের পাতার সংখ্যা ছাড়া তিনি যে পুস্তকের মধ্যে আর কিছু দেখিতেছেন না, ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল।

দত্তজায়া আনন্দের সহিত হাসিয়া বলিলেন, "আপনারও তা হলে এঁর ওপর Respectability (শ্রদ্ধা-ব্যঞ্জক ভাব) নেই?"

"কিছু না। আমি ত এঁর লেখা কখনো পড়িনি! তবে হ্যাঁ, লোকের মুখে শুন্‌তে পাই যে, লোকটা 'maxim-monger' (বচন-ব্যবসায়ী) র অনুপযুক্ত ছিল না। আমেরিকা চ্যামেরিকা ঘুরে এসেছিল, ইংরিজিটা বেশ চমৎকার জানত।"

নমিতা সজোরে অধর দংশন করিয়া মুখ ফিরাইল। হায়! স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ! তোমার সম্মানের মর্য্যাদা আজ এখানে শব্দ-শাস্ত্রের স্কন্ধে ভর দিয়া রক্ষা পাইল! তবু ভাল। মানুষের বুদ্ধি বিচক্ষণতা কি তীক্ষ্ণ! কি নিরঙ্কুশ দীপ্তিমান্ গো!

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, "লোকটার আর কিছু থাক—না থাক্, মাথা ছিল। শুন্‌তে পাই না-কি, সে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক Perplexing (জটিল) বিষয়ের বেশ পরিষ্কার মীমাংসা করেছিল। আরে একি!—এটা Present (উপহার) বই!"—

ডাক্তারের হস্ত ও রসনা-সঞ্চালন যুগপৎ স্থগিত হইল। মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা খুলিয়া স্তব্ধভাবে বিস্ময়-কুঞ্চিত-নয়নে চাহিয়া রহিলেন ও নীরবে কি পড়িতে লাগিলেন,—কোন কথা কহিলেন না।

"কই আমি ত কিছু লক্ষ্য করি নি। আমি মনে করেছি, এটা নির্ম্মলবাবুর নিজের কেনা বই। দেখি, কি লিখ্‌ছে! কে উপহার দিচ্ছে?"—দত্তজায়া কৌতূহলপূর্ণ-নয়নে উঁচু হইয়া লেখাটা দেখিবার চেষ্টা করিলেন।

"Donor হচ্ছেন—আমাদের W. H. Smith। কাল্‌কের তারিখে Present করা হয়েছে, দেখুন।"—ডাক্তার গম্ভীর-মুখে বইখানা নামাইয়া দত্তজায়ার সম্মুখে ধরিলেন। নমিতাও আত্ম-দমন করিতে পারিল না; তাহার স্নেহময়ী মাতৃরূপিণী মিস্ স্মিথ্ ইহা ডাক্তার বাবুর ভাইকে উপহার দিয়াছেন। আহা, সে দত্তজায়ার পাশে ঝুঁকিয়া লেখাটা পড়িবার চেষ্টা করিল। লেখার উপর দৃষ্টি পড়িতে সে চমকিয়া উঠিল! একি, না! এ ত ডাক্তার-বাবুর ভাইকে নয়—এ যে—।

অভাবনীয় বিস্ময়ের আতিশয্যে নমিতার সুন্দর মুখমণ্ডল লাল হইয়া উঠিল; সে রুদ্ধ-শ্বাসে স্তব্ধ-দৃষ্টিতে দেখিল যে পুস্তকের পাতার উপর মিস্ স্মিথের হাতের টানা লেখায় বক্র-কম্পিত অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে:—

Presented to my darling
Sooro Soondar Tewary.
——W. H. Smith.

(অর্থাৎ—স্নেহাস্পদ সুরসুন্দর তেওয়ারীকে উপহার দিলাম।—ডব্‌লিউ এইচ, স্মিথ্)।

নমিতার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইয়া উঠিল।—কি আনন্দ, কি আনন্দ! তাহা

হইলে ত তাহার দৃষ্টি প্রতারিত হয় নাই, অনুমান মিথ্যা হয় নাই। সে ত ঠিকই বুঝিয়াছে যে এই কম্পাউণ্ডারটি যথার্থই কাজের লোক। সে ত ইতোমধ্যে মিস্ স্মিথের গুণগ্রাহি-হৃদয়ের মধ্যে নিঃশব্দে একটি স্নেহের আসন দখল করিয়া বসিয়াছে! আশ্চর্য্য—বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! কিন্তু তদপেক্ষা বড়ই আনন্দের সংবাদ।

সহসা দত্তজায়ার কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া নমিতা মুখ তুলিয়া চাহিল; দেখিল—তিনি প্রবল ঔদাস্যে নীচেকার ঠোঁট দিয়া উপরের ঠোঁটটা ঠেলিয়া বলিতেছেন, "ওঃ বাপ্‌রে, কম্পাউণ্ডার সুরসুন্দরকে!—আমি বলি, আপ্‌নার ভাই—নির্ম্মলবাবুকে দিয়েছেন!"

"হুঁ, মিস্ স্মিথের যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই!" এই বলিয়া ঘোরতর তাচ্ছীল্যের সহিত ডাক্তারবাবু বইখানা চেয়ারের উপর ফেলিয়া দিলেন, যেন সেটা এতক্ষণের পর সত্য-সত্যই সম্পূর্ণ অস্পৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে। দত্তজায়া একটু কুণ্ঠিতভাবে, যেন কৈফিয়তের সুরে, আপন-মনেই বলিলেন, "আমি মোটেই জানতুম্ না যে, ওটা সুরসুন্দর তোয়ারীর বই। আমি ভেবেছিলাম, এ বুঝি নির্ম্মলবাবুর।

ডাক্তারবাবু কোন কথা কহিলেন না এবং সেখানে আর অধিক বিলম্ব না করিয়া রোগীদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিলেন। নমিতাও নিজের কর্ত্তব্য-পালনে উদ্যোগিনী হইল। দত্তজায়ার মুখখানা অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া গিয়াছিল, তিনি সংক্ষেপে রোগীদের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কথাগুলি বলিবার জন্য ডাক্তারবাবুর প্রশ্নের অপেক্ষায় নীরব রহিলেন,—আর একটুও অনাবশ্যক কথা কহিলেন না।

ডাক্তারবাবু এবার খুব গম্ভীর ও সংযত চালের উপর রোগীদের প্রতি সমুদয় কর্ত্তব্য সমাপন করিলেন। তাহারপর প্রত্যেকের সম্বন্ধে যথাযথ উপদেশ দিয়া তিনি প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ লিখিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় একজন কুলী আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "হুঁজুর, ছোটাবাবু মুলাকাৎ মাঙ্‌তা।"

ছোটাবাবু, অর্থাৎ ডাক্তার বাবুর খুল্লতাত-পুত্র—নির্ম্মলচন্দ্র। ডাক্তারবাবু হাঁসপাতালের কাছে সরকারী বাড়ীতে থাকেন,—ছোটখাট প্রয়োজনে প্রায়শঃ হাঁসপাতালে তাঁহার নিকট বাড়ীর লোকেরা আসিত। ডাক্তারবাবু বলিলেন—"বোলাও বাবুকো হিঁয়া।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

পূজার কথা।

(পৌরাণিক কাহিনী)

মধু-কৈটভ-বধ।

বহু আদিমকালের কথা। মন্বন্তরশেষে পুরাতন সৃষ্টি প্রলয়ের জলে ভাসিয়া গিয়াছে। মহামায়া পুনরায় ভগবানকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে যোগমগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন, চারিদিক স্তব্ধ—শূন্য ও জলময়। কেবল নারায়ণের নাভি হইতে উত্থিত পদ্মোপরি নীরবে বসিয়া ব্রহ্মা নূতনসৃষ্টির কথা ভাবিতেছেন। যোগনিদ্রামগ্ন নারায়ণের দেহ এই অনন্তবিস্তৃত জলধির উপরে ভাসমান অনন্তনাগের শীর্ষে শায়িত।

হঠাৎ একদিন এই অবস্থার ব্যতিক্রম হইল। ব্রহ্মা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও নূতন সৃষ্টির সমস্যাপূরণ করিতে পারিতেছিলেন না। বোধ হয়, সেই সমস্যা দূর করিবার জন্যই হঠাৎ মহামায়ার ইচ্ছায় সেই অনন্তশয্যাশায়িত নারায়ণের কর্ণমূল হইতে একদিন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইটা অসুর বাহির হইয়া পড়িল।

নারায়ণের কাণের ময়লা হইতে তাহারা বাহির হইয়াছিল; সুতরাং তাহাদের দেহ ও চরিত্রগুলিও তদ্রূপ কালই হইল। তাহারা অতিভীষণ কুরূপ ও হিংস্র-স্বভাব লইয়া জন্মের পরই তাড়া করিয়া ব্রহ্মাকে খাইতে গেল। ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্মের উপর বসিয়া বসিয়া মুদ্রিতনেত্রে হঠাৎ একটা বিকট গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন। চক্ষু মেলিয়াই দেখেন, সেই দুই দৈত্য! তাহাদের রকম সকম ও ভীষণ আকার দেখিয়া ব্রহ্মাও ভয় পাইয়া গেলেন, এবং ব্যস্ত হইয়া বিষ্ণুকে ডাকিতে লাগিলেন।

মহামায়ার সমাগমে বিষ্ণু তখন যোগনিদ্রা-মগ্ন! সে ডাক একটুও তিনি শুনিতে পাইলেন না। ব্রহ্মা তখন নিরুপায় হইয়া মহামায়াকে ধরিলেন। মহামায়াকে প্রীত করিবার জন্য স্তব আরম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মার স্তব শুনিয়া মহামায়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, ভক্তিতে তিনি চিরকাল প্রসন্ন। তিনি অবিলম্বেই এই বিপদ বারণ করিবার জন্য নারায়ণের দেহ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া জগৎময় ছড়াইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে নারায়ণও শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া সেই জলরাশির মধ্যে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম লইয়া রণসজ্জায় দাঁড়াইলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে চরাচর, দৈত্যগণ এমন কি ব্রহ্মাও একটা প্রকাণ্ড মায়ায় জড়িত হইয়া গেলেন।

তখন দৈত্যদিগের আর হিতাহিত-জ্ঞান-মাত্রও রহিল না। তাহারা হাঁ করিয়া ব্রহ্মাকে খাইতে যাইবে, না, একবারে বিষ্ণুর কাছেই আসিয়া পড়িল। তখন বিষ্ণুর ভয়ানক রাগ হইল। ব্রহ্মা শান্তশিষ্ট দেবতা, উপকার ভিন্ন

অপকার করা তাঁহার অভ্যাস নহে, তাঁহার উপর এ অত্যাচার কেন? আর তিনি স্বয়ং বিষ্ণু, চরাচরের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা—ইহাদিগেরও জীবনদাতা—তাহার উপরই বা একি দুঃসাহসিক আক্রমণ! বিষ্ণু হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া দৈত্য-দুইটার চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাদিগকে খুব একটা পাক্ খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিলেন। দৈত্যেরা হঠাৎ বড় চমকাইয়া পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল।

দৈত্য-দুইটাও নিতান্ত সোজা পাত্র নহে। তাহারা অপ্রস্তুত ছিল বলিয়াই, এমন হঠাৎ খাইয়া গিয়াছিল। এখন প্রস্তুত হইয়া কোমর বাঁধিয়া হাত-পা গুটাইয়া আবার অগ্রসর হইয়া আসিল ও বলিল, "কে রে? এখুনি খাইয়া ফেলিব, জানিস্!"

বিষ্ণু হাসিয়া কহিলেন, "এস, আগে তো তোমাদের মারি। তারপর—"

কথা সমাপ্ত হইল না। দেখিতে না দেখিতে ভীষণ যুদ্ধ লাগিয়া গেল। পটাপট্, সপাসপ্, ঝপাঝপ্—কীল, চাপড় ও মুষ্ট্যাঘাত চলিতে লাগিল। চীৎকার, হুঙ্কার ও গভীর নিঃশ্বাসের রবে চরাচর পরিপূরিত হইয়া গেল।

দৈত্য-দুইটা প্রথমে মনে করিয়াছিল যে,—তাহারা দুইজন, আর বিষ্ণু একা—ধরিবে আর তাহাকে দু'ভাগ করিয়া দুইজনে দু'গ্রাসে হজম করিয়া ফেলিবে; কিন্তু এখন বিষ্ণুর প্রতাপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। কৈ, যুদ্ধ আর শেষ হয় না। মাস, বৎসর, যুগ যুগান্তর গেল, যুদ্ধের শেষ নাই! অনন্ত অসীম জলরাশির উপর চল্-চল্, ছল্-ছল্, কল্-কল্ করিয়া অনবরতই যুদ্ধ চলিতেছে—কেহ কাহাকেও হটাইতে পারিতেছে না। বিষ্ণু এক-একবার এক-একটা বজ্রের মত ঘুসি লইয়া যান, কিন্তু গেলে কি হইবে? একটা দৈত্যের দিকে যাইতে আর একটা দৈত্য পেছন হইতে আসিয়া বাধা দেয়। এই ভাবেই সময় কাটে।

ক্রমে এইভাবে পাঁচ সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। তখন একটু একটু করিয়া দৈত্যদিগের যুদ্ধের সাধ কমিয়া আসিল।

একদিন হায়রাণ হইয়া দৈত্যেরা বিষ্ণুকে কহিল, "বিষ্ণু, তুমি লড়াই করিতে জান বটে! তোমার লড়াই দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর গ্রহণ কর।"

মহামায়ার লীলা! নতুবা দৈত্যদের মুখ হইতে এমন দুর্বুদ্ধির কথা বাহির হইবে কেন? মায়ায় অভিভূত হইয়া তাহারা নিজেদের এত বড় ভাবিল যে, বিষ্ণুকেও বর দেওয়ার স্পর্দ্ধা করিয়া বসিল, আর সঙ্গে সঙ্গে পতনের পথ পরিষ্কৃত হইল। বিষ্ণু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "ক্ষতি কি? কি বর দেবে?"

দৈত্যেরা একটু মুরুব্বিয়ানা করিয়া কহিল, "চাওনা, যা খুসী চাও। যা' চাও তাই দিব।"

বিষ্ণু কহিলেন, "তথাস্তু"। তারপর চাহিয়া বসিলেন, "তবে এই বর দাও, যেন তোমাদের দুইটাকেই এক কোপে মারিয়া ফেলিতে পারি।"

অ্যাঁ! বরের নাম শুনিয়াই তো দৈত্যদের অপস্মার! চোক্ ঠিকরাইয়া তালুর দিকে উঠিয়াছে। কি সাংঘাতিক কথা! এ কথা তো তাহাদের কল্পনাতেই আসে নাই। এখন কি করা যায়!

তখন তাহারা দুইজনে এককোণে যাইয়া

মুখোমুখি হইয়া পরামর্শের পর পরামর্শ, জল্পনার পর জল্পনা, কল্পনার পর কল্পনা, কত যে করিল, তাহার ঠিক নাই। শেষটা একটা বুদ্ধি স্থির করিয়া হাসিয়া, কতকটা সুস্থির হইয়া প্রফুল্লমুখে কহিল, "আচ্ছা, তাই হোক। তুমি নামকরা যোদ্ধা, তোমার হাতে মরিতে আমাদের অপমান নাই। কিন্তু এককথা—মারিবে কোথায়? আমরা জলে মরিতে পারিব না, আমাদিগকে স্থলে মারিতে হইবে। যদি কোথাও স্থল পাও—খুঁজিয়া দেখ, আমরা প্রস্তুত।"

দৈত্যেরা দুষ্টহাসি হাসিতে লাগিল। তাহারা দেখিয়াছিল, চারিদিকে কেবল জল, জল, জল—কোথাও স্থলের চিহ্নমাত্র নাই; তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিতেছিল, "এইবার আচ্ছা ফাঁকি দিয়াছি!"

বিষ্ণু ও দৈত্যদিগের দুষ্টামি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি "বেশ, বেশ এ তো ন্যায্য কথা—তথাস্তু।" এই কথা বলিয়া, দৈত্যেরা কিছু বুঝিতে না বুঝিতে, চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে, নিজের হাটু দুইখানিকে অতিবিস্তৃত করিয়া সেই অনন্ত জলরাশির মধ্যে গাড়িয়া ফেলিয়া, দৈত্য-দুইটাকে হঠাৎ দুই হাতে সেখানে টানিয়া লইয়া আপনার ভীম সুদর্শনচক্রের এক কোপেই নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। তখন চীৎকার করিতে করিতে সেই দু'টা দৈত্য সেই অনন্ত জলরাশির মধ্যে পাহাড়ের মত পড়িয়া গেল।

দৈত্যদের দেহ-দুইটা এত বড় ছিল যে, তাহাদের হাড়গুলির মধ্য হইতে যে মেদ-নামক পদার্থ বাহির হইয়াছিল, তাহাতেই আমাদের এ পৃথিবীটা তৈয়ারী হইয়াছিল। এজন্য পৃথিবীর আর এক নাম—মেদিনী।

দৈত্য-দুইটার নাম ছিল মধু আর কৈটভ। ব্রহ্মা বিপদে পড়িয়া বিষ্ণুকে ডাকিয়াছিলেন, আর সেই আহ্বানে বিষ্ণু উঠিয়া মধুকৈটভকে বধ করেন—এজন্যই লোকে বিপদে পড়িলে আজও মধুসূদনের নাম করিয়া থাকে।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। যদিও নারায়ণ স্বয়ংই এই অসুর-দুইটাকে নিহত করিয়াছিলেন, তথাপি মহামায়ার কৃপাতেই এরূপ হইয়াছিল। মহামায়ার কৃপা না হইলে বিষ্ণু জাগিতেন না, আর না জাগিলে অসুরও হত হইত না। সুতরাং সকলের মূলে সেই মহামায়া। অতএব এ লীলাখেলা মূলতঃ তাঁরই। এখন দ্বিতীয় এক কাহিনী শোন।

মহিষাসুর-বধ।

এখন মহিষাসুর-বধের কথা কহিব। দুর্গা-পূজার সময় মায়ের কাঠামের নীচে একটা ছোট বিচ্ছিন্নমস্তক মহিষ ও তাহার পার্শ্বেই তাহার দেহ হইতে উৎপন্ন একটা প্রকাণ্ড ভীষণ অসুরের মূর্ত্তি দেখা যায়। এ সেই মহিষাসুরের মূর্ত্তি।

এ আর এক মন্বন্তরের কথা। মধু-কৈটভ-বধের পর বহুদিন চলিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মা আবার জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বর্গ হইয়াছে, মর্ত্ত হইয়াছে, পাতাল হইয়াছে, আর তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল লোকে বাস করিবার জন্য দেবতা এবং দানবদেরও সৃষ্টি হইয়াছে। সূর্য্যদেবের সৃষ্টি হওয়াতে তখন রাত্রি ও দিন হইতেছে; চন্দ্র ও তারকাগণও গগনের শোভা বৃদ্ধি করিতেছেন। এ হেন যুগে, হঠাৎ আবার একবার অসুরের দৌরাত্ম্যে ত্রিভুবন চঞ্চল হইয়া উঠিল। মহিষাসুর-নামক এক ভয়ানক অসুর দেবতাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইল।

এখন দেবতারা যান কোথায়? তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া কয়েক-দিন ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া, শেষটা যাইয়া পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,"অসুর, এ আমার কর্ম্ম নয়। চল যাই শিব ও নারায়ণের নিকট যাই। তাঁহারা যাহা হয় করিবেন।"

তখন সকল দেবতা পিতামহ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া যাইয়া প্রথমে কৈলাসে ও পরে বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইলেন।

বৈকুণ্ঠে জগৎ-পালক হরি রত্নসিংহাসনে বসিয়া স্বয়ং কমলার সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন; ব্রহ্মা ও শিবের সহিত সকল দেবতাদিগকে তথায় উপনীত দেখিয়া তিনি হঠাৎ উঠিয়া আসিলেন। তিনি কহিলেন, "ব্যাপার কি? তোমাদের মঙ্গল তো?" ব্রহ্মা কহিলেন, "মঙ্গলই যদি হইবে, তবে আর কে মধুসূদনকে স্মরণ করে? হে মধুসূদন, আবার বুঝি মধু-কৈটভের পালা উপস্থিত, আবার রক্ষা কর।" এই বলিয়া তাঁহারা মহিষাসুরের তাবৎ বৃত্তান্ত নারায়ণের শ্রুতিগোচর করাইলেন।

তাহা শুনিয়া হরি অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষু কর্ণ আরক্ত হইয়া উঠিল। মুখখানি ক্রমে রক্তবর্ণ হইতে হইতে তাহা হইতে এমন একটা জ্বলন্ত পদার্থ নির্গত হইল যে, তাহার আভায় দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

মহামায়া তখন দিগন্ত ব্যাপিয়া সৃষ্টির মধ্যে মিশিয়া ছিলেন; এখন এই তেজাকারে, বিষ্ণুর কোপ-হেতু, সকল স্থান হইতে বাহির হইতে লাগিলেন। ভগবান্ নারায়ণের মধ্যেই তিনি বিশেষভাবে অবস্থান করেন, সুতরাং প্রথমেই তাঁহার মুখ হইতে এই তেজ নির্গত হইল। তৎপর শিব ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্যান্য দেবতাগণের মুখ হইতে এইরূপ তেজোরাশি নির্গত হইয়া আসিল। তখন সকলে মিলিয়া এক প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড করিয়া তুলিল। কিন্তু এ কি? ধীরে ধীরে সেই প্রকাণ্ড অগ্নিশিখা এ কি-অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে পরিণত হইল! দেবতারা দেখিলেন, তাঁহাদের সমস্ত তেজোরাশি মিলিয়া এক অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার ঔজ্জ্বল্যে দিগন্ত প্রভাসিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বুঝিলেন, এ আর কেহ নহে, ইনি সেই মহামায়া! উল্লাসে তাঁহারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

মায়ের আবির্ভাবে সকলের সন্ত্রস্ত হৃদয় সুস্থির হইলে দেবতারা তাঁহাকে আপন আপন অস্ত্রাদি-দ্বারা সজ্জিত করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কমণ্ডলু, বিষ্ণু চক্র, মহাদেব ত্রিশূল, ইন্দ্র চক্র, যম দণ্ড, এবং বরুণ পাশ দিলেন। এইরূপ সকল দেবতাই নিজ নিজ অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া তাঁহাকে সুশোভিত করিলেন। ক্ষীর-সাগর বস্ত্র ও রত্নালঙ্কারাদি আনিয়া দিলেন, জলধি শঙ্খ,

পদ্ম ও পুষ্পমালা পরাইলেন, চরাচর চারিধার হইতে সুষমারাশি আহরণ করিয়া উপহার দিল। আর বাকি রহিল কি? একটি বাহন। পর্ব্বতরাজ হিমালয় সেইটী যোগাইলেন। তিনি দেবীকে একটী সিংহ উপহার দিলেন। তখন নানা প্রহরণ ধরিয়া দেবী দশভুজা সিংহ-বাহিনী হইয়া সহুঙ্কারে ত্রিভুবন কাঁপাইয়া অসুরনাশে চলিলেন।

মহিষাসুর দূর হইতে শুনিলেন, প্রলয়-কল্লোলের মত হুঙ্কারধ্বনি উঠিতেছে। তিনি কিছু বিরক্ত ও সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন, "অ্যাঃ একি?" অসুরেরা বাহির হইয়া ব্যাপার কি দেখিতে আসিল। মহিষাসুরও ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনিও আসিলেন; আসিয়া দেখিলেন, অপূর্ব্ব ব্যাপার!

মহিষাসুর দেখিলেন, এক উজ্জ্বল রূপসীর রূপ-প্রভায় জগৎ আলোকিত হইয়াছে, তাঁহার বিশাল দেহ বিশ্বময় ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কিরীট তাঁহার স্বর্গের দুয়ারে, পদযুগল তাঁহার রসাতলে; দেহভারে তাঁহার জগৎ টলিতেছে, ভ্রুকুটিতে তাঁহার মহাপ্রলয়ের সূচনা দেখা যাইতেছে! মহিষাসুর বুঝিলেন, এ আর কেহ নহে, সেই দেবতাদের রক্ষাকর্ত্রী —মহামায়া! দেবতাদের পক্ষে হইয়া তাহারই সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য আসিতেছেন। রাগে তাহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখনই তিনি সকল অসুরকে ডাকিয়া সমরের জন্য প্রস্তুত হইতে উপদেশ দিলেন।

মহিষাসুর দেখিয়াছিলেন, যুদ্ধে আসিতেছেন কেবল দুর্গা (দুর্গতি হরণ করেন বলিয়া মহামায়ার অপর নাম, দুর্গা) একা! একটী সামান্য সিংহ ছাড়া তাঁহার সঙ্গে আর অপর কেহ নাই। তিনি মনে মনে বলিলেন, "এইবার মহামায়াকে কিছু বিশেষ শিক্ষা দিব। একবারে কোটি কোটি অসুরের চাপে তাঁহাকে এমন নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিব যে, দেবতারাও বুঝিবে, অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করাটা একটা ননীর পুতুলের কর্ম্ম নয়।"

এই ভাবিয়া মহিষাসুর সকল অসুরদিগকে ডাকিয়া এমন যুদ্ধের আয়োজন করিলেন যে, তাহাদের অস্ত্রের ঝন্-ঝনায় দিগন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল।

মহামায়া সেই শব্দ শুনিয়া একটু মৃদুহাসিমাত্র হাসিলেন, আর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অনতিবিলম্বেই লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি প্রবলবিক্রম অসুর, কেহ বা শূল লইয়া, কেহ বা শাবল লইয়া, কেহ বা মুসল লইয়া, কেহ বা মুদ্গর লইয়া, কেহ বা খড়্গ লইয়া, কেহ বা কুড়ালি লইয়া, কেহ বা পাশ লইয়া, কেহ বা পটিশ লইয়া, দেবীকে আসিয়া ঘেরিয়া ফেলিতে লাগিল। এই সকল অসুর-সেনার মধ্যে আবার অসংখ্য রথ, ঘোড়া ও হাতী! আবার তাহাদের উপরে অসংখ্য মহাবিক্রমশালী সেনাপতিও রহিয়াছেন। তাহাদের নাম, চিক্ষুর, চামর, উদগ্র, মহাহনু, অসিলোমা, বাষ্কল, পরিবারিত, বিড়ালাক্ষ এবং আরও কত কি! ইহাদের নাম যেমন কটমট, আকারও তেমন ভয়ানক! দেখিলেই মূর্চ্ছা যাইবার কথা! দেবতারা ও ঋষিরা অলক্ষ্যে থাকিয়া এই যুদ্ধকাণ্ডের রঙ্গ দেখিতেছিলেন। এই সব দেখিয়া তাঁহারা ত্রাসিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মহামায়া নড়িলেন না, তিনি যেমনি বসিয়াছিলেন, তেমনি বসিয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্বজোড়া মূর্ত্তি, তখন

একটি সামান্তা বালিকার আকার ধারণ করিয়াছে।

অসুরেরা ভাবিল, "এ কি? এ কিসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিলাম। এ যে একটা পাথরের মূর্ত্তি, নড়েও না চড়েও না!"

তাহারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া একটু দূর হইতেই দেবীর গায়ে দু'টি একটি করিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সবিস্ময়ে দেখিল, দেবীর গায় ঠেকিয়া সেগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। তখন তাহারা, এটা একবারে নিরেট জড়পদার্থ নয় বুঝিতে পারিয়া, অনেকগুলি অস্ত্র এক-সঙ্গে ক্ষেপণ করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সেই একটুখানি মেয়েটা ক্ষিপ্রহস্তে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া কেমন সহজ ভাবে এবারও তাহাদের সবগুলি অস্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিলেন!

অসুরেরা বুঝিল, না, মেয়েটা দেখ্‌তে যতটা অবলা, বাস্তবিক কাজে ততটা নহে। তখন তাহারা সেনাপতিদের ইঙ্গিত পাইয়া একবারে কোটিতে কোটীতে, লক্ষে লক্ষে, অশ্ব, গজ ও রথাদির সহিত সেই বালিকাটীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তখন মহামায়াও সহস্র বাহু মেলিয়া আবার বিশ্ব-গ্রাসিনী প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইলেন।

তারপর উভয়পক্ষে অতিভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অসুরেরা দেখিল, এখন কোথায় বা সেই শান্তশিষ্ট মেয়েটি, আর কোথায় বা তাঁহার সেই অচল, নিশ্চল ভাব! তখন তাঁহার হুঙ্কারে চরাচর কম্পিত হইতেছে, পদভরে মেদিনী টল্‌মল্ করিতেছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাসে প্রলয়ের ঝঞ্ঝা বহিতেছে, প্রখরদৃষ্টি দিয়া অগ্নি ছুটিতেছে। অসুরেরা সবিস্ময়ে আরও দেখিল, দেবী আর এখন একা নহেন। তাঁহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস হইতে অবিরত প্রমথসৈন্যগণ বাহির হইয়া আসিতেছে। প্রমথগণ শিবের উপাসক। রণে তাহারা যেমন দুর্দ্ধর্ষ, গীতবাদ্য ও নৃত্যেও তাহারা তেমনই নিপুণ। তাহারা আসিয়া থেই থেই নৃত্য করিতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে অসুরনিপাত, জয়ধ্বনি ও গীতবাদ্যও আরম্ভ করিল। সিংহটা এতক্ষণ নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিল, রকম দেখিয়া সেও উঠিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। অসুরের রক্ত খাইয়া, ঘাড় মট্‌কাইয়া, কট্‌মট্ করিয়া মস্তক চিবাইয়া সে বেশ আনন্দে এ-পার ও-পার উল্লম্ফন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এভাবে যুদ্ধ অধিকক্ষণ চলিল না, অচিরেই অসুরসৈন্য বিনষ্ট হইয়া আসিল। ইহা দেখিয়া তারপর সেনাপতিরাও একে একে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তাহারা প্রত্যেকেই এক-একজন মহাকায় যোদ্ধা! কিন্তু দেবী আজ কালান্তক হইয়া আসিয়াছেন, কেহই তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। কেহ তাঁহার হাতে মরিল, কেহ বা প্রমথদের হাতে মরিল, কতকগুলিকে সিংহটা থাবা মারিয়া, মারিয়া ফেলিল।

তখন মহিষাসুর ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া অসুরপুরী হইতে বাহির হইয়া আসিল।

মহিষাসুর নানা মায়া জানিত। কখন সে ব্যাঘ্রের মত হইত, কখনও সিংহের রূপ ধরিত, কখনও বা হস্তীর রূপ ধরিত। মহিষের রূপটাই তার বিশেষ প্রিয় ছিল—এজন্যই তাহার মহিষাসুর নাম হইয়াছে। সে প্রথমেই এই রূপটি ধরিয়া দেবীকে আক্রমণ করিতে আসিল।

যুদ্ধের অবস্থা এখন একবারে উল্টাইয়া গিয়াছে। এখন মহিষাসুর একা, দেবীর পক্ষে অসংখ্য প্রমথ। কিন্তু মহিষাসুর একাই সকল অসুরের সমকক্ষ। সে শৃঙ্গে, খুরে ও লেজের ঝাপটে চারিদিক এমন উলট্‌পালট্ করিয়া আসিতে লাগিল যে মনে হইতে লাগিল, আবার বুঝি প্রলয় উপস্থিত! তাহার শৃঙ্গের ঘায় পর্ব্বত চুরমার হইয়া গেল, নিঃশ্বাসের চোটে পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি শূন্যে উড়িতে লাগিল, খুরের আঘাতে ধরণীর বক্ষ বিদারিত হইয়া কোথাও হ্রদ, কোথাও সাগরের সৃষ্টি হইয়া পড়িল। তারপর সে যখন একটা প্রবল ঘূর্ণিবায়ুর মত প্রমথসৈন্যদের মধ্যে পড়িয়া চক্ষুর নিমেষে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া শৃঙ্গের আঘাতে মেঘগুলিকে বাষ্পাকার করিয়া উড়াইতে লাগিল, তখন দেবতারা সন্ত্রাসিত হইয়া কেবলি ভাবিতে লাগিলেন, 'কি হয়! কি হয়!'

এইবার প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এতক্ষণ যুদ্ধ হইয়াছে সামান্য সৈনিকে সৈনিকে। এখন আর বাজে সৈনিক নাই। এখন যুদ্ধ আসলে আসলে। মহামায়া মহিষের এই হাত-পা-ছোড়া বন্ধ করিবার জন্য প্রথমেই তাহাকে পাশ-দ্বারা আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। শৃঙ্গে, খুরে ও লেজে দেবীর পাশ জড়িত হইয়া যাওয়াতে মহিষাসুর বড় কাবু হইয়া পড়িল। তখন সে মহিষের রূপ ছাড়িয়া একটা সিংহ হইয়া আসিয়া দেখা দিল। দেবী খড়্গ দিয়া একটী কোপ বসাইয়াই কেশরযুক্ত তাহার গলাটী কাটিয়া ফেলিলেন। তখন সে একটী বিরাট পুরুষাকারে উপস্থিত হইয়া অসিহস্তে যুদ্ধ করিতে লাগিল। সে এমন প্রবলবেগে বিদ্যুতের মত অসি ঘুরাইতে লাগিল যে কাহার সাধ্য তাহার নিকটে যায়। মহামায়া দূর হইতে তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া ফেলিলেন। তখন সে একটা প্রকাণ্ড হাতী হইল। হাতী হইয়া শুঁড় দিয়া সে দেবীর সিংহটাকে কষিয়া টানিতে লাগিল। দেবী বিষম রাগিয়া তাহার শুঁড়টীও কাটিয়া-দিলেন। তখন সে আবার মহিষের রূপ ধরিয়া সরিয়া যাইয়া খুর, শৃঙ্গ ও লেজের আঘাতে পাহাড়-পর্ব্বত উৎক্ষিপ্ত করিয়া জগৎ সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিল।

দেবী দেখিলেন, এ মায়াবী অসুরের সঙ্গে এরূপভাবে যুদ্ধ করা বৃথা। সে দেবীকে ধরা না দিয়া সরিয়া সরিয়া কেবলি জগতের অনিষ্ট করিবে। তিনি তাহাকে একবারে চাপিয়া ধরিবার বাসনা করিলেন। পরিশ্রম বিনোদনার্থ একপাত্র মধু হাতে লইয়া কহিলেন, "ওরে মূর্খ, ক্ষণেক অপেক্ষা কর। যতক্ষণ এই মধু পান করি, ততক্ষণ তোমার তর্জ্জন-গর্জ্জন সহিব। তৎপরে তোমার গর্জ্জনের পরিবর্ত্তে এই স্থানে দেবতাদের আনন্দধ্বনি উঠিবে।"

দেবী এই কথা কহিয়া মধুপানপূর্ব্বক অপূর্ব্ব দীপ্তিময় কান্তি ধরিয়া সিংহে যাইয়া উঠিলেন। সিংহও ব্যাপার বুঝিয়া একবার খুব ভালরূপে কেশর ঝাড়া দিয়া উঠিয়া এক লম্ফেই মহিষাসুরের উপর যাইয়া পড়িল। দেবী পদভরে মহিষটাকে চাপিয়া ধরিয়া শূল-ক্ষেপণে তাহার মস্তকটী বিচ্ছিন্ন করিবামাত্র মহিষাসুর এবার আর পলাইবার পথ না পাইয়া সেই নিহত মহিষদেহ হইতে কতকটা বাহির হইয়া পড়িল। এবার মহিষাসুর নিজ-

মূর্ত্তিতেই দেখা দিলেন। বাহির হইয়াই তিনি পলাইবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু মহামায়া তাহাকে এমনি চাপিয়া ধরিয়াছিলেন যে, কতকটা অংশ তাহার সেই নিহত মহিষদেহটার মধ্যে রহিয়াই গেল। তদুপরি, সিংহের থাবায় এবং দেবীর শূলেও তার অনেকটা আট্‌কাইয়া গিয়াছিল। এবার অসুরকে ভালরূপ আট্‌কাইয়া দেবী তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য সর্ব্বসংহারক দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিলেন।

জগৎ ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল। দেবতারা সে দিব্যমূর্ত্তি দেখিবার জন্য শ্বাসরোধ করিয়া অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। মহিষাসুর একমুহূর্ত্ত সেই মূর্ত্তি দেখিয়া আত্মরক্ষা ভুলিয়া গেল। যে মহিমময়ী মূর্ত্তি আজও হিন্দুর ঘরে ঘরে পূজিত হইয়া থাকে, সে এই মহিষাসুরমর্দ্দিনী মূর্ত্তি! হিন্দু যখন বৎসর বৎসর মহামায়াকে আহ্বান করে, তখন তাঁহাকে এই মূর্ত্তিতেই আহ্বান করিয়া ধন্য হয়! এবং এজন্যই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে এখনও সেই মাথা-কাটা মহিষটা এবং পাপিষ্ঠ মহিষাসুরটীকে আমাদের ঘরে ঘরে উপস্থিত হইতে দেখি। দেবগণ এই অসুরনাশিনী অভয়া মূর্ত্তি দেখিয়া এখন ভয়ে ও ভক্তিতে মস্তক নত করিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু যখন মস্তক পুনরায় তুলিলেন, তখন দেখিলেন, আর সে চিহ্ন নাই।—দেবী অস্ত্র সংযত করিয়াছেন, অসুর নিহত হইয়াছে, তাহার মুণ্ডটী লইয়া সিংহ ইতস্ততঃ উৎসাহে উল্লম্ফন করিয়া বেড়াইতেছে! দেবী সত্যকথাই কহিয়াছিলেন। এইমাত্র যে-স্থান মহিষাসুরের ভীষণ নিনাদে কম্পিত হইতেছিল, তাহা এখন দেবগণের ও ঋষিদের উচ্চ আনন্দকোলাহলে ও জয়ধ্বনিতে পরিপূরিত হইয়া গেল। দেবতারা ছুটিয়া আসিয়া মহামায়াকে ঘিরিয়া নানারূপে তাঁহার অর্চ্চনা ও স্তব আরম্ভ করিলে দেবী সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "দেবগণ! এইবার নির্ব্বিবাদে স্বর্গরাজ্য ভোগ কর, আর অপর কিছু বাঞ্ছনীয় থাকে তো বল, আমি তাহাও পূরণ করিব! বর গ্রহণ কর।"

দেবগণ যোড়হস্তে কহিলেন, "মা, তোমার এই অমূল্য আশীর্ব্বাদ ও মহিষাসুরের পতনের পরে আর আমাদের কি বাঞ্ছনীয় থাকিতে পারে? তথাপি যদি তুমি এতই প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে এই বর দাও, যেন বিপদে পড়িয়া ডাকিলেই তোমায় পাই, তুমি যেন তখন বরাভয়প্রদা হইয়া আসিয়া আমাদিগকে বিপন্মুক্ত কর। যে কেহ তোমাকে এরূপ ভক্তিভরে ডাকে, তাহারই যেন অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।"

অতীব প্রসন্না হইয়া হাসিয়া, "তথাস্তু" কহিয়া মা অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। দেবগণের কণ্ঠ হইতে আবার সমস্বরে জয়ধ্বনি উঠিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

বিবিধ।

সর্পাঘাতে তুলসী।—তুলসী হিন্দুর নিকট পরম পবিত্র বৃক্ষ। পুরা-কালে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রেও ইহার গুণের নানাবিধ ব্যাখ্যা রহিয়াছে। বিষ-বৈদ্যের মুখে শুনা গিয়াছে, ইহা সর্প-বিষের ঔষধ। তাহারা বলে ইহার মূল গৃহে রাখিলে সর্প-ভয় থাকে না। সম্প্রতি এই পরম পবিত্র তুলসী-পত্রের রসে একটি মুমূর্ষু ব্যক্তি জীবন পাইয়াছে। ঘটনাটি এই,—গদাই মালি নামক জনৈক উড়িয়া মালি গত ২৯এ মে বেলা আন্দাজ ৭॥০ টা ৮ টার সময় গাছতলায় পতিত একটি আম খায়। আধ ঘণ্টা পর হইতে তাহার গা ঝিম ঝিম করিতে থাকে, ক্রমশঃ তাহার সর্ব্ব শরীর অবশ ও নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই অজ্ঞান হইয়া ঢলিয়া পড়ে। তাহার শরীরে সম্পূর্ণরূপে বিষক্রিয়া হইতে আরম্ভ হয়। তখনই ডাক্তার ও অন্যান্য বিষ-বৈদ্যকে ডাকিবার জন্য চারিদিকে লোক ছুটিয়া গেল, কিন্তু যখন সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রোগীর কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, নাড়ীও নাই, কেবল নাভির নিকট অল্প একটু নড়িতেছে মাত্র। বাঁচিবার আশা নাই দেখিয়া ডাক্তারেরা সেই মত প্রকাশ করায় অত্র গ্রাম-নিবাসী হৃদয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক বিষ-বৈদ্য (ওঝা) একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য অর্দ্ধ পোয়া আন্দাজ রস হইতে পারে এরূপ-পরিমাণ তুলসী পাতা আনিতে বলিলেন। সৌভাগ্য-বশতঃ নিকটে তুলসী গাছ থাকায় তৎক্ষণাৎ পাতা আনা হইল। তিনি নিজ হস্তে সেই পাতার রস বাহির করিয়া রোগীর সর্ব্বশরীরে বেশ করিয়া মাখাইয়া ছিলেন এবং মুখের মধ্যে, কণ্ঠে ও নাভিকূপে যতটা ধরে পূর্ণ করিয়া দিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে রোগী অল্প নড়িয়া উঠিল, এবং মুখের মধ্যে যে তুলসী-রস দেওয়া হইয়াছিল তাহাও একটু গলাধঃকরণ করিবার সামর্থ্য হইল। ইহা দেখিয়া তখন সকলেই রোগীকে বিশেষ যত্ন-সহকারে শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে সকলের সম্মুখে রোগী উঠিয়া বসিল ও কথা কহিল; তখন তাহার অসহ্য গাত্রদাহ হইতেছে, কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নাই। ক্রমশঃ সে সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করিল। তুলসীর এই অত্যাশ্চর্য্য গুণ দেখিয়া সকলেই বিশেষ বিস্মিত হইয়া পড়িল। সাধারণের নিকট ইহার গুণ প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই এত বিশদ করিয়া বর্ণনা করিতে হইল। সর্প-ভয় সর্ব্বস্থানেই আছে। অতএব যে কেহ ইচ্ছা করিলে ইহার গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। —(বাঙ্গালী।)

আনন্দের সমাচার।—৺অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ও সুবিখ্যাতা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ভগিনী কুমারী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের ট্রাইপোজ্ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

৬ নং সিমলা ষ্ট্রীট, প্যারাগন প্রেসে শ্রীনবচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আন্টনি বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।